আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে বিদ্বেষী ইহুদী-খৃষ্টান শক্তির পাঞ্জা থেকে গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী কর্তৃক মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্তকরণের ঐতিহাসিক উপন্যাস

গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর ফিলিস্তীন অভিযান - ১

অপারেশন আলেপ্পো

ঔপন্যাসিক : আলতামাশ

অপারেশন আলেপ্পো

ঔপন্যাসিক আলতামাশ

অনুবাদ

শহীদুল ইসলাম

কিতাব কেন্দ্র

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[একটি ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশনা]

গাজী সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর ফিলিস্তিন অভিযান-১

অপারেশন আলেপ্পো

মূল ঃ আলতামাশ

❑

অনুবাদ ঃ
শহীদুল ইসলাম

❑

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
শফিকুল ইসলাম (শফিক)

❑

❑

প্রকাশক ঃ
শহীদুল ইসলাম
সহযোগিতায়—কিতাব কেন্দ্র
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭২-২৯৩৩৭২

❑

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর, ২০০৩

❑

মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

সেইসব মুজাহিদদের মাগফিরাত ও সাফল্য কামনায়

যাঁরা নব্য ক্রুসেডারদের আগ্রাসন থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস ও ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে জীবনোৎসর্গ করেছেন এবং আযাদীর লড়াই অব্যাহত রেখেছেন।

লেখক, সম্পাদক ও চিন্তাবিদ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভীর

প্রসঙ্গ কথা

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে বিদ্বেষী ইহুদী-খৃস্ট শক্তির পাঞ্জা থেকে মুসলমানের প্রথম কিবলা বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্তকরণের লক্ষ্যে যে নজিরবিহীন যুদ্ধ-জিহাদ চালিয়েছিলেন ইসলাম জগতের প্রাতঃস্মরণীয় বীর মুজাহিদ সুলতান গাজী সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী (রহ.) তা মুসলিম জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। হযরত আইয়ূবী (রহ.)-এর তাকওয়া, বুদ্ধি, সাহস, যোগ্যতা ও প্রতিভা মুসলিম মনীষার ইতিহাসে সারাজনম ধরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাঁর গৌরবগাঁথা গীত হবে যুগে যুগে ইতিহাসবিদদের কণ্ঠে। আর ইসলামের চিরশত্রু সমাজও রোজ-কিয়ামত পর্যন্ত বিস্মৃত হবে না এই ক্ষণজন্মা বীরপুরুষের শৌর্য-বীর্য ও গৌরবময় বিজয়াভিযানের কথা।

হযরত সুলতানের ঐতিহাসিক রাজনীতি ও সমরাভিযানের উপর ইতিহাসাশ্রিত ও বস্তুনিষ্ঠ বহু উপন্যাস মুসলিম বিশ্বের নানা স্থানে নানাভাষায় রচিত হয়েছে। এ সবের মধ্যে মশহুর একটি উপন্যাসের বাংলা তর্জমা এটি। বহুখণ্ডে প্রকাশিত এ বিশাল সাহিত্যকর্মের একটি খণ্ড কিতাব কেন্দ্র তার সম্মানিত পাঠকগণের সমীপে পেশ করতে পেরে খুবই খুশী। মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া জ্ঞাপনের পাশাপাশি কিতাব কেন্দ্র পাঠকগণের দোয়া ও সহযোগিতাও কামনা করছে, যেন আরও মূল্যবান ঐতিহাসিক কিছু বইপত্র বাংলাভাষী পাঠকের হাতে তুলে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আল্লাহ্ পাক যেন তাদের এ কষ্ট-সাধনা কবুল করেন।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশের বই প্রকাশের ইচ্ছা ছিল দীর্ঘদিন থেকেই। কিন্তু তর্জমাকৃত পাণ্ডুলিপি হাতে না পাওয়ায় সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। এ যাত্রা বিশিষ্ট আলেম-কলমসৈনিক, লেখক, অনুবাদক ও সাংবাদিক শহীদুল ইসলাম তাঁর বহু কষ্টের ফসল এই গ্রন্থটি 'কিতাব কেন্দ্র'কে সাথে নিয়ে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। 'অপারেশন আলেপ্পো' শিরোনামে এটি প্রকাশিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে এর পরবর্তী খণ্ডগুলো তৈরী হতে থাকবে এবং নতুন প্রজন্মের জাগ্রতহৃদয় ও সতর্কমনা পাঠকবর্গের হাতে পৌঁছুবে ইনশাআল্লাহু তাআলা।

কোনো প্রকাশনা সংস্থার জন্যে সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত হচ্ছে তার প্রিয় পাঠকবর্গের সামনে নতুন গ্রন্থ পরিবেশনের ক্ষণটি। 'অপারেশন আলেপ্পো'র মোড়ক উন্মোচনের সময়টি সামনে রেখে আমরা এর মাঝে লুক্কায়িত প্রশংসিত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো, সমরাভিযানের নায়কগণ, ঔপন্যাসিক, অনুবাদকসহ মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রতিটি অংশে জড়িত ব্যক্তিবর্গের মাগফিরাত ও দ্বীন-দুনিয়ার মঙ্গলের দোয়া করছি। আল্লাহ্ 'কিতাব কেন্দ্র' এবং তার কর্মী, লেখক ও শুভার্থীগণকে ইসলামী চেতনা বিকাশের জন্যে বিশেষভাবে কবুল করুন গোটা পৃথিবীর বুকে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার বিপ্লবী কাফেলার সাথে তাদের নামও যুক্ত থাকুক। আল্লাহুম্মা আমীন!

ঢাকা ॥ ১৪সেপ্টেম্বর, ২০০৩ **উবায়দুর রহমান খান নাদভী**

গ্রন্থকারের কথা

আপনি একথা ভালোভাবেই জানেন না, বর্তমানে আমাদের নতুন প্রজন্মের গতি, রুচি ও লক্ষ্য বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। আমাদের জাতীয় চেতনা, ঐতিহ্য সংস্কৃতিও মারাত্মক দূষণের শিকার। যদি এ সম্পর্কে আপনার ধারণা না থেকে থাকে তবে শুনুন আমরা আপনাকে বলছি।

নতুন প্রজন্মের মধ্যে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিস্মৃতির ও বিকৃতির প্রধান কারণ হলো; তারা আমাদের পূর্বসূরীদের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখে না। তারা জানে না, তাদের পূর্ব পুরুষদের জীবন-কর্ম, বীরত্ব, সাহসিকতা, সাফল্য ও বিজয়ের কীর্তিগাঁথা। আমাদের শিশু কিশোর ও যুবক যুবতীরা তাদের পাঠ্য পুস্তকে মুসলিম ইতিহাস নামের যে বিকৃত একপেশে কাহিনী ও জীবনী পড়ে, এগুলোর পাতায় পাতায় আমাদের পূর্বপুরুষদের চরিত্র ও কর্মকে বিকৃত ও অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর একাজগুলো আমাদের বন্ধুবেশী বিজাতীয় লেখক ও স্বজাতীয় কতিপয় অসতর্ক ও অধীনতাসুলভ মানসিকতাধারী পরজীবী লেখক করেছে; যাদের দৃষ্টি, রুচি ও বোধ আমাদের শত্রুদের কাছে বিক্রিত বন্ধকীকৃত। আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবন ও কর্মের প্রকৃত চিত্র মুসলিম ইতিহাস নামের ওইসব পুস্তকে নেই।

অপর কারণ হলো শিশু, কিশোর ও যুবক-যুবতীরা বিনোদনমূলক গল্প ও লোম-হর্ষক বিস্ময়কর কাহিনী, দুর্জয় সাহসিকতা, রোমাঞ্চকর উপাখ্যান, প্রেম, ভালোবাসা, ইত্যাকার গল্প-উপন্যাস পছন্দ করে যেগুলো মানুষের আবেগকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিমোহিত করে। মারদাঙ্গা, সংঘর্ষ, মোকাবেলায় সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় দেখতেও নবীন মন পছন্দ করে। নবীনরা স্বভাবতই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। স্বভাবতই তারা প্রেম ভালোবাসা ও মানবিক আবেগ উদ্বেগের প্রতি আকৃষ্ট।

আমাদের প্রতিপক্ষ ইহুদী খৃস্টান ও পৌত্তলিকরা মানবিক চাহিদাগুলোকে বিকৃত ও কুরুচিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করে শিশু কিশোর, তরুণ তরুণীদের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য অশ্লীল নাটক, নোবেল, পর্ণো সিনেমা, গল্প-উপন্যাসের আশ্রয় নিয়েছে। সারা দুনিয়াব্যাপী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স প্রচার মাধ্যমে

এসব কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য অপসংস্কৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার ষোলকলা পূর্ণ করেছে।

আমাদের স্বজাতীয় ব্যবসায়ীরা অর্থের লোভে মানবতা ও নৈতিকতা পরিপন্থী এসব সাহিত্য সংস্কৃতিকে প্রচার করছে।

নতুন প্রজন্ম ও ভবিষ্যতকে সুস্থ রাখার জন্যে, তাদের নীতি-নৈতিকতার বিকাশ এবং সুরুচি ও জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে আমরা সত্যাশ্রয়ী গল্প প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব গল্প উপন্যাস আপনি ও আপনার সন্তানদের চাহিদাকে পূরণ করার পাশাপাশি সবার আবেগকেও নাড়া দেবে। যেগুলোতে রয়েছে বিস্ময়কর উত্তেজনা, রোমাঞ্চ ও ভালোবাসার সার্বিক উপাদান। কিন্তু এগুলো পাঠক পাঠিকাদেরকে বিকৃতির দিকে নয় ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সত্যাশ্রয়ী করবে, দিক-নির্দেশনা দিবে ভবিষ্যত কর্মে। দেখাবে ইতিহাসের আলোকে ভবিষ্যতের পথ। অশ্লীল বেহায়াপন্না ও নগ্নতার বিপরীতে এসব উপাখ্যান যথার্থ বিকল্প বলে আমাদের বিশ্বাস।

ক্রুসেডারদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, গাজী সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর যুদ্ধ জিহাদ সম্পর্কে আমরা কম-বেশী জানি। জানি তিনি ইহুদী ও খৃষ্ট সম্মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করে ফিলিস্তিন ও বাইতুল মোকাদ্দাসকে মুক্ত করে ছিলেন কিন্তু মুখোমুখি যুদ্ধের আড়ালে দৃষ্টির বাইরেও তাকে লড়াই করতে হয়েছিল গোপন চক্রান্তের বিরুদ্ধে। গোয়েন্দাগিরি, চক্রান্তের জাল, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত হামলার সেই নীরবযুদ্ধ ছিল সম্মুখ লড়াইয়ের চেয়ে আরো বেশী ভয়ঙ্কর।

গাজী সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর ফিলিস্তিন অভিযান ও বাইতুল মোকাদ্দাস মুক্ত করণের প্রারম্ভে তাকে ইহুদী, খৃস্টান ও অভ্যন্তরীণ কুচক্রীদের কি ভয়ানক চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হয়েছিল এখানে তাই আমরা উপস্থাপন করেছি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুরা কী ভয়ানক চক্রান্ত করেছিল, কতো নগ্ন ও অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নারীদের ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, যার ফলে ভয়াবহ সংঘাতে বহু রক্ত ঝরাতে হয়েছে মুসলমানদের, সেই কাহিনীই এই পুস্তকের উপজীব্য। আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই আপনার সন্তানদেরকে নোংরা, কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য থেকে দূরে রাখতে চান; তবে আমাদের সত্যাশ্রয়ী গল্প নির্ভর এই সিরিজ নির্দ্বিধায় তাদের হাতে তুলে দিতে পারেন।

—আলতামাশ

অনুবাদকের নিবেদন

বর্তমানে সারা বিশ্বে চলছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ক্রুসেড, যে ক্রুসেড এখন আর শুধু বাইতুল মোকাদ্দাসে সীমাবদ্ধ নয়। মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন ও নির্বীর্য করতে ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে ইহুদী, খৃস্টান ও পৌত্তলিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কার্যত জোটবদ্ধ হয়ে সর্বগ্রাসী আগ্রাসন চালাচ্ছে।

আর প্রথম সারির মুসলিম নেতৃবর্গ নিজেদের ক্ষমতা ও বিলাসিতা রক্ষায় শত্রুদের নীলনক্সা বাস্তবায়ন করে মুসলমানদের দুঃসহ যন্ত্রণা আরো তীব্রতর করছে।

বাইতুল মোকাদ্দাস উদ্ধারের সংগ্রামী কাফেলা ফিলিস্তিনের ইন্তিফাদা এখন কোণঠাসা। ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে বাইতুল মোকাদ্দাস উদ্ধারের প্রত্যাশা। এই প্রেক্ষিতে বেশী করে স্মরণযোগ্য মুসলিম মিল্লাতের গর্ব, ক্রুসেড বিজয়ী গাজী সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম। ইহুদী খৃস্টান ও অভ্যন্তরীণ চক্রান্তের বিরুদ্ধে কোন যাদু বলে তিনি পদানত করেছিলেন ক্রুসেডারদের?

আমরা জানি, ক্রুসেডারদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছিলেন গাজী সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী (রহ.)। কিন্তু কিভাবে? তাঁর জীবন ও কর্মের বাঁকে বাঁকে স্বার্থান্বেষী স্বজন, স্বজাতি গাদ্দার, হিংসুটে আমীর উমারা ও কর্তাব্যক্তিদের হঠকারিতা, প্রতারণা, বিদ্রোহ, শত্রুদের চরিত্রহনন ও মিথ্যা প্রচারণা, চতুপার্শ্বে বিছিয়ে দেয়া চক্রান্তের জাল, ইহুদী-খৃস্টানদের পাতা সুন্দরী নারী গোয়েন্দাদের ফাঁদ, শত্রুপক্ষের নাশকতা ও গুপ্ত হত্যার অক্টোপাস তাঁকে হতোদ্যম করতে পারেনি। শত্রুদের সকল চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ও গাদ্দারদের হিংসাকে পদদলিত করে কিভাবে তিনি জয়ের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই ইতিহাসের নিরীখে বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে।

সময়ের প্রেক্ষিতে উপমহাদেশের ঐতিহ্য সচেতন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক 'এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ'-এর 'দাস্তানে ঈমান ফুরুশোঁ কী' সিরিজের চতুর্থ খণ্ড অবলম্বনে ফিলিস্তিন অভিযানের পূর্বাপর কাহিনীটুকুকে 'সত্যপথের সৈনিক' শিরোনামে মাসিক 'আল-আশরাফ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকি। পাঠক মহলে এই ধারাবাহিক পর্বগুলো খুবই আদৃত ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রকাশিত পর্বগুলোকে বই আকারে প্রকাশের জন্য অনেকের পক্ষ থেকে অনুরোধ আসতে থাকে। সেই ধারাবাহিক পর্বগুলোই এখন "গাজী সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর ফিলিস্তিন অভিযান—১" 'অপারেশন আলেপ্পো' নামে মলাটাবদ্ধ হলো। 'কিতাব কেন্দ্রে'র সহযোগিতা এই বই প্রকাশের কাজটি সুগম হয়েছে।

আমাদের পাঠক মহল ও তরুণ প্রজন্ম যদি এই গল্প পাঠে মিত্র নির্বাচনে সতর্ক হন, শাণিত হয় তাদের আত্মউপলব্ধি তবে আমাদের এ প্রয়াস সার্থক হবে।

শহীদুল ইসলাম
২০.০৯.০৩ ইং

সত্যপথের সৈনিক

১১৭৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল। ৫৭০ হিজরী সনের রমযান মাস। নূরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর সালতানাতের গুরুদায়িত্ব সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন, কিন্তু নূরুদ্দীন জঙ্গীর ছেলে মালিক আস্-সালেহ, গোমশ্তগীন ও গাজী সাইফুদ্দীন যৌথভাবে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। খ্রিস্টশক্তি তাদের অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করছে। খ্রিস্টানরা সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য যৌথ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, উট, অগ্নিবোমা ছাড়াও রকমারী যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করছে। খ্রিস্টানরা চাচ্ছে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে। সেই সুযোগটাই তাদের হাতে এসে গেল, যখন খ্রিস্টান গোয়েন্দাদের ইন্ধনে তিন ক্ষমতাধর আইয়ূবীর বিরুদ্ধে আঁতাত গড়ে তুলল, খ্রিস্টানরা হিসেব কষে দেখল সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর সাথে যুদ্ধে পেরে উঠা যাবে না। এর চেয়ে যদি তার মিত্রদের বিরোধ উস্কে দিয়ে পরস্পর বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়া যায়, তবে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী ও তার মিত্র উভয় গ্রুপ দুর্বল হয়ে যাবে। এই সুযোগে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীকে পরাজিত করে প্রথম কিবলা বাইতুল মোকাদ্দাসের উপর খ্রিস্ট নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করা সহজ হবে। এরপর কা'বাকেও দখলে আনা সম্ভব হবে। ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাবে।

কিন্তু ওরা বুঝেনি, ইসলাম এমন কোন বৃক্ষ নয় যে, শিকড় কেটে দিলে শুকিয়ে মরে যাবে। ইসলাম কতগুলো কিতাব আর কিতাবের স্তূপ নয় যে, জ্বালিয়ে দিলে ছাই ভস্ম হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে। ইসলাম একটি জীবন দর্শন। যে জীবন দর্শন কতগুলো মৌলিক বিশ্বাস ও কার্যক্রমের সমষ্টি। এসব বিশ্বাস মানুষের হৃদয় রাজ্যে বিরাজ করে, আর সেই বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার কাজ-কর্মে। মুসলমানের অন্তঃস্থিত বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে তার কাজ-কর্ম, জীবন-যাপন। হাজার, লাখ, কোটি মানুষকে হত্যা করেও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ইসলামের দর্শন, চেতনা ও বিপ্লবী ধারাকে ব্যাহত করা। ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়ার একটিই পথ তা হলো, ইসলামের সৈনিকদেরকে জীবনদর্শন থেকে বিচ্যুত

করা। মুসলমানকে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতায় অভ্যস্ত করে ফেলা। মদ, নারী আর আনন্দ স্ফূর্তিতে মজিয়ে রাখা। তাহলে মুসলমানদের জীবন দর্শনে ঘুণ ধরবে। ধর্মের বন্ধন ও শরীয়তের বিধি-নিষেধ শিথিল হতে থাকবে। মুসলমান ধীরে ধীরে আদর্শ বিস্মৃত হয়ে ভোগবাদিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে।

সম্মুখ সমরের চেয়ে খ্রিস্টানরা সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ও কালচারাল যুদ্ধকে গুরুত্ব দিল। গড়ে তুলল গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। অসংখ্য রূপসী তরুণীকে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ দিয়ে কৌশলী গোয়েন্দা হিসেবে গড়ে তুলল। বিশাল বিস্তৃত নারীর ফাঁদ তৈরী করে খ্রিস্টানরা আরব বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে মিশরে জালের মতো ছড়িয়ে দিল প্রশিক্ষিত নারী গোয়েন্দা। ধীরে ধীরে মুসলিম ক্ষমতাসীনদের উঁচুস্তরের কর্তা ব্যক্তিরা খ্রিস্টানদের তৈরী নারী ফাঁদে ধরা দিতে শুরু করল।

সম্ভবত মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখজনক দিক এটাই যে, যুগে যুগে শাসক শ্রেণীর কর্তা ব্যক্তিরাই শত্রুদের তৈরী নারীর ফাঁদে ধরা দিয়ে নিজেদের পতনকে তরান্বিত করেছে।

নূরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর শাসনামলে ইহুদী-খ্রিস্টান শক্তির তৈরী এই সর্বনাশা মরণবিষ মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ও কর্তা ব্যক্তিদের নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছিল। এই কূটকৌশল প্রয়োগ করে খ্রিস্টানরা দখল করে নিয়েছিল অধিকাংশ মুসলিম রাজ্য। দৃশ্যত মুসলিম শাসন থাকলেও অন্তরালে খ্রিস্টানরা ওইসব রাজ্যের কর্তাব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদেরকে পুতুলে পরিণত করেছিল। মুসলমান হলেও তাদের মধ্যে ইসলামী ভাবাদর্শের লেশমাত্র ছিল না। মদ, নারী ও আরাম-আয়েশে আকণ্ঠ ডুবে থাকত। ইহুদী খ্রিস্টানদের সাথেই গোপনে গড়ে তুলেছিল বন্ধুত্ব। এদেরকে কোন অবস্থাতেই ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ও কর্মকর্তা বলার উপায় ছিল না। নূরুদ্দীন জঙ্গী ও আইয়ূবীর জন্যে এসব গাদ্দার ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা।

১১৭৫ সালে সুলতান আইয়ূবীর সাথে এসব অপরিণামদর্শী মুসলিম শাসকদের বিরোধ চরমে পৌঁছে। ইসলামী শাসনের পক্ষে এরা কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। খ্রিস্টানরা দূরে বসে মুসলমান শাসকদের আত্মঘাতী সংঘাতের তামাশা দেখছিল।

সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী যখন রণাঙ্গনে একের পর এক খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত করছিলেন, খ্রিস্টানরা তখন সম্মুখ সমরে পেরে উঠতে না পেরে মুসলমান নেতাদেরকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ছিল এই যে, নূরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তার পুত্র মালিক আস-সালেহ ইসমাঈল আইয়ূবীর বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়ে বসে।

নূরুদ্দীন তনয় মালিক আস-সালেহ ইসমাঈল, গোমশতগীন ও সাইফুদ্দীনের যৌথ বাহিনী আইয়ূবীর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করলে তিন কুচক্রীই রণাঙ্গন থেকে জীবন নিয়ে পলায়ন করে। নূরুদ্দীন জঙ্গীর অধীনস্থ গোমশতগীন ছিল হিরন দুর্গের অধিপতি। জঙ্গীর মৃত্যুর পর সে নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সৈন্যসামন্ত রেখেও আইয়ূবীর পশ্চাৎ আক্রমণের ভয়ে হিরন যেতে সাহস পায়নি গোমশতগীন। সে গিয়ে আশ্রয় নেয় ইসমাঈলের স্বঘোষিত রাজধানী আলেপ্পোয়। আলেপ্পোকে ইসমাঈল রাজধানী ঘোষণা করেছিল।

সাইফুদ্দীন ছিল মৌসুল শহর ও তদঞ্চলের গভর্নর। একটি সামরিক ইউনিটের সেনাধ্যক্ষও ছিল সে। রণকৌশলে তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু সাইফুদ্দীন ছিল স্বভাবে উগ্র, হাঙ্গামা প্রিয়, ক্ষমতা লিপ্সু। ক্ষমতার মোহে ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিল খ্রিস্টানদের কাছে। যে ঈমান শুধু মুসলমানদের বিশ্বাসগত বিষয় নয়, যুদ্ধের ময়দানে ঈমানের শক্তিই মুজাহিদদের ঢাল তরবারীর মূল রক্ষাকবচ।

যুদ্ধের ময়দানেও সাইফুদ্দীন বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করতে পারেনি। হেরেমের সুন্দরী নারী, সেবিকা, দাসী ও নর্তকীদের নিয়ে গিয়েছিল। সেই সাথে কাড়ি কাড়ি মদের মটকি, নাচ-গানের সরঞ্জামাদি আর বাহারী পাখি। কিন্তু হতভাগা সবকিছু রণাঙ্গনে ফেলেই জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল। যাওয়ার কথা ছিল মৌসুল কিন্তু আইয়ূবীর পশ্চাদ্ধাবনের ভয়ে বিক্ষিপ্ত পলায়নপর সৈনিকদের মতো সে মৌসুলের পথে না গিয়ে বিজন এলাকা দিয়ে তার ডিপুটি ও এক কমান্ডারকে সাথে নিয়ে অন্যদিকে রওয়ানা হল।

পলায়নপর সাইফুদ্দীন ও সাথীরা হয়তো সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর কমান্ডোদের দেখতে পেয়েছিল, তাই তারা মৌসুলের পথ ছেড়ে বিপথে রওয়ানা হল। সে সময়কার পরিবেশ ছিল পলায়ন ও লুকিয়ে থাকার উপযোগী। অসংখ্য, মরুটিলা, বালিয়াড়ী, ঝোঁপঝাড়, গাছপালা আর বিজন প্রান্তর ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। এরা এসব অনাবাদী পথেই ঘোড়া হাঁকাল। রাতের আঁধারে পালাতে পালাতে মৌসুলের কাছেই পৌঁছে গেল সাইফুদ্দীন। ক্লান্ত, শ্রান্ত, ভীত সাইফুদ্দীন ও সাথীরা চাঁদনী রাতের আলোতে একটি পল্লী দেখতে পেল। পল্লীর প্রথম বাড়িতে গিয়ে একটি ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল। সাদা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। আরোহীরা হাঁপাচ্ছিল। বৃদ্ধ তাদের দেখে বললেন, "মনে হয় তোমরা মৌসুলের সৈনিক। যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসেছ। দু'দিন ধরেই দেখছি সৈনিকেরা পালিয়ে আসছে। এখানে এসে তারা ঘোড়া থামিয়ে পানি পান করে মৌসুলের দিকে চলে যাচ্ছে।"

"এখান থেকে মৌসুল কত দূর?" জিজ্ঞেস করল সাইফুদ্দীন।

"তোমাদের ঘোড়া যদি চলতে পারে তবে সকাল পর্যন্ত তোমরা মৌসুল পৌঁছে যেতে পারবে। এ গ্রামটি মৌসুলের অধীনে পড়েছে।"

"তোমার এখানে যদি জায়গা থাকে তবে কি আমরা রাতটা কাটিয়ে দিতে পারি?" অনুরোধের স্বরে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল সাইফুদ্দীন।

"জায়গা শুধু থাকলেই হয় না, পথিকের আশ্রয় করে দেয়া হৃদয়ের ব্যাপার। তোমরা ঘোড়া থেকে নেমে ভিতরে এসো।"

বৃদ্ধ একটি ঘরে নিয়ে বসাল তাদের। বাতির আলোতে বৃদ্ধ পরখ করল তাদের পোষাক।

"তুমি কি আমাদের চেনার চেষ্টা করছো?" জিজ্ঞেস করল সাইফুদ্দীন।

"দেখে মনে হচ্ছে তোমরা সাধারণ সৈনিক নও। তোমাদের মর্যাদা হয়তো সেনাপতি পর্যায়ের হতে পারে।" বলল বৃদ্ধ।

"ইনি মৌসুলের গভর্নর গাজী সাইফুদ্দীন।" বলল সাইফুদ্দীনের ডিপুটি। তুমি কোন সাধারণ মানুষকে আশ্রয় দাওনি। এজন্য তুমি অনেক পুরস্কার পাবে। আর আমি ডিপুটি গভর্নর। সে একজন কমান্ডার।

"একটা কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুন বুড়ো।" বলল সাইফুদ্দীন। তোমার বাড়িতে আমাদের একাধিক দিনও থাকতে হতে পারে। আমরা দিনের বেলায় ঘর থেকে বের হব না। আমরা যে এখানে আছি একথা কেউ যেন ঘুর্ণাক্ষরেও টের না পায়। একথা যদি বাইরে প্রকাশ পায় তবে কিন্তু তোমাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর আমাদের অবস্থানের ব্যাপারটি চেপে রাখলে তোমাকে বহু ইনাম দেয়া হবে। তুমি যা চাইবে তাই দেয়া হবে।"

"আমি মৌসুলের গভর্নরকে আশ্রয় দিচ্ছি না। তোমরা হয়তো ভুলে গেছো যে, তোমরা এখন আমার এখানে বিপদগ্রস্ত আশ্রয়প্রার্থী। আশ্রয়প্রার্থী যেই হোক, তাকে আশ্রয় দেয়া আমার কর্তব্য। তোমাদের যতদিন ইচ্ছা থাকো, সাধ্যমতো আমি তোমাদের খেদমত করার চেষ্টা করব। তোমরা লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করলে লুকিয়েই রাখব। তোমাদের প্রতি আমার বেশী আগ্রহের কারণ হলো, আমার ছেলে মৌসুল সেনাবাহিনীতে চাকরী করে।"

"আমরা তাকে প্রমোশন দিয়ে দেবো।" বলল ডিপুটি।

"তোমরা যদি তাকে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করো সেটিই হবে আমার জন্য বড় পুরস্কার।"

"এ্যাঁ! একি বললে বুড়ো? প্রত্যেক বাবাই চায় তার ছেলের পদোন্নতি হোক।" বলল সাইফুদ্দীন।

"না। আমি তার বেঁচে থাকার আশাও কখনো করিনি। আমি জাতীয় সেনাবাহিনীতে তাকে পাঠিয়ে আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেছিলাম। আমিও একদিন সৈনিক ছিলাম। তখন হয়তো তোমাদের জন্মই হয়নি। আমি তোমাদের বাবা কুতুবুদ্দীনের অধীনে যুদ্ধ করেছি। "আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাত নসীব করুন।" আমরা যুদ্ধ করেছি কাফেরদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তোমরা আমার ছেলেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছো। আমি তার মৃত্যু নয় শাহাদত কামনা করেছিলাম।"

"সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী নামে মুসলমান। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয। শুধু জায়েয বললে যথার্থ হয় না বরঞ্চ ফরয।" বলল সাইফুদ্দীন।

"বুড়ো, তুমি এসব বুঝবে না। কে মুসলমান আর কে কাফের এসব ব্যাপার আমরা বুঝি।" বলল ডিপুটি।

"মিয়ারা! তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। আমার বয়স এখন পঁচাত্তর। আমার বাবা নব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। তার বাবা পঞ্চাশ বছর বয়সে যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। দাদা জিহাদের কাহিনী আমার বাবাকে শোনাতেন। আমরা বাবার কাছ থেকে শুনেছি। এর উপর ভিত্তি করে আমি বলতে পারি, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। ক্ষমতা আর রাজত্বের লোভে যারাই ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে একদিন না একদিন আমার মতো গরীবের পর্ণকুঠিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তোমাদের আগে যারা পালিয়ে এসেছে, তাদের অবস্থাও তোমাদের মতোই। তোমাদেরকে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর একজন মাত্র সৈনিক তাড়িয়ে এনেছে। দু'দিন ধরে আমি এই তামাশাই দেখছি। তোমরা দশজন হলেও ওই একজনের ভয়ে এভাবেই পালাতে। সত্যের উপর যারা থাকে তাদের আত্মবল এমনি হয়। ওরা একা দশজনকে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে নিতে পারে। আর সত্যের সৈনিক কখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায় না। রণাঙ্গন থেকে তার লাশ উঠিয়ে আনতে হয়।"

"তোমাকে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর সমর্থক মনে হচ্ছে। তোমার উপর আমাদের ভরসা করা ঠিক হবে না।" উষ্মামাখা কণ্ঠে বলল সাইফুদ্দীন।

"আমি তোমাদেরও সমর্থক। মূলত আমি ইসলামের সমর্থক, সত্যের পক্ষে। আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি যে, তুমি তোমার ধর্মীয় ভাইয়ের শত্রুকে বন্ধু মনে করছো। এ বিষয়টি মোটেও চিন্তা করোনি যে, এরা বন্ধু বেশে ইসলামের দুশমন, তোমার আমার সবার শত্রু। সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর সৈনিকরা অতর্কিতে এখানে আক্রমণ করলেও তোমাদের আমি লুকিয়ে রাখতে পারব।"

ইত্যবসরে একটি কিশোরী খাবার নিয়ে এলো। তার পিছনে আসল এক যুবতী। কিছুটা বয়স্কা হলেও রূপ-লাবণ্য দৃষ্টি কাড়ার মতো। সাইফুদ্দীনের দৃষ্টি কিশোরীর শরীরে আটকে গেল। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল সে।

কিশোরী খানা রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেল। কিশোরী চলে যেতেই সাইফুদ্দীন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটি কে?"

"মেয়েটি আমার কন্যা। আর যুবতী আমার পুত্রবধূ। আমার যে ছেলে মৌসুল সেনাবাহিনীতে চাকরী করে তার স্ত্রী। আমার মনে হয় যে, আমার এই পুত্রবধূটি বিধবা হয়ে গেছে।" বলল বৃদ্ধ।

"তোমার ছেলে মারা গিয়ে থাকলে আমরা তোমাকে অনেক টাকা দেব। বলল, সাইফুদ্দীন। আর মেয়ের ব্যাপারেও তোমাকে ভাবতে হবে না। একে কোন সিপাহীর বউ হয়ে কুড়ে ঘরে থাকতে হবে না। একে বিয়ের জন্য আমরাই পছন্দ করে নিয়েছি।"

"আমি আমার ছেলেকে বিক্রি করিনি, কন্যাকেও বিক্রি করতে চাই না।" বলল বৃদ্ধ। "কুড়ে ঘরে লালিত-পালিত কোন মেয়ের জন্যে সিপাহীর বউ হয়ে কুড়ে ঘরে থাকাই মানায়। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, আমাকে কোন লোভ দেখানোর দরকার নেই। মেহমানের মর্যাদা নিয়ে তোমরা থাক। আমাকে সেবা করার সুযোগ দাও।"

"তুমি শুয়ে পড়। তোমার উপর আমাদের আস্থা আছে। আমাদের দেশে এখনও তোমার মতো নীতিবান লোক রয়েছে, তা জেনে খুশী হলাম।"

বৃদ্ধ চলে গেলে সাইফুদ্দীন সাথীদের বলল, "এ ধরনের ব্যক্তিরা ধোকা দেয় না। তোমরা কি বুড়োর মেয়েটিকে ভালভাবে দেখেছ?"

"একটা হিরের টুকরো"। বলল ডেপুটি।

"পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হয়ে এলেই এই টুকরো আমার প্রাসাদেই থাকবে।" স্মিত হেসে বলল সাইফুদ্দীন।

এবার ডিপুটির দিকে ঝুকে বলল, "তুমি তাড়াতাড়ি মৌসুলের খবর নাও। সৈনিকদের একত্রিত করে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে শীঘ্রই সংবাদ দাও, আমি মৌসুল আসবো না এখানে আরো কিছুদিন থাকবো, জানাও।... আর তুমি, কমান্ডারের দিকে ঝুঁকে, শীঘ্রই আলেপ্পো যাও। ওখানে গিয়ে বলো, আমি কোথায় আছি। নিজে যাও, না হয় নির্ভরযোগ্য কাউকে পাঠাও।"

ডিপুটি ও কমান্ডার তখনই রওয়ানা হয়ে গেল। যে সাইফুদ্দীন মদ, নারী ও মহলের ফরাশ ছাড়া ঘুমাতেপারে না, সে কাঁচা ঘরের চাটাইয়ে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

একদিন আগের ঘটনা। রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে মৌসুলের দিকে যাচ্ছিল এক সৈনিক। কখনও সে ঘোড়া খুব দ্রুত দৌড়াত। কখনও থেমে পড়ত। পিছন দিকে তাকাতো। আর কখনো ধীরে ধীরে চালাত। বারবার বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাতো পিছনের দিকে। এদিক ওদিক দেখতো 'এই বুঝি পিছনে কেউ ধাওয়া করছে' ভেবে ভয়ে থমকে যেতো। রাস্তা ছেড়ে এবড়ো থেবড়ো পথে যাচ্ছিল সে। দেখে মনে হচ্ছিল ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন। ভীত আতংকিত। কি করবে, কোন দিকে যাবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। এক জায়গায় এসে ঘোড়া থামিয়ে কেবলার দিকে ফিরে দু'রাকাত নামায পড়ল সৈনিক। নামায শেষে দু'আর জন্য হাত উঠিয়ে অঝোর ধারায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। হাত উঠাল তো উঠালো। আর নামানোর নাম নেই। আকাশের দিকে মুখ করে ঠাঁই বসে রইল।

স্বজাতি গাদ্দার সম্মিলিত তিন কুচক্রীর সৈনিকেরা যখন আইয়ূবীর কাছে পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করেছিল তখন এদের পোশাকেই আইয়ূবীর চৌকস গোয়েন্দারা পলায়নপর সৈনিকদের সহগামী হয়ে গেল। এটা ছিল আইয়ূবীর একটি গোয়েন্দা কৌশল। পরাজিত পলায়নপর সৈনিকদের পিছনে তার কিছু সংখ্যক গোয়েন্দা মিশে যেত। এরা এদের সাথে চলে যেতো তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এবং বহুরূপী বেশ ধারণ করে পর্যটকের মতো শত্রুদের অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে প্রতিপক্ষের পরবর্তী তৎপরতা এবং সাধারণ মানুষের মনোভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতো। দামেস্ক থেকে মালিক আস-সালেহ পলায়নের সময় আইয়ূবীর বহু গোয়েন্দা সাধারণ মানুষের বেশ ধরে ওদের পিছনে চলে গিয়েছিল। এসব গোয়েন্দা খুব মেধাবী, সাহসী, দৃঢ়চেতা, দুরবস্থার মধ্যেও লক্ষ্যে অবিচল থাকার মতো করে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তোলা হতো। যুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমেই আইয়ূবী বিজয়ের অর্ধেক অর্জন করে ফেলতেন, বাকী অর্ধেক বিজয়ের জন্যে তাকে ময়দানে লড়তে হতো।

১১৭৫ সালের এপ্রিলে সম্মিলিত কুচক্রী বাহিনীর পরাজয়ের সাথে সাথেই আইয়ূবীর সেনাপতি হাসান আব্দুল্লাহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দাদের পলায়নপর সৈনিকদের পিছনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওদের পোশাকে সজ্জিত করে। এরা হিরন ও মৌসুল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তন্মধ্যে অনেকেই গ্রাম্য মানুষের পোশাকেও ছিল।

তিন কুচক্রীর মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব মোটেও ছিল না। তিনজনই ছিল ক্ষমতা লোভী এবং একে অন্যের শত্রু। কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্যের লোভে এরা আইয়ূবীকেই শত্রু ভাবতে থাকে এবং আইয়ূবীর বিরুদ্ধে যৌথ যুদ্ধের আয়োজন করে বসে। তাই আশঙ্কা ছিল এরা লজ্জাজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে সৈন্যদের সংগঠিত করে আবার প্রতি আক্রমণ চালাতে পারে। এজন্য এদের তথ্য নেয়ার বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আইয়ূবী জানতেন, ভোগবিলাসে লিপ্ত নীতিহীনরা যুদ্ধ ময়দানে টিকতে পারে না। কিন্তু আশঙ্কার ব্যাপার ছিল, আইয়ূবী জানতেন ওদের পিছনে রয়েছে ইহুদী, খ্রিস্টানদের অবারিত সাহায্য সহযোগিতা এবং পরামর্শদাতা। তাছাড়া আইয়ূবীর উঁচু পর্যায়ের কতিপয় সেনা কর্মকর্তাও লোভে পড়ে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিল, যারা আইয়ূবীর যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে জানত। এরা এবং ইহুদী খ্রিস্টান উপদেষ্টাদের সম্মিলনে আইয়ূবীর জন্যে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

দাউদ। আইউবীর বিশেষ গোয়েন্দাদের একজন। সেও মৌসুল পলায়নপর সৈনিকদের পিছনে সাধারণ গ্রাম্য মানুষের পোশাকে বেরিয়ে পড়েছিল।

দাউদ দু'আরত সৈনিকের কাছে ঘোড়া থামিয়ে দিল। সৈনিক এতোই ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, আরেকটি অশ্বারোহীর আগমন মোটেও টের পেল না। দাউদ ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলে সৈনিক হকচকিয়ে উঠল। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পিছনের দিকে তাকাল। দাউদ তার পাশে বসতে বসতে বলল, "আমি বলতে পারি, তুমি যুদ্ধ ময়দান থেকে পালিয়ে এসেছো। তো ভাই! তোমার এই অবস্থা কেন? আহত কিংবা অসুস্থ হলে আমি তোমার সেবা করতে পারি।"

"না ভাই! আমার শরীরে কোন জখম নেই। আমি আহতও হইনি। কিন্তু আমার বুক ভেঙ্গে গেছে। দুঃখ সহ্য করতে পারছি না। আমি সৈনিক খান্দানের ছেলে। পেশাগতভাবে আমার বাবা ও দাদা সৈনিক ছিলেন। কিন্তু আমরা আল্লাহ্র পথের সৈনিক। ইসলামের জন্যে আমরা যুদ্ধ করি। পেশা হিসেবে নিলেও সত্যের পথে যুদ্ধ করা আমাদের হৃদয়ের খোরাক। আমি জানি খ্রিস্টান আমাদের শত্রু, আমাদের প্রথম কিবলা খ্রিস্টানদের কব্জায়। শত্রু-মিত্রের পার্থক্য আমি আমার সৈনিক বাবার কাছ থেকে শিখেছি। পারিবারিক ঐতিহ্য ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থে মৌসুল সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিলাম আমি। কিন্তু কিছুদিন পরই আমাকে বলা হলো সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী ইসলামের দুশমন, খ্রিস্টানদের মিত্র। খুব খারাপ লোক। অথচ আমরা জানতাম, আইয়ূবী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাইতুল মোকাদ্দাসকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন।

মৌসুলের গভর্নর সাইফুদ্দীন আমাদেরকে আইয়ূবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালো। রণাঙ্গনে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদেরকে ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে ঠেলে দিয়ে সাইফুদ্দীন নিজেকে সুলতান বানাতে চাচ্ছে। আইয়ূবীর সৈন্যরা চিৎকার করে আমাদের বলছিল, ভাইসব! আমরা সবাই মুসলমান। আমরা তোমাদের শত্রু নই, খ্রিস্টানরা আমাদের শত্রু। ক্ষমতালোভীদের প্ররোচণায় ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করো না। আমাদের সাথে এসো, এসো প্রথম কেবলাকে শত্রু মুক্ত করি।" আমি তাদের পতাকা দেখেছি। কি সুন্দর কলেমা খচিত। দোস্ত! আমি আইয়ূবীর সৈনিকদের যেভাবে যুদ্ধ করতে দেখেছি, তাতেই আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে যে, তারাই সত্য পথে, আল্লাহ্র সাহায্য তাদের উপর রয়েছে। তাদের পরাজিত করার ক্ষমতা কারো নেই।

সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর সৈনিকদের তৎপরতা দেখে আমার হৃদয় আল্লাহ্র ভয়ে কেঁপে উঠল। আমি রণাঙ্গন থেকে পলায়নের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার পাশেই ছিল একটি টিলা, আমি এর আড়ালে চলে গেলাম। আমার হৃদয়ে মৃত্যু নয় আল্লাহ্র ভয় তীব্র হয়ে উঠল। আমার বাহু শিথিল হয়ে গেল। তরবারীর ভার বহন করতে পারছিলাম না। ঘোড়ার লাগাম সামলাতে অক্ষম হয়ে গেলাম। ঘোড়াটিকে আমি টিলার আড়ালে নিয়ে গেলাম। আমি কাপুরুষ নই, কিন্তু কাপুরুষোচিত মৃত্যু আমাকে তাড়া করছিল। সারা শরীর অবশ হয়ে পড়ছিল। টিলার ওপাশে শোনা যাচ্ছিল তরবারির ঝন্ঝনানি, অশ্বের হ্রেষারব, সৈনিকের গগনবিদারী তাকবীর ধ্বনি। আইয়ূবী বাহিনীর সৈনিকেরা বলছিল, "ভাইয়েরা! পবিত্র রমযানে ভাইদের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ করো না।"

তাদের আহ্বান শুনে আমার হৃদয় রাজ্যে ভেসে উঠল, যুদ্ধে তো রোযা মাফ হয়ে যায়, কিন্তু সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর সৈনিকেরা ছিল রোযাদার। ইতিমধ্যে আমি প্রতিপক্ষের তিন সৈনিককে শহীদ করেছি। তাঁদের তপ্ত খুন আমার তরবারীতে লেগে জমে রয়েছে। যোদ্ধা তরবারীতে রক্ত দেখে উল্লসিত হয়, কিন্তু আমি তরবারীতে রক্ত দেখে ঘাবড়ে গেলাম। কেননা, আমার তরবারীতে ছিল ভ্রাতৃহত্যার খুন...!

এমতাবস্থায় যুদ্ধ করার সাহস আমি হারিয়ে ফেললাম। বের হয়ে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়লাম। আমি টিলার আড়ালেই দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় ধুকছিলাম। সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর এক সৈনিক আমাকে দেখে ফেলল এবং আমাকে শাসাচ্ছিল। সে আমার দিকে বর্শা উত্তোলন করল, আমি তার ঘোড়ার পায়ে তরবারী ফেলে দিয়ে বললাম, 'আমি তোমাদেরই ভাই, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা আমার নেই। অদূরেই চলছিল প্রচণ্ড লড়াই। সম্ভবত সৈনিকটি ছিল

আইয়ূবীর গেরিলা বাহিনীর সদস্য। সে লুকিয়ে থাকা শত্রু সৈনিকদের খুঁজছিল। সে অগ্রসর হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বুঝতে পেরেছ যে তোমার অবস্থান সত্যের বিরুদ্ধে?' আমি আমার অপরাধ স্বীকার করলাম। বললাম, 'এ অপরাধ আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে, আমাকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে'। সে আমার কাছ থেকে বর্শা নিয়ে নিল, তরবারী তো আমি আগেই সমর্পণ করেছিলাম। সে আমাকে ইঙ্গিতে বলল, 'আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও এবং এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা কর'। পেছনে তাকাবে না, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম। যাও।'

প্রতিপক্ষের উদারতায় আমার অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। রণক্ষেত্রে শত্রু সৈনিক কখনো জীবন ভিক্ষা দেয় না। আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলাম। অনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হলাম। পথটা ছিল নিরাপদ, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি রণাঙ্গন থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে এলাম। সন্ধ্যা নেমে এল, পথেই একটা ঝোঁপের আড়ালে ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। ঘুমের মধ্যে তিন সৈনিক আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, যাঁরা আমার তরবারীর আঘাতে শহীদ হয়েছে। তাঁদের শরীর থেকে তখনো টপটপ করে রক্ত ঝরছে। এরা আমার চতুষ্পার্শ্বে ধীরে ধীরে ঘুরছিল, তাদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। তারা আমাকে কিছু বলছিলও না, কিন্তু ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। শিশুদের মতো আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, প্রচণ্ড শীতের রাতেও আমি ঘেমে নেয়ে উঠলাম। ভীতি, শঙ্কায় আমার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। তায়াম্মুম করে নফল পড়তে দাঁড়ালাম, মনের অজান্তেই অঝোরে কান্না পেল। নামাযের ভিতরেই সশব্দে আমি আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলাম......। লাগাতার তিনচার দিন এভাবে আমার কাঁটল। লোকালয় থেকে অনেক দূরে বিজন কণ্টকাকীর্ণ পথে ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। অনিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা আমাকে দুর্বল করে ফেলল। কিন্তু ঐ মৃত তিন সৈনিকের আত্মা আমাকে তাড়া করছিল। আমি ঘুমাতে পাড়তাম না। দিনের বেলায়ও এদের অবয়ব আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। আমি তাদের হাঁক শুনতে পেতাম। তাদের তাকবীর ধ্বনি আমার কানে বেজে উঠত। আমি এদিক-ওদিক তাকাতাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেতাম না। মনে হত আমার পেছনে কেউ আসছে, পেছনে তাকাতাম, কেউ নজরে পড়ত না। যে সৈনিক আমার পলায়ন দেখে ফেলেছিল সে যদি আমাকে হত্যা করে ফেলত তাহলে ভালোই হত। এই মরণ-যন্ত্রণায় আমাকে ভুগতে হত না। আমার জীবন ভিক্ষা দিয়ে সে বড় জুলুম করেছে। অবস্থা এমন হল, আমার হাতে তরবারি থাকলে আমি আত্মহত্যা করতাম। আমার মন আমাকে

সারাক্ষণ এই বলে শাসাচ্ছিল, 'তুই রাসূলের তিন মুজাহিদকে হত্যা করেছিস, তোর মুক্তি নেই'...!

'তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে' বলল দাউদ। এটা আল্লাহ্‌র রহমত যে, তুমি আত্মহত্যা করনি অথবা খোদাদ্রোহী সৈনিক হিসেবে নিহত হওনি। রণাঙ্গন থেকে তুমি পালাতে পেরেছ। এ থেকেই বোঝা যায়, আল্লাহ্ তোমার দ্বারা কোন ভাল কাজ নেবেন। আল্লাহ্ তোমাকে সুযোগ দিয়েছেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার, অপরাধের কাফ্‌ফারা দেয়ার।'

আচ্ছা বলতো, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর সম্পর্কে আমাকে যা বলা হয়েছে এসব কি সত্য না মিথ্যা?

সম্পূর্ণ মিথ্যা, বলল দাউদ। সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী খ্রীস্টানদের এখান থেকে বের করে আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান আর সাইফুদ্দীন ও তার সহযোগিরা ক্ষমতা লিপ্সায় খ্রীস্টানদের ক্রীড়নক হয়ে ওদের স্বার্থ রক্ষা করছে, ওদের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলছে। বেঈমান কাফেরদের সহযোগিতায় আল্লাহ্‌র সৈনিক সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে'। দাউদ সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর তৎপরতা বিস্তারিত বলল। অথচ সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর বিরুদ্ধে সাইফুদ্দীন বাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে কত অসত্য কথাই না সে শুনেছে। সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী বিলাসী, ক্ষমতা লিপ্সু। ওরা আরো বলেছিল, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রণাঙ্গনেও তার আরাম-আয়েশের সকল সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে। অথচ বাস্তবে আইয়ূবীর মধ্যে এসবের নাম-গন্ধও নেই।

আচ্ছা! আমাকে বল, আমি তিন সৈনিক হত্যার প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে করব? দাউদকে জিজ্ঞেস করল সৈনিক। এই বোঝা যদি আমার হৃদয় থেকে অপসারণ না করি তবে আমাকে ভয়ঙ্কর পরিণতি বহন করতে হবে। এর প্রায়শ্চিত্তের জন্য যদি সাইফুদ্দীনকেও হত্যা করতে হয় তাও আমি করব। তবুও আমাকে আল্লাহ্‌র সৈনিক হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

না, এমনটার দরকার হবে না, বলল দাউদ। আচ্ছা তোমার সাথে কি আমাকে নেবে?

তুমি কে? জিজ্ঞেস করল সৈনিক। ওহ্! এখন পর্যন্ত আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি, কি তোমার নাম, কি তোমার পরিচয়, কোত্থেকে এসেছ, কোথায় যাবে?

কৌশলী পরিচয় দিল দাউদ। 'আমার নাম দাউদ, আমি মৌসুল যাচ্ছি'। আমি ওখানকার বাসিন্দা। যুদ্ধের কারণে রাস্তা ছেড়ে এদিকে এসেছি। তোমার গ্রাম যদি পথে পড়ে তাহলে আমি সেখানে থামব।'

'আমার গ্রাম বেশি দূরে নয়, বলল সৈনিক। তুমি আমার গ্রামে না থামলেও আমি তোমাকে জোর করে থামাব। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ, অস্থির চিত্তকে স্থির করেছ। এমন সুন্দর কথা জীবনে আমি কখনো শুনিনি। এখন আমি ঘরেই ফিরে যাব, জীবনে আর কোনদিন মৌসুল বাহিনীতে ফিরে যাব না। আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারবে।'

* * *

মৌসুলের গভর্নর সাইফুদ্দীন বৃদ্ধের কুঁড়ে ঘরে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। লাগাতার কয়েক রাত সে ঘুমাতে পারেনি। সে এমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল যে, তার ঘরের পাশেই দরজায় কড়া নাড়া এবং দুই আরোহীর আগমন ও অশ্বের হ্রেষারব তার ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনি। তখন প্রায় মধ্য রাত। শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তার কন্যা ও পুত্রবধূও জেগে উঠলো। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বৃদ্ধ বলল, মনে হয় সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর তাড়িয়ে দেয়া মৌসুল বাহিনীর কোন কমান্ডার অথবা সৈনিক এসেছে। পথের পাশে বাড়ি থাকাই মুশকিল। বৃদ্ধ দরজা খুলল, বাইরে দুই অশ্বারোহী দাঁড়ানো। তারা ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। হারেছ সালাম করল, বৃদ্ধ তাকে জড়িয়ে নিল বুকে। কিন্তু মুখে আবেগের কিছুই প্রকাশ করল না। শুধু বলল, 'বাবা! আমি বড্ড আনন্দিত যে, তুমি হারাম মৃত্যু থেকে বেঁচে এসেছ। অন্যথায় যতদিন আমি বেঁচে থাকতাম, আমাকে শুনতে হতো তোমার ছেলে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেঈমানী মৃত্যুবরণ করেছে। সে দাউদের সাথেও মুসাফাহ্ করল। দাউদ কি যেন বলতে চাচ্ছিল, বৃদ্ধ ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে কানে কানে বলল, তোমাদের গভর্নর সাইফুদ্দীন ভিতরে ঘুমিয়ে আছে। আস্তে করে ঘোড়াদুটো ওপাশে বেঁধে রেখে ভিতরে এসো।'

সাইফুদ্দীন! বিস্ময়ে অভিভূত কণ্ঠে বলল হারেস। 'সে এখানে কোত্থেকে এল?'

'পরাজিত হয়ে।' কানে কানে বলল বৃদ্ধ। এসো বাবা! আগে ভিতরে এসে স্থির হও। তারপরে সব বলা যাবে। ঘোড়া দুটো বেঁধে রেখে দাউদ ও হারেস ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। হারেসই ছিল বৃদ্ধের সেই ছেলে; যার কথা সে সাইফুদ্দীনকে বলেছিল। দাউদকে হারেস তার শয়ন কক্ষে নিয়ে গেল এবং পরিচয় দিতে দিতে বলল, 'এর নাম দাউদ। তার মত বন্ধু আর হতে পারে না।'

তুমিও কি পালিয়ে এসেছ? জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধ।

না আমি সৈনিক নই, জবাব দিল দাউদ। মৌসুল যাচ্ছিলাম, যুদ্ধ আমাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল। পথে হারেছের সাথে দেখা। তার সাথে এখানে এলাম।

আব্বা! আমাকে বলুন তো, মৌসুলের গভর্নর এখানে কি করে এল? তীর্যক ভাষায় জানতে চাইল হারেস।

পিতা বললেন, আজ রাতেই এরা এসেছে। সাথে ডিপুটি ও এক কমান্ডার ছিল। ওদেরকে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি শুধু এতটুকু শুনতে পেয়েছিলাম, সাইফুদ্দীন ডিপুটিকে বলছিল, বিক্ষিপ্ত সৈনিকদেরকে একত্রিত করে আমাকে বল আমি কবে নাগাদ মৌসুল আসব এবং কতদিন পর্যন্ত এখানে লুকিয়ে থাকব...। এতটুকুই আমি দরজার এপাশ থেকে শুনতে পেয়েছিলাম।

আপনি কি এদের কথায় মনে করেন যে, এরা আবার সৈনিকদের পুনর্গঠিত করে প্রতি আক্রমণ করবে? বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল দাউদ।

এ মুহূর্তে এরা খুব ভীতু। আমাকে সাইফুদ্দীন অনুরোধ করেছিল, কেউ যেন তাদের অবস্থান জানতে না পারে। বৃদ্ধ আরো বলল, আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আইয়ূবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা এদের আছে। এই উদ্দেশেই কোন অজানা গন্তব্যে কমান্ডারকে পাঠিয়েছে।

আমি একে হত্যা করব, বলল হারেস। মুসলমানকে ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে ঠেলে দিয়েছে। 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলে ভাই ভাইকে হত্যা করছে। ও আমাকে পাগল বানিয়ে ফেলেছে। হারেস খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল, দেয়ালে ঝুলন্ত তার বাবার তরবারি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্ধত হল।

তার বাবা পিছন থেকে ঝাপটে ধরল তাকে। দাউদ তার বাজু ধরল। অসহায় হয়ে পড়ল হারেস। পিতা তাকে বলল, আগে আমার কথা শোন। দাউদও তাকে বলল, আগে মাথা ঠাণ্ডা করে কি করতে হবে ভেবে নাও। আমরা তাকে হত্যা করেই স্বস্তি নেব কিন্তু এর আগে আমাদের ভাবতে হবে একে হত্যা করা যতটুকু সহজ, ধকল সামলানো অত সহজ নয় হারেস পিতা ও দাউদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থেমে গেল বটে কিন্তু রাগে ক্ষোভে ফোঁসতে লাগল। তার চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছিল অগ্নিস্ফূলিঙ্গ।

একে হত্যা করা কোন কঠিন কাজ নয়। হারেসের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল তার পিতা। সে এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ওকে তো আমার এ দুর্বল হাতেও হত্যা করা সম্ভব। ওর লাশ গুম করে ফেলাও তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এর যে দুই সাথী চলে গেছে, ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে না। ওরা সন্দেহ বশত আমাদেরকে গ্রেপ্তার করবে। তোমার যুবতী স্ত্রী ও কিশোরী বোনের সাথে দুর্ব্যবহার করবে। আমরা যদি বলি 'গভর্নর এখান থেকে চলে গেছে তাহলে ওরা তা বিশ্বাস করবে না। কেননা গভর্নর তাদেরকে এখানেই ফিরে আসতে বলেছে।'

মনে হয় আপনি সাইফুদ্দীনকে সত্য মনে করেন, একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল হারেস। মুসলমানদের ভ্রাতৃঘাতী লড়াইকে কি আপনি ঠিক মনে করেন?

এটা ঠিক যে, আমার ঘরে আমি একে হত্যা করতে চাই না। বলল বৃদ্ধ। তবে আমি তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, তাকে আমি সঠিক মনে করি না। সে বলেছিল, তোমাকে তো সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর সমর্থক মনে হয়। সে আমাকে এই লোভও দেখিয়েছে যে, তোমার ছেলে যুদ্ধে মারা গেলে অনেক টাকা-পয়সা দেব। আমি উত্তরে তাকে বলেছি, আমি ছেলের শাহাদাত প্রত্যাশা করি, পুত্রের অপমৃত্যু বা পয়সার লোভ কখনো করি না। সাইফুদ্দীনের সাথীরা আমাদের মানসিক অবস্থা জানে। আমরা যদি তাকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলি তাহলে তার ডিপুটি আমাদের নিষ্কৃতি দেবে না। তারা বলবে, 'তুমি সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর সহযোগী। এজন্যই মৌসুলের গভর্নরকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছ।'

দাউদ ভাই! তুমি বলতো আমি এখন কি করব? তুমি আমার আবেগ দেখেছ, তুমি তো বলেছিলে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আল্লাহ্ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ পাপিষ্ঠকে হত্যা করার চেয়ে ভাল কাজ আর কি হতে পারে? যে হাজারো মুসলমান সৈনিককে ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছে। অনেক সন্তানকে এতিম, স্ত্রীকে বিধবা, মায়ের কোল খালি করেছে। নাগালে পেয়েও একে হত্যা না করা আর একটি অপরাধ নয় কি? বল! তুমি জ্ঞানী মানুষ, আমাকে পথ দেখাও।

একটা মানুষকে হত্যা করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। বলল্ দাউদ। তার অনেক সহযোগী ও সহকর্মী আলেপ্পো ও হিরনে রয়ে গেছে। এদের মধ্যে অনেক সাধারণ সৈনিক, কমান্ডার, সেনাপতি রয়েছে। শুধু সাইফুদ্দীনকে হত্যা করলে এরা সবাই সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর সামনে হাতিয়ার ফেলে দেবে না। হাতিয়ার সমর্পণ করানোর কৌশল ভিন্ন। এজন্য প্রয়োজন এদেরকে সুকৌশলে রণাঙ্গনে নিয়ে এভাবে বিপন্ন করা যাতে এরা আত্মসমর্পণ করে এবং আইয়ূবীর দেয়া শর্ত মানতে বাধ্য হয়।

এ কাজ আইয়ূবী ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব? আমার বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে এটা কিভাবে নিভবে? এতিম মুজাহিদ সন্তানেরা কি আমাকে ক্ষমা করবে?

মনে মনে দাউদ খুব উৎফুল্ল। শিকার তার হাতের নাগালে। হারেস ও তার পিতাকে তার স্বরূপ জানাতে দ্বিধা করছিল সে। গোয়েন্দা কখনো আবেগের কাছে হার মানতে পারে না এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে না।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে দাউদ নিজের স্বরূপ প্রকাশ না করে কিছুই করতে পারছিল না। মনে মনে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, সাইফুদ্দীন যেখানে যাবে সেও তার

অনুগামী হবে এবং সে সাইফুদ্দীনের সকল তৎপরতা প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু হারেসের ঘরে তার দীর্ঘদিন অবস্থান অসুবিধাজনক মনে হচ্ছিল না। এইজন্য প্রয়োজন ছিল তার স্বরূপ হারেস পরিবারের কাছে প্রকাশ করে দেয়া। বস্তুত তাদেরকে সম্পূর্ণ আস্থায় নিয়েই সে গোয়েন্দাসুলভ কৌশলে তাদের সাথে কথা বলা শুরু করে দিল। সে দেখল, সাইফুদ্দীনকে হত্যার জন্য হারেস অগ্নিশর্মা হয়ে রয়েছে। তার পিতাও আইয়ূবীর দুশমনদের ঘৃণার চোখে দেখে, প্রচণ্ড অবজ্ঞা করে।

যদি আমি তোমাকে এরকম কৌশলের কথা বলি যদ্বারা সাইফুদ্দীন আর কখনো কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না, তাহলে কি আমার কথা মানবে? হারেসকে জিজ্ঞেস করল দাউদ।

আমার ছেলের মত তুমি যদি আবেগে উত্তেজিত হয়ে না থাক, তবে আমি তোমার সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। বলল হারেসের পিতা।

আমি ওকে হত্যা করা ছাড়া ভিন্ন কিছু ভাবতে পারি না। বলল হারেস।

তুমি যদি তোমার বিবেক ও আবেগের লাগাম আমার হাতে দিয়ে দাও, তাহলে তোমার দ্বারা আমি এমন কাজ করাব যা তোমার হৃদয়কে শান্তি এবং মনকে করবে স্থির। দাউদ গভীরভাবে পিতা-পুত্রকে নিরীক্ষা করল। অদূরেই বসে ছিল হারেসের স্ত্রী ও বোন। তারাও শুনছিল তাদের কথাবার্তা। দাউদ তাদের দিকে লক্ষ্য করে বলল, আমাকে একটি কুরআন শরীফ দিন। হারেসের বোন উঠে একটি কুরআন শরীফ চোখে লাগাল, চুমু দিল এবং বুকে স্পর্শ করে দাউদের কাছে এনে দিল। দাউদও কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে স্পর্শ করে চুমু দিল এবং চোখে লাগাল। সে কুরআন শরীফ খুলে পড়তে লাগল, 'শয়তান তাদেরকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ্‌র স্মরণ তাদের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে, এরা শয়তানের দল। জেনে রেখ, শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এরা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়'। আয়াতটি ছিল সূরা হাশরের ১৮ ও ১৯ নম্বর আয়াত। দাউদ কুরআন শরীফ খুলতেই কাকতালীয়ভাবে এ আয়াতটি তার চোখে আটকে গেল। তেলাওয়াতের পর বলল, এটি আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম। আমি এটিকে খুঁজে বের করিনি। আকস্মিকভাবে এই আয়াতগুলোই আমার চোখে ভেসে উঠেছে। এখানে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের সতর্ক বাণী ও সুসংবাদ। কুরআন পরিষ্কার বলে দিয়েছে, 'যারা শয়তানের দলভুক্ত হবে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা ধ্বংস ও পদদলিত হবে'। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা অপমানিত ও লজ্জিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা

তাদের ধ্বংসের ব্যবস্থা না করতে পারি। এটা আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব। শয়তানের দলভুক্তদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনার ব্যবস্থা করা।

সে দুহাতে কুরআন মেলে ধরে সবার উদ্দেশে বলল, সবাই নিজেদের ডান হাত আল্লাহ্র পবিত্র কালামের উপর রাখ এবং প্রতিজ্ঞা কর এই রহস্য কখনো ভেদ করবে না এবং শত্রুকে পরাজিত করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে।

ঘরের সবাই কুরআন শরীফের উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল, তারা কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। কুরআন শরীফের মর্যাদা ও মহিমান্বিত প্রভাবে সারা ঘরের মধ্যে পিনপতন নিরবতা নেমে এল। ভারি হয়ে এল সবার নিঃশ্বাস। অপার বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে রইলো দাউদের দিকে।

তোমরা সবাই কুরআন শরীফের উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছ, বলল দাউদ। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাতৃভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন, কুরআনের প্রতিটি শব্দের অর্থ তোমরা জান এবং বোঝ। তোমরা যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর এর শাস্তি কুরআনে কি তাও তোমরা জান। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তোমাদেরও পরিণতি হবে শয়তানের দোসরদের মত।

তুমি কে বাবা? এসব কি বলছ! বিচলিত কণ্ঠে দাউদকে জিজ্ঞেস করল হারেসের পিতা। মনে তো হয় তুমি অনেক বড় আলেম অথবা কোন কামেল ব্যক্তির মুরিদ।

না, আমি তেমন কোন আলেম নই। তবে আলেমদের নির্দেশিত পথেই আমি চলি। আমি কুরআনের নির্দেশে জীবন বাজি রেখে এখানে এসেছি। আমি এ শিক্ষা সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর কাছ থেকে পেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আমি মৌসুলের বাসিন্দা নই, দামেস্কের অধিবাসী। আমি কোন যাযাবর নই। সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনীর একজন। এটাই হল সেই রহস্য যা প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছি। তোমাদের সকলের সহযোগিতা আমার দরকার। আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দাও; আমি যা বলব তাই তোমরা করবে।

আমরা তো প্রতিজ্ঞা করেই বসেছি, তোমার যা বলার তা বলবে তো। বলল বৃদ্ধ।

আমার লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, বলল দাউদ। আমি যার হৃদয়ের কূট-কৌশল, চক্রান্ত বের করে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর কাছে পৌঁছাতে চাই, সেই ব্যক্তি ছাদের নিচেই ঘুমিয়ে আছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এখানে পৌঁছাতে অলৌকিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমাকে জানতে হবে সাইফুদ্দীন ও তার সহযোগিরা কি করতে চায়, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? যদি এরা পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়

তাহলে এদের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে অথবা এর আগেই সব অপতৎপরতা ভণ্ডুল করে দিতে হবে। তাদের পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়নের আগেই আমাদের জানতে হবে। এমনও তো হতে পারে যে, সুলতান আইয়ূবী যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত আর এ সুযোগে শত্রু বাহিনী আকস্মিক হামলা করে বসল। আপনি কি বুঝতে পারেন তখন এর পরিণতি কি হবে?

তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে ধোকা দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করাচ্ছে একে আমি এখানেই হত্যা করে ফেলি? বলল হারেস।

সময় হলে আমি তোমাকে বলব, বলল দাউদ। কোন কোন সময় হত্যা না করাও উপকারী। তোমাকে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়। সাইফুদ্দীনের প্রতি আমাদের গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তার পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। সাইফুদ্দীন যেভাবে এখানে লুকিয়ে রয়েছে আমি এবং হারেসও তার দৃষ্টির আড়ালে থাকব এবং তার যাবতীয় তৎপরতা প্রত্যক্ষ করব।

* * *

সাইফুদ্দীন এই বাড়ির একটি ঘরে গভীর ঘুমে অচেতন। ভোর বেলায় বৃদ্ধ উঁকি দিয়ে দেখল, সে তখনো ঘুমাচ্ছে। বেলা অনেক হওয়ার পর তার ঘুম ভাঙ্গলো। হারেসের বোন ও স্ত্রী তার জন্য নাস্তা নিয়ে এল। সাইফুদ্দীন হারেসের বোনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, তোমরা আমার যে সেবা করছ এর পরিবর্তে এমন পুরস্কার তোমাদের দেব যা তোমরা কল্পনাও করতে পার না। তোমাকে আমি আমার শাহী মহলে রাখব।

আপনাকে যদি আমরা এই কুঁড়ে ঘরেই রেখে দেই তাহলে কি আপনি নারাজ হবেন, অসন্তুষ্ট হবেন? স্মিত হেসে বলল কিশোরী।

আমরা তো মরুভূমিতেও থাকতে পারি। বলল সাইফুদ্দীন। কিন্তু তোমরা তো ফুলের মতো সাজিয়ে রাখার জিনিস।

আপনি কি মনে করেন যে, শাহী মহলে আবার ফিরে যেতে পারবেন? বলল কিশোরী।

তুমি এ কথা বলছ কেন?

আপনার অবস্থা দেখে। বলল কিশোরী।

কুঁড়ে ঘরে লুকিয়ে থাকাই প্রমাণ করে বাদশাহর রাজত্ব হাত ছাড়া হয়ে গেছে এবং তার সৈন্যসামন্ত তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

সৈন্যরা আমাকে ছেড়ে যায়নি, বলল সাইফুদ্দীন। আমি একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য এখানে এসেছি। রাজমহলে ফিরে যাওয়া শুধু আমার ভাগ্যে নয়, তোমার ভাগ্যেও লেখা হয়ে গেছে। তুমি কি আমার সাথে যাওয়া পছন্দ কর না?

হারেসের স্ত্রী কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিশোরী সাইফুদ্দীনের অদূরে বসে গেল এবং বলল, যদি আপনার জায়গায় আমি হতাম তাহলে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীকে পরাজিত না করে ঘরে ফেরার নাম নিতাম না। যদি আপনি আমাকে পছন্দ করে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি আপনার এই পালিয়ে আসা এবং লুকিয়ে থাকা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। যুদ্ধ কৌশলী শাসকদের মত আপনি ময়দানে বেরিয়ে যান, বিচ্ছিন্ন সৈনিকদেরকে একত্রিত করুন এবং সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর উপর আক্রমণ করুন।

কিশোরীটি ছিল একেবারেই সাদাসিদে। তার বক্তব্যে কোন প্রতারণা ছিল না। সাইফুদ্দীন তাকে খুব তন্ময় হয়ে দেখছিল এবং তার ঠোঁটে খেলা করছিল পৈশাচিক হাসি ও পাশবিক লিপ্সা।

আমি তো শাহাজাদী নই, বলল কিশোরী। এই মরুভূমি এবং উপত্যকাতেই জন্ম নিয়েছি, এখানেই বেড়ে উঠেছি। আমি সৈনিকের মেয়ে এবং সৈনিকের বোন। আপনার সাথে রাজপ্রাসাদে নয় রণাঙ্গনে যেতে আমি প্রস্তুত। আপনার সাথে আমি তরবারি নিয়ে খেলা করব। আমাকে পেতে হলে মরুভূমিতে, পাহাড়ের ঢালে, টিলার উপরে আপনাকে ঘোড়া ছুটাতে হবে।

তুমি শুধু সুন্দরীই নও, লড়াকুও বটে। সাইফুদ্দীন তার চুল হাতে নিয়ে বলল, এত সুন্দর রেশমী চুল জীবনে আর কখনো দেখিনি।

কিশোরী সলজ্জ বিনয়ে সাইফুদ্দীনের হাতটি সরিয়ে দিল এবং বলল, রেশমী চুল নয় এ মুহূর্তে আপনার দরকার আমার বাহু, আমার শক্তি। আপনি আমাকে বলুন তো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

তোমার বাবা একজন বিপজ্জনক লোক। বলল সাইফুদ্দীন। মনে হয় সে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর সহযোগী। আমাকে হয়ত অপছন্দ করে। আমার ভয় হয় সে আমাকে আবার ধোকা না দেয়।

খিলখিলিয়ে হেসে ফেলল কিশোরী। বলল, তিনি বুড়ো মানুষ। জানি না আপনার সাথে কি কথা বলেছেন। তিনি রাত থেকেই আমাদের কাছে আপনার প্রশংসা করছেন। সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর নাম শুনেছেন মাত্র। তার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এজন্য আপনি ভয় করবেন না। বৃদ্ধ মানুষ আর আপনার কি ক্ষতি করতে পারবেন? আমাকে পরীক্ষা করুন।

সাইফুদ্দীন কিশোরীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কিশোরী দূরে সরে গিয়ে বলল, আপনার সব আশা পূর্ণ হবে। আপনি আমাকে পেতে পারেন তবে এর জন্য আপনাকে শর্ত পালন করতে হবে। তখনি আপনি আমাকে পাবেন যখন সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীকে পরাজিত করে ফিরে আসবেন। আপনি এখন সঙ্কটে রয়েছেন, এ মুহূর্তে...। আচ্ছা আপনি আমাকে বলুন তো, ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি কি ভাবছেন?

সাইফুদ্দীন ছিল আরামপ্রিয়, বিলাসী, ভোগবাদী ও নারীলিপ্সু। সুন্দরী যুবতী নারী তার জন্য মোটেও দুর্লভ ছিল না। কিন্তু এই পল্লীর সরলা মায়াবী মেয়েটির নির্মল অভিব্যক্তি ও বুদ্ধিমত্তা তাকে বিমোহিত করে ফেলেছে। সবচেয়ে আকর্ষণের ব্যাপারটি এই ছিল যে, মেয়েটি তার আকাঙ্ক্ষাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। অথচ এর চেয়েও সুন্দরী, অভিজাত যুবতী মাত্রই তার ঈশারায় নাচতে শুরু করে। বস্তুত এই অবলা মেয়েটি তার পৌরুষকে এইভাবে আঘাত করেছিল যে, তার আভিজাত্য ও অহংবোধে মারাত্মক ঘা লেগেছিল।

শোন মেয়ে! বলল সাইফুদ্দীন। তুমি আমার পৌরুষের পরীক্ষা নিতে চাও। ঠিক আছে, সেইদিনই তোমাকে আমি তুলে নেব যেদিন সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর তরবারী আমার মুষ্ঠিবদ্ধ থাকবে। আইয়ূবীর ঘোড়ায় আমি সওয়ার থাকব। আমাকে কথা দাও, সেদিন তুমি আমার কাছে আসবে তো?

আমাকে কি আপনার সাথে যুদ্ধে নিয়ে যাবেন? অতি সরল কণ্ঠে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল কিশোরী।

না, তা হতে পারে না। বলল সাইফুদ্দীন। আগে আমার সৈন্যদের সংগঠিত করতে হবে। এক কমান্ডারকে আমি মৌসুল পাঠিয়েছি। তাকে আমি বলে দিয়েছি বিচ্ছিন্ন সৈন্যদের একত্রিত করে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণের প্রস্তুতি নিতে। যাতে সে আমাদের শহরগুলোকে ঘেরাও করতে না পারে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে উভয়েই ফিরে আসলে জানা যাবে আলেপ্পো ও হিরনের সৈনিকদের অবস্থা ও পরিস্থিতি কি? আমরা পরাজয়কে মেনে নিচ্ছি না। শীঘ্রই প্রতিআক্রমণ করব, অবশ্যই করব।

সাইফুদ্দীনের ব্যক্তিত্ব ছিল এমনি। ক্ষমতা ও নারী লিপ্সা তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সে এক সরলা গেঁয়ো মেয়ের কৌশলের কাছে নিজের রণ-কৌশল প্রকাশ করে দিল। সাইফুদ্দীনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আত্মস্থ করার পর কিশোরী তাকে অভিবাদন জানিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল।

সাইফুদ্দীনের সাথে যে দু'জন সৈনিক এসেছিল এদের একজন মৌসুল আর অপরজনকে আলেপ্পো পাঠিয়েছে। হারেসের বোন পিতা, ভাই ও দাউদকে বলল,

তার চাতুর্যপূর্ণ কৌশলের কথা। সে আরো বলল, গভর্নর চাচ্ছে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী যাতে তাদের শহর ঘেরাও করতে না পারেন এজন্য তিন বাহিনীকে আবার একত্রিত করে সালাহ্ উদ্দীনের উপর আক্রমণ করবে। যে দু'জনকে সে পাঠিয়েছে এরা ওখানকার সৈন্যরা পুনরায় যুদ্ধ করার মতো সাহস রাখে কি-না তা জানার জন্যে গিয়েছে। সাইফুদ্দীন হারেসের বোনকে যা বলেছিল তা সে পিতা, ভাই ও দাউদকে বলল।

এতক্ষণ আমরা যে মেয়েটির কথা বললাম, সেই কিশোরী মেয়েটির নাম ফৌজী। ফৌজী বেদুঈন মেয়ে। লেখাপড়া তেমন নেই। কুরআন শরীফ ও আনুসঙ্গিক সামান্য কিছু পড়া লেখা করেছে মাত্র। তেমন চালাক চতুরও নয়। কিন্তু একটা ন্যায়নিষ্ঠা পারিবারিক ঐতিহ্য ও আরব বেদুঈন হিসেবে লালন করে ফৌজী। ইসলামী চেতনা তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। চতুর না হলেও সচেতন। দাউদ তাকে কিছুটা কৌশলী হওয়ার তালীম দিল। বলল, সাইফুদ্দীন দীন ও ইসলামের দুশমন। সে ক্ষমতার লোভে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর জিহাদকে বেঈমান বিধর্মীদের সহায়তায় নস্যাৎ করে দিতে তৎপর। সে জাতির ঘোরতর শত্রু। জাতীয় স্বার্থে তুমি কিছুটা অভিনয় করে ওর মনের খবর নিতে চেষ্টা করবে। তবে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে। ও খুবই ধূর্ত এবং নারী লিপ্সু। নিজের মান-সম্ভ্রমের প্রতি খেয়াল রেখো। কখনও ওর দেয়া লোভে ভুলে যেও না নিজের আদর্শ।

ফৌজী ধারণার চেয়েও বেশী কৌশলে সাইফুদ্দীনের মনের গহীনে লুকিয়ে রাখা কথা বের করে এনেছে। দাউদ ভাবতেও পারেনি এই বেদুঈন মেয়েটি এতোটা দক্ষতার সাথে পাকা গোয়েন্দার মতো কাজ করতে পারবে। ফৌজীর কাছে সাইফুদ্দীনের পরিকল্পনা জানার পর দাউদ সিদ্ধান্ত নিল, কুচক্রীদের চক্রান্ত ভণ্ডুল করতে হলে সাইফুদ্দীনের অনুসরণ করার বিকল্প নেই। ওর তৎপরতা জানতে হবে এবং সে কোথায় কি করতে যাচ্ছে এসব বুঝতে হবে।

প্রায় মাঝ রাতে বৃদ্ধের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি শুনতে পেলেন বাইরের দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। অশ্বের হ্রেষারবও শোনা যাচ্ছে। বৃদ্ধ বিছানা ছেড়ে দরজা খুললেন। বাইরে সাইফুদ্দীনের ডিপুটি দাঁড়িয়ে।

বৃদ্ধ তার ঘোড়া বেঁধে রাখার জন্যে আস্তাবলের দিকে পা বাড়ালেন। ডিপুটি গেট পেরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল, যে ঘরে সাইফুদ্দীন ঘুমিয়ে ছিল। ঘোড়া বেঁধে রেখে ফিরে এসে ডিপুটিকে খাবারের আবেদন করলেন বৃদ্ধ। ডিপুটি খাবার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল। বৃদ্ধ দাসের মতো বিনয় নম্রভাবে তাকে আবারো খানার জন্যে অনুরোধ করলেন কিন্তু ডিপুটি তার অনুরোধে পাত্তা দিল না। সাইফুদ্দীন বৃদ্ধকে বলল, 'তুমি ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। ওর খাবারের প্রয়োজন নেই।' বৃদ্ধ একজন

নগণ্য প্রজার মতো খুবই কাচুমাচু করে তাদের অভিবাদন জানিয়ে কামরা ত্যাগ করলেন। ঘরে এসে তিনি দাউদকে জাগিয়ে সাইফুদ্দীনের ডিপুটির আগমন বার্তা জানালেন। দাউদ বৃদ্ধকে নিয়ে সাইফুদ্দীনের ঘরের দেয়ালে কান লাগিলে ওদের কথাবার্তা শোনার জন্য ওঁৎ পেতে রইল।

"গোমশতগীন এখন মালিক আস-সালেহ এর আশ্রয়ে আলেপ্পোয় রয়েছে বলে জানা গেছে।" বলল সাইফুদ্দীনের ডিপুটি। মৌসুলে আমি যে পরিস্থিতি দেখেছি তাতে মনে হচ্ছে আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধের উপযুক্ত। সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী তুর্কমানে অবস্থান করছে। খ্রিস্টান গোয়েন্দারা বলেছে, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী আলজেরিয়া, দিয়ার ও বকরা ইত্যাদি এলাকা থেকে তার বাহিনীতে লোক ভর্তি করছে। তার তৎপরতা থেকে মনে হচ্ছে, খুব শীঘ্রই সে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না। সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী আরো অগ্রসর হবে হয়তো তবে বিগত দিনের মরু ঝড়ে তার তাঁবু ও রসদপত্র বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এসব না গুছিয়ে হয়তো সে আর অগ্রসর হবে না। তাছাড়া সে হয়তো ভাবছে, আমাদের সৈন্যদের হয়তো যুদ্ধ করার মতো অবস্থা নেই। মৌসুলে আমাদের সেনাবাহিনীর যেসব সৈন্য ফিরে এসেছে সংখ্যায় এরা এক তৃতীয়াংশেরও কম হবে। অধিকাংশ সৈন্যই মারা গেছে, নয়তো হারিয়ে গেছে।"

"এতো অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর উপর আবার হামলা করা কি সম্ভব?" জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলল সাইফুদ্দীন।

"শুধু আমাদের বাহিনী আক্রমণের জন্যে যথেষ্ট হবে না। মালিক ও গোমশ্তগীনের সৈন্যদেরও আমাদের সাথে একত্রিত করতে হবে।' বলল ডিপুটি।

"আমি কোথায় অবস্থান করছি, একথা কি তুমি সৈন্যদের বলেছো?"

"আপনি এখানে লুকিয়ে রয়েছেন একথা আমি বলিনি। আমি মিত্রদের এবং আমাদের সৈন্যদেরকে বলেছি, গভর্নর তুরকমান এলাকায় ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর তৎপরতা নিজ চোখে দেখার চেষ্টা করছেন। যাতে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রণয়নে সুবিধা হয়। আমার মনে হয় আর তিন চার দিনের মধ্যে আপনার মৌসুল পৌঁছা উচিত। বলল ডিপুটি।

"মৌসুল যাওয়ার আগে আমাকে আলেপ্পোর সংবাদ নিতে হবে। আশা করি কমান্ডার আগামীকালের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তুমি কি জানো, গোমশতগীন শয়তানের মতো ধূর্ত। সে তো তার কেল্লা হিরনে যাওয়ার কথা। ওখানে না গিয়ে সে আলেপ্পোতে কি করছে? মৌসুল যাওয়ার আগে আমাকে আলেপ্পো যেতে হবে। গোমশতগীন আমাদের মিত্র বটে কিন্তু তাকে আমি কখনও বন্ধু মনে করি না। মালিক আস্-সালেহ-এর কমান্ডারদেরকে সম্মত করাতে হবে যে, সালাহ

উদ্দীন আইয়ূবীর প্রস্তুতির সুযোগে তারা যেন পুনর্বার আক্রমণে আমাদের সহযোগিতা করে। তাদের একথাও বোঝাতে চেষ্টা করব যে, তিন বাহিনীর যৌথ কমান্ডের বদলে একক কমান্ডের অধীনে যুদ্ধ করা উচিত। আর কমান্ড আমার হাতে আনার চেষ্টা করব। তাদের বোঝাতে হবে, বিগত যুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন কমান্ড হওয়ার কারণে আমরা একে অন্যের কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম; যার ফলে আমাদের পরাজিত হতে হয়েছে। তা না হলে মুজাফফর উদ্দীন, আইয়ূবী বাহিনীর উপর যে তীব্র আক্রমণ করেছিল তা কখনও ব্যর্থ হতো না।"

"কেন্দ্রীয় কমান্ড আপনার হাতে থাকা উচিত।" বলল ডিপুটি।

"মিত্রদের সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।" বলল সাইফুদ্দীন। "আচ্ছা তুমি কি বলতে পারো, খ্রিস্টানরা কি আমাদের সহযোগিতা করবে?"

"ওরা সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করবে না; তবে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং উট-ঘোড়া দিয়ে সহযোগিতা করবে। মহামান্য গভর্নর! আপনি এখানে কোনরূপ নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন না তো?" জিজ্ঞেস করলো ডিপুটি।

"না। বুড়োকে বিশ্বস্তই মনে হয়। আর ওই মেয়েটিও আমার জালে ধরা দিয়েছে। তবে মেয়েটি খুব আবেগ প্রবণ। বলে কি জানো! 'আপনি সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীকে পরাজিত করে, তার তরবারী হাতে নিয়ে, তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসেন, তাহলে আমি আপনার সাথে চলে যাবো।"

সাইফুদ্দীনের কথা শুনে ডিপুটি অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল। বৃদ্ধ ও দাউদ দেয়ালে কান লাগিয়ে ওদের সব কথাই শুনছিল। সাইফুদ্দীন ও তার ডিপুটি মোটেও জানে না যে, বৃদ্ধের ঘরে বুড়ো ও দু'টি মেয়ে ছাড়া আরো দু'জন যুবকও রয়েছে যারা সুযোগ পেলে সাইফুদ্দীনকে হত্যাও করতে পারে। সাইফুদ্দীন ঘুর্ণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেনি, সে ফৌজীকে তার ফাঁদে আটকায়নি বরং সে নিজেই ফৌজীর পাতা জালে আটকে গেছে।

* * *

দাউদ ও হারেস ঘরের ভিতরেই অবস্থান করল। পরদিন ফৌজী কয়েকবার গেল সাইফুদ্দীনের ঘরে। ফৌজী সাইফুদ্দীন থেকে নিরাপদ দূরে দূরে থেকে কথা বলতো। ফৌজীর দূরত্ব বজায় রাখার কারণে নারী লিপ্সু সাইফুদ্দীন ফৌজীকে বাহুবদ্ধ করতে, ওকে কাছে টানতে উদগ্রীব হয়ে পড়ল। ফৌজীকে আকৃষ্ট করতে সে বলল, "তোমার ভাই আমার সেনাবাহিনীতে একজন সাধারণ সৈনিক মাত্র, এবার তাকে আমি কমান্ডার বানিয়ে দেব।"

"আমরা তো এটাই জানি না যে, ভাই জীবিত আছে না মারা গেছে। সে মারা গেলে আমরা খুবই অসহায় হয়ে যাবো।" বলল ফৌজী।

ফৌজীর বৃদ্ধ পিতাও দিনের বেলায় সাইফুদ্দীনের থাকার ঘরে কয়েকবার গিয়ে তাদের সেবাযত্নের খোঁজ খবর নিলেন। কোন কিছুর প্রয়োজন, অসুখ-অসুবিধা হচ্ছে কি না জানতে চাইলেন অতি বিনয়ের সাথে। তিনি সাইফুদ্দীনকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, প্রথম রাতে কিছুটা বিরূপ কথা বললেও সাইফুদ্দীনের প্রতি বিশ্বস্ত তিনি।

রাতে আবার সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বৃদ্ধ দরজা খুললেন। সাইফুদ্দীনের কমান্ডার আলেপ্পো থেকে ফিরে এলো। বৃদ্ধ কমান্ডারকে সাইফুদ্দীনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আস্তাবলে ঘোড়া বেঁধে কমান্ডারের খাবারের আয়োজন করতে হবে কি-না জানতে গেলেন। কমান্ডার ছিল ক্ষুধার্ত, পথিমধ্যে সে কোথাও বিশ্রাম-আহারের ফুরসত পায়নি। বৃদ্ধ কমান্ডারের জন্যে খাবার আনতে ঘরে গেলে ফৌজী আবদার করল, সে নিজে খাবার নিয়ে যাবে, যাতে তাদের কথাবার্তা শুনতে পায়।

ফৌজী খাবার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেই কমান্ডার কথা বলা বন্ধ করে দিল। সাইফুদ্দীন বলল, 'বল, ও আমাদেরই মেয়ে।' ফৌজী কমান্ডারের সামনে খাবার রেখে সাইফুদ্দীনের সামনে গিয়ে বসল। অন্যদিনের চেয়ে ফৌজী একটু কাছে বসল সাইফুদ্দীনের। সাইফুদ্দীন ফৌজীর হাত নিজের হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ফৌজী অনুভব করল এ মুহূর্তে সাইফুদ্দীনের হাত থেকে হাত সরিয়ে নিলে সে অপমানবোধ করে তার প্রতি বিরাগ হবে এবং ওর কাছ থেকে আর কোন গোপন কথা বের করা সম্ভব হবে না। তাই বৃহত্তম স্বার্থে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে হাত ছাড়িয়ে নেয়া থেকে বিরত রইল। কান পেতে থাকল ওদের কথা শুরু হওয়ার অপেক্ষায়।

"আলেপ্পোর সৈন্যরা এখনও যথেষ্ট উজ্জীবিত।" বলে কথা পুনরায় শুরু করল কমান্ডার। ফৌজী সাইফুদ্দীনের আঙ্গুল থেকে হিরের আংটি খুলে নিয়ে নিজের আঙ্গুলে পুরে হিরেটিকে শিশুদের মতো বিস্ময়ভরে দেখতে ল..গল। ভাবটা এমন যে কমান্ডারের কথার প্রতি তার মোটেও কোন আগ্রহ নেই। এথচ সে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে কমান্ডারের কথার প্রতি।

"মালিক আস্-সালেহ্ সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীকে সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়েছে।"

"সন্ধি প্রস্তাব! গর্জে উঠল সাইফুদ্দীন।"

"জ্বী হ্যাঁ! সন্ধি প্রস্তাব। বলল কমান্ডার। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি তিনি সন্ধি প্রস্তাবের নামে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীকে ধোঁকা দেয়ার জন্যই সন্ধিপ্রস্তাব

পাঠিয়েছেন। খ্রিস্টান মিত্ররা তার সৈন্যদের রসদ সামগ্রীর ঘাটতি পূরণ করে দিচ্ছে এবং তাকে উস্কানি দিচ্ছে মৌসুল ও হিরনের সৈন্যদেরকে একত্রিত করে সকল সৈন্যের কমান্ড নিজের হাতে নিয়ে পুনরায় আইয়ূবীর উপর ঝটিকা আক্রমণ করতে। তারা আরো বলছে, সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী যদি বিশ্রাম নিতে পারে আর বিভিন্ন এলাকা থেকে নতুন সৈন্য ভর্তি করে তার লোকবলের ঘাটতি পূরণ করে নিতে পারে তবে তাকে পরাজিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। গোয়েন্দারা খবর দিয়েছে, সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী তুর্কমানের উর্বর এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী তাঁবু ফেলেছে এবং খুব দ্রুত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মালিকের সেনাপতিও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন "আইয়ূবীর উপর শীঘ্রই আক্রমণ করা উচিত।"

"আমি আলেপ্পো বাহিনীর এক খ্রিস্টান উপদেষ্টার সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি পরিচয় আড়াল করে বললাম, আমরা এখনই হামলা করার উপযুক্ত নই। তখন সে বলল, এটা হবে তোমাদের বড় ভুল। সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর উপর আক্রমণের অর্থ এই নয় যে, তাকে পরাজিত করতে হবে বরং দ্রুত আক্রমণের লক্ষ্য হলো সে যেন প্রস্তুতির অবকাশ না পায়। তাকে তুর্কমান অঞ্চলে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতে হবে। তাকে তার কৌশলেই মোকাবেলা করতে হবে। মুখোমুখি সংঘর্ষে না গিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। গুপ্ত হামলা করতে হবে এবং সরে আসতে হবে। মোটকথা, তুর্কমানের সবুজ শ্যামল উর্বর অঞ্চল থেকে তাকে সরিয়ে দিতে হবে যাতে তার বাহিনী পানি ও ঘাস সমৃদ্ধ অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং তার বাহিনী ও জীবজন্তুগুলো পানাহারের সঙ্কটে নিপতিত হয়।"

"খুবই সুন্দর পরিকল্পনা।" বলল সাইফুদ্দীন। এ ধরনের যুদ্ধ আমার সিংহ সেনাপতি মুজাফফরই করতে পারে। সে বহুদিন সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর বাহিনীতে ছিল। আমি চেষ্টা করব তিন বাহিনীর কমান্ড আমার হাতে নিয়ে নিতে। আমি মরু শিয়ালের মতো ধোঁকা দিয়ে দিয়ে আইয়ূবীকে মরুভূমিতে শুকিয়ে মারব।

"ফৌজী সাইফুদ্দীনের তরবারী কোষমুক্ত করে সেটিতে হাত বুলিয়ে দেখছিল। সে তন্ময় হয়ে দেখছিল তরবারীটি উল্টে পাল্টে।"

"মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করতে আমি বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেনা কর্মকর্তা ও অফিসারগণ তাকে এভাবে ঘিরে রেখেছে যে, তার সাথে মোলাকাতের সুযোগ আর হলো না। এসব বিষয় আমি তার কমান্ডার ও সেনা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জেনেছি।"

"তোমাকে আবার আলেপ্পো যেতে হবে'। বলল সাইফুদ্দীন।

মালিক আস্-সালেহকে এ পয়গাম দিতে হবে যে, তুমি আইয়ূবীর কাছে সন্ধি

প্রস্তাব পাঠিয়ে আমাদের ধোঁকা দিয়েছ এবং তার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ। সে আমাদের কাউকেই ক্ষমা করবে না। তুমি এখনও অনেক ছোট্ট। তুমি হয়তো হতাশ হয়ে গেছো, অথবা যুদ্ধ বিমুখ তোমার সেনা কর্মকর্তারা তোমাকে যুদ্ধে নিরুৎসাহিত করছে।"

সাইফুদ্দীন পয়গাম সম্পর্কে দীর্ঘ দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলল, "ভোরের অন্ধকারেই তোমাকে চলে যেতে হবে। সকালে যাতে তোমাকে এ গ্রামের কেউ দেখতে না পায়।"

কমান্ডার রাতের কিছু অংশ বিশ্রাম করে রাতের অন্ধকার থাকতেই গ্রাম ছেড়ে আলেপ্পোর উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল।

"ফৌজী যা কিছু শুনল সবই এসে হারেস ও দাউদকে জানাল। ফৌজীর এ তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হারেস ও তার পিতা শুয়ে পড়লে দাউদ কি জন্য যেন বাইরে বের হল। পা টিপে টিপে দাউদের অনুসরণ করল ফৌজী। দাউদ সোজা আস্তাবলে তার ঘোড়ার কাছে গিয়ে থামল। ফৌজীও নীরবে অতি সন্তর্পণে দাউদের কাছে চলে এল।

"এর চেয়েও আমাকে আরো বড় কোন কাজ দাও দাউদ ভাই!" বলল ফৌজী। আমি তোমার জন্য জীবন দিয়ে দেব।

"আমার জন্যে নয়, জাতির জন্যে এবং ইসলামের জন্যে জীবন দাও। যে কাজ তুমি করছ সেটি অনেক বড় কাজ ফৌজী! আমি যে কাজ করছি সেটি জীবন দেয়া নেয়ার কাজ। আর সেটিই করছ তোমরা। আমি তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছি ফৌজী!" বলল দাউদ।

"বিপদের আবার কি?"

"তুমি এতোটা বুঝবে না। সাইফুদ্দীন বাদশা। ঝুপড়িতে থাকলেও সে বাদশাই বটে। তুমি তার চালাকি বুঝবে না ফৌজী!"

"হু। বাদশা কি আমাকে গিলে ফেলবে ভাবছো! আমি চালাক না হতে পারি, তোমরা যতোটা বোকা মনে কর অতটা বোকা আমি নই। আচ্ছা তোমার বাড়ি কোথায়?"

"আমার কোন ঠিকানা নেই। আমি গোয়েন্দা, গুপ্ত সেনা। যেখানেই দুশমনদের হাতে মারা যাবো সেটিই হবে আমার ঠিকানা, সেটিই হবে আমার বাসস্থান। শহীদানের রক্ত যে যমীনের উপর পড়ে সেটি কোন না কোন একদিন ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হবেই হবে। এ যমীনকে কুফরী আগ্রাসন থেকে মুক্ত করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। আমাদের মা-বোনেরা আমাদের

লালন-পালন করে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করেছে। তারা বুকে পাথর বেঁধে সেই আশা ছেড়েই আমাদের বিদায় করেছে যে, আমরা পুনর্বার তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাবো।"

"নিজের বাড়ি ফেরার, নিজের মা-বোনকে দেখার আগ্রহতো তোমার মধ্যে অবশ্যই আছে।" আবেগমাখা কণ্ঠে বলল ফৌজী।

"মানুষ যখন স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার পূজারীতে পরিণত হয় তখন কর্তব্য অবহেলিত হয়ে পড়ে। এ পথে জীবন ত্যাগের আগে আবেগকে কুরবানী করতে হয়। এ পথে অগ্রসর হতে হলে তোমাকেও আবেগকে কুরবান করতে হবে ফৌজী।"

"ফৌজী দাউদের গা ঘেঁষে বলল, দয়া করে আমাকেও কি তোমার সাথে নেবে দাউদ ভাই!"

"না।"

"কিছুদিন কি তুমি আমাদের সাথে থাকতে পারবে না?"

"যদি প্রয়োজন মনে হয় তবে থাকতে পারি।" বলল দাউদ। "আমাকে তোমার কাছে রেখে কি করবে ফৌজী?"

"তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।" যেদিন থেকে তুমি এসেছো, আর আমি তোমার কথা শুনেছি। এমন সুন্দর কথা জীবনে আর কখনও শুনিনি। আমার মন চায় বাকী জীবন তোমার সাথে থাকতে...।

"আমার পায়ে শিকল দিও না ফৌজী! নিজেকেও আবেগের শিকলমুক্ত রাখ। সামনে আমাদের জন্য কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। অবশ্য পারস্পরিক সহযোগিতা আমাদের দরকার হবে। আমরা এক সাথে থাকবো বটে কিন্তু একজন অপরজনকে মায়ার বাঁধনে বাঁধবো না।... কিছুক্ষণ নীরব থেকে দাউদ বলল, ফৌজী! তুমি বেশী সময় আমার সঙ্গী হতে পারবে না। তোমার সম্ভ্রম আমার কাছে পবিত্র আমানত। যে কাজ পুরুষের সেটি পুরুষকেই করতে হবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফৌজী উদাস হয়ে গেল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কী যেন খুঁজে ফিরল দাউদের মধ্যে। ঘরে ফিরে যেতে উদ্যত হল সে। এ সময় দাউদ হাত বাড়িয়ে ফৌজীর বাজু টেনে ধরল। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফৌজী দাউদের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দাউদ তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। ফৌজী আবেগে কম্পমান কণ্ঠে বলল, পুরুষের কাজ মেয়েরাও করতে পারে। আমার সম্ভ্রম এমন কোন ঠুনকো কাগজের টুকরো নয় যে, আগুনের ধোঁয়ায় পুড়ে যাবে। আমি তোমাকে আমার সম্ভ্রম অর্পণ করতে আসিনি। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তোমার

কথা আমাকে নতুন জীবনের দিশা দিয়েছে। যে পথ তুমি আমাকে দেখিয়েছ সেটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি তোমার সান্নিধ্যে এজন্য এসেছি যে, এতে হয়তো তুমি তোমার বোনের পরশ পাবে। তুমি তো ক্লান্ত, তাই না দাউদ ভাই? আমাকে ভাবি বলেছে—"পুরুষ যখন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে তখন নারী সান্নিধ্য ছাড়া পুরুষের ক্লান্তি আর কোন কিছু দূর করতে পারে না। নারী না থাকলে পুরুষের পৌরুষ থাকে না। জীবনীশক্তি মরে যায়।" আমি তোমার প্রাণকে বাঁচাতে চাই, তোমাকে সাহসী ও উজ্জীবিত রাখতে চাই। তুমি যদি নিষ্প্রাণ হয়ে যাও, তাহলে কি হবে দাউদ?

দাউদ হেসে ফেলল। ফৌজীর থুতনীতে চিমটি কেটে বলল, "সত্যিই ফৌজী তোমার আন্তরিক মমতা, অকৃত্রিম কথাগুলো আমার প্রাণকে সজীব করে দিয়েছে।"

"আমার কোন কথা তোমাকে কষ্ট দেয়নি তো? আমার ভাইকে তো বলে দেবে না যে, আমি একাকী তোমার কাছে আস্তাবলে এসেছিলাম?"

"না। তোমার ভাইকে কখনো তোমার এখানে আসার কথা বলব না। আর তোমার কোন কথাই আমাকে কষ্ট দেয়নি।"

"মনে হয় তোমার আর আমার পথ একই পথ, দাউদ ভাই! আমি অশিক্ষিত। মনের সব কথা বলতেও জানি না।"

"মনের কথা তুমি বলে ফেলেছ ফৌজী। তুমি ঠিকই বলেছ, আমার আর তোমার পথ অভিন্ন। আমি ঠিকই তোমার হৃদয়ের কথা বুঝতে পেরেছি। তবে একথা ভুলে যেও না। আমাদের গমন পথে বিশাল রক্ত ফোরাত। যেখানে কোন সেতু নেই, পুল নেই। তুমি যদি জীবনসঙ্গী হিসেবে আমাকে পেতে চাও, তবে আমাদের পরিণয় লেখা হবে রক্ত দিয়ে। আল্লাহ্‌র পথের সৈনিকদের শাদী আসমানে হয়ে থাকে, আর আসমানের পথে পথে তাদের মিলন হয়। আকাশের তারকারাজী তাদের শাদীতে আলোকসজ্জা করে।"

ঘরে ফিরে এল ফৌজী। অজানা পথে রাতের আঁধারে হারিয়ে গেল দাউদ। ফৌজী ফিরে এলো মনে একরাশ সুখানুভূতি নিয়ে। তার ঠোঁটে ঈষৎ হাসির আভা, আর হৃদয়ের গহীনে একটা কিছু করার কঠিন সংকল্প।

পলাতক সাইফুদ্দীন এর পয়গাম নিয়ে মালিক আস্-সালেহ এর কাছে যে কমান্ডার গিয়েছিল সে একদিন পর ফিরে এল। কমান্ডার মালিকের সাক্ষাৎ পায়নি। তবে সাইফুদ্দীনের পয়গাম তার কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। সাইফুদ্দীন পয়গামে বলেছিল, তাকে যেন লিখিত জবাব দেয়া হয়।

কমান্ডার মালিককে বলে এল সাইফুদ্দীন কোথায় লুকিয়ে রয়েছে এবং সেই বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার পথের দিক নির্দেশনাও সে বলে এলো।

কিন্তু তিন চার দিন পর্যন্ত মালিক আস্-সালেহ্ এর পক্ষ থেকে সাইফুদ্দীনের কাছে কোন প্রতিউত্তর এলো না। চতুর্থ দিনে সাইফুদ্দীন খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

"আমারই এখন আলেপ্পো পৌঁছানো উচিত।" ডিপুটিকে বলল সাইফুদ্দীন। আলেপ্পোয় সৈন্যরা যদি সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর সাথে মৈত্রী করে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চক্রান্ত করে তবে আমাদের অনেক কিছু ভাবতে হবে। হিরনের গভর্নর গোমশতগীনের উপর নির্ভর করা যায় না। সে যে ধরনের ধূর্ত লোক, কোন সময় কোন দিকে মোড় নেয় বলা মুশকিল। প্রয়োজনে খ্রিস্টানদের সাথে নিয়ে আমাদের টিকে থাকার কথা ভাবতে হবে। কারণ শুধু আমাদের একার পক্ষে লড়াই করা সম্ভব নয়।"

"এও তো হতে পারে যে, মালিক আস্-সালেহ্ এর সন্ধি প্রস্তাবই আসল কৌশল মাত্র। তিনি যে কোন সময় মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গওতো করতে পারেন।" বলল ডিপুটি।

"এটা খুব সম্ভব।" বলল কমান্ডার। "আমাকে মালিকের কয়েকজন কর্মকর্তা বলেছে, মালিক সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এটা না হলেও সেনা কর্মকর্তারা বেশী দিন মৈত্রী টিকে থাকতে দিবে না। তাদের খ্রিস্টান উপদেষ্টারাতো এক্ষুণি আক্রমণের পরামর্শ দিচ্ছে।"

"আপনার আবার আলেপ্পো যাওয়া উচিত।" কমান্ডারের উদ্দেশে বলল ডিপুটি। আমি মৌসুল যাচ্ছি।

"তুমি আবারও আলেপ্পো যাও। গিয়ে মালিক আস্-সালেহ্কে বলো আমি আসছি।" কমান্ডারকে বলল সাইফুদ্দীন। "তুমি আজ রওয়ানা হলে আগামীকাল রাতেই আমি রওয়ানা হবো। সে হয়তো আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজী হবে না। বলবে শহরের বাইরে আল-মোবারক নদীর তীরে আমি থাকবো। সেখানে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে। যদি সে সাক্ষাতে রাজী না হয় তবে তুমি এসে আমাকে খবর বলো।"

"আপনার একাকী যাওয়া কি ঠিক হবে?" বলল ডিপুটি।

"এ অঞ্চলে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। তা ছাড়া আমি যাবো রাতের বেলায়। তখন কে জানবে মুসৌলের গভর্নর যাচ্ছে?"

"সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর গোয়েন্দা আর গুপ্তচর আমাদের এলাকায় চষে বেড়ায়। কখন কি থেকে কি ঘটে যায় বলা যায় না।" বলল ডিপুটি।

"বিপদের আশঙ্কা থাকলেও আমাকে যেতে হবে। ঝুঁকি তো কিছুটা নিতেই হবে। তুমি আজ মৌসুল চলে যাও। আমি আগামী রাতেই রওয়ানা হবো।"

ওরা যখন এসব কথাবার্তা বলছিল, তখন দাউদ ও হারেছ দরজায় কান লাগিয়ে শুনছিল ওদের কথাবার্তা। এতটুকু শুনেই উভয়ে ঘরে ফিরে এল। দাউদ গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। ভাবল যে করেই হোক সাইফুদ্দীনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব এই ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিল না দাউদ। অবশেষে দাউদের মাথায় একটা পরিকল্পনা এল।

"আমরা সাইফুদ্দীনের দেহরক্ষী হিসেবে তার সঙ্গী হব।" হারেসকে বলল দাউদ। হঠাৎ আমরা তার মুখোমুখি হয়ে বলব, আমরা মৌসুলের সৈনিক।"

"সে যদি বলে বসে, আমার সাথে তোমাদের যেতে হবে না, তোমরা মৌসুল চলে যাও। তখন কি করবে?"

" তখন আমি আমার কথার যাদু চালিয়ে পরিস্থিতি বাগে আনার চেষ্টা করব।" বলল দাউদ।

"তোমার সেই কৌশলেও যদি কাজ না হয়?"

"যদি দেখি কোন মতেই সে আমাদের সাথে নিতে রাজী হচ্ছে না তবে তাকেও যেতে দেয়া হবে না। কারণ সাইফুদ্দীন যাবে মালিক আস্-সালেহ্-এর কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করাতে।" দাউদ হারেসকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল তখন সে কি করবে।

সে রাতে সাইফুদ্দীন কমান্ডার ও ডিপুটিকে শেষ পরামর্শ দিচ্ছিল। রাতের প্রথম প্রহরে কমান্ডার বাইরে চলে গেল। হারেসের পিতা তার ঘোড়া আস্তাবল থেকে এনে দিলেন। মধ্যরাতে ডিপুটিও বেরিয়ে গেল। একাকী সাইফুদ্দীন ঘরে ঘুমিয়ে পড়ল। রাতের প্রায় শেষ প্রহরে হঠাৎ করে বিকট আওয়াজে দরজা খোলার শব্দে জেগে উঠল সাইফুদ্দীন। আঁতকে উঠল সে। ফৌজী পরম আনন্দে তাকে জানাল তার ভাই ফিরেছে। ফৌজী খুশীতে সাইফুদ্দীনের হাত ধরে বলল, আমার ভাইয়া এসে পড়েছে। তার সাথে এক বন্ধুও এসেছে।"

"তুমি কি আমার কথা তাকে বলেছো?" জিজ্ঞেস করল সাইফুদ্দীন।

"হ্যাঁ। বলবো না? সে তো আপনার কথা শুনে ভীষণ খুশী হয়েছে। সে আপনার সাথে দেখা করার অনুমতি চাচ্ছে।"

"তাদের নিয়ে এসো।"

* * *

দাউদ ও হারেস সাইফুদ্দীনের কামরায় ঢুকল। ফৌজী তাদের অভিবাদন জানাল। সাইফুদ্দীনের ইঙ্গিতে তারা বসল। সাইফুদ্দীনের কাছে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য জামা কাপড়ে ধুলোবালি মেখে নিয়েছিল এবং তারা এভাবে শ্বাস নিচ্ছিল যে, তারা উভয়েই খুব ক্লান্ত। সাইফুদ্দীন তাদের জিজ্ঞেস করল, মৌসুল বাহিনীর কোন ডিভিশনে ছিল তারা এবং এতদিন কোথায় ছিল, এখন কোত্থেকে এসেছে।

হারেস যেহেতু সাইফুদ্দীনের সেনা বাহিনীরই লোক তাই সে সব ঠিক মতো জবাব দিল। দাউদের কিছুই জানা ছিল না। তাই সে বেশী ক্লান্ত ভাব ধরে নীরব রইল।

দাউদ বলল, "বলতে লজ্জা লাগে, আমাদের বাহিনী কি লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করেছে। আমাদেরও পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কিন্তু ওকে নিয়ে আমি একটি টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলাম। আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর বাহিনী আমাদের পশ্চাদ্বাবন করে, না-কি ওখানে শিবির স্থাপন করে। আমার খুব কৌতূহল হলো' এ ব্যাপারটা জানার জন্যে। আপনার মনে হয় স্মরণ আছে, একবার খ্রিস্টান উপদেষ্টাদের পরামর্শে আপনি একদল সৈন্যকে বিশেষ ট্রেনিং-এর নির্দেশ দিয়েছিলেন, যারা গুপ্তচর ও ঝটিকা আক্রমণের ট্রেনিং নিয়েছিল। আমিও সেই ট্রেনিং-এ একজন ছিলাম। খুব ভালো করেছিলাম ট্রেনিং-এ। সে ট্রেনিং এবার আমার কাজে লেগেছে। আমি চিন্তা করলাম, পালিয়ে গেলেও আমার বাহিনীর জন্যে শত্রুপক্ষের কিছুটা হলেও খবর নিয়ে যাব আমি। তখন হারেসকে পেয়ে গেলাম আমি। তাকে বললাম, আমার সঙ্গে থাকতে। সেও থাকতে রাজী হল। সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর সৈন্যরা আরো অগ্রসর হতে লাগল। আমার সাথে আর যদি মাত্র দশজন সৈন্য থাকতো, তাহলে গুপ্ত হামলা করে আমি ওদের বহু ক্ষতি সাধন করতে পারতাম।

আমরা দেখে এসেছি, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর সৈন্যরা তুর্কমান এলাকায় শিবির স্থাপন করেছে। আইয়ূবীর সৈন্যরা যেভাবে তাঁবু গেড়েছে তা থেকে বুঝা যায়, দীর্ঘ সময় তারা এ অঞ্চলে থাকবে। আফসোস! আমাদের সৈন্যরা পালিয়ে এসেছে। না হয়তো ওর কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন! শত্রু বাহিনীর যে পরিমাণ মৃতদেহ আমরা দেখেছি এর সংখ্যা কয়েকশ নয় কয়েক হাজার হবে। আহত ও জখমীও অসংখ্য। রাতের অন্ধকারে আমরা ওদের তাঁবুর একেবারে কাছে গিয়ে দেখেছি, আহতের সংখ্যা যে কতো তা নিরূপণ করা কঠিন। গোটা তাঁবুতেই আহতদের চিৎকার। উহ্! আহ্! এদের আর্তচিৎকারে ওখানে দাঁড়ানোই কষ্টকর। আমার তো মনে হয় ওদের অর্ধেক সৈন্যই আহত হয়ে গেছে।

আমীরে মুহ্তারাম! আল্লাহ্ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আপনিই ভালো জানেন এখন কি করতে হবে। আমরা আপনার হুকুমের গোলাম মাত্র। যা হুকুম করবেন তাই শিরোধার্য করে নেবো। তবে অধমের খেয়াল এই যে, সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর সৈন্যদের যুদ্ধের সাহস নেই। আপনি যদি সৈন্যদের একত্রিত করে এখনই হামলা করেন, তবে আইয়ূবীকে আপনি দামেস্ক পৌঁছে দিতে পারেন।

সাইফুদ্দীন দাউদের বক্তব্য তন্ময় হয়ে শুনছিল। কারণ সে ছিল পরাজিত। বিজয়ের আশ্বাসবাণী শোনার জন্যে উদগ্রীব ছিল সাইফুদ্দীন। সে শুনতে চাচ্ছিল তার পরাজয় হয়নি। তার সৈন্যরাও পালিয়ে আসেনি। জোটের শরীকরা ভড়কে গিয়ে তাকে পালিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। দাউদ তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। দাউদ পাকা গোয়েন্দা। সে বুঝতে পেরেছিল সাইফুদ্দীন কোন্ ধরনের কথায় মুগ্ধ হবে।

"আমরা মৌসুল যাচ্ছিলাম। হারেস বলল, পাশের গ্রামেই আমার বাড়ি। সে বাড়ির লোকদের সাথে দেখা করে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করল। তাই ওর সাথে এখানে এলাম। এখানে এলে হারেসের আব্বা বললেন, আপনি এখানে আছেন। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না। আপনাকে দেখেও প্রথমে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল কোন ভুল দেখছি না তো? আল্লাহ্ আমাদের উপর বড় দয়া করেছেন। এ কথাগুলো আপনার কাছে পৌঁছানো জরুরী ছিল। আল্লাহ্ মেহেরবানী করে সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

"তোমাদের কথা শুনে আমি খুবই প্রীত হলাম।" রাজকীয় রীতিতে বলল সাইফুদ্দীন। "তোমাদের এই বীরত্বের জন্যে পুরস্কার দেয়া হবে।"

"আমাদের জন্য এর চেয়ে বেশী আর কি পুরস্কার হতে পারে, আমরা আপনার পাশাপাশি বসে আপনার সাথে কথা বলতে পারছি। বলল হারেস। আমরা আপনার সেবায় জীবন দিয়ে আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত করতে প্রস্তুত।"

"শুনলাম আপনার সাথে আরো কারা নাকি আছে?" জিজ্ঞেস করল দাউদ।

"ওরা দু'জন চলে গেছে। আমিও একটু পরেই এখান থেকে রওয়ানা হবো।" বলল সাইফুদ্দীন।

"আপনাকে জিজ্ঞেস করা ধৃষ্টতা হবে যে, আপনি এখানে কেনই বা যাত্রা বিরতি করলেন, আর এখন কোথায় যাবেন? আমি খুব লজ্জিত যে, আপনাকে আমার লোকেরা এই পুঁতিগন্ধময় ঘরে এ বিছানায় রেখেছে।" বলল হারেস।

"আমি নিজেই এ ঘরটি বেছে নিয়েছি। এখানে কয়েকদিন থাকার দরকার ছিল আমার। তোমরা আমার এখানে অবস্থানের কথা কাউকে বলো না।"

"এখন আপনি কোথায় যাবেন?" জিজ্ঞেস করল দাউদ।

"আগে আমি আলেপ্পো যাবো। এরপর ওখান থেকে মৌসুল চলে যাবো।" বলল সাইফুদ্দীন।

"কিন্তু আপনি যে একাকী। আপনার সাথে কোন দেহরক্ষী নেই তো?" বলল দাউদ।

"এ অঞ্চলে কোন ভয় নেই। একাকীই চলে যেতে পারব।" বলল সাইফুদ্দীন।

"অপরাধ ক্ষমা করবেন।" বলল দাউদ। এ অঞ্চলকে দুশমন শূন্য মনে করবেন না। আমি যতটুকু জানি, আপনি হয়তো অতোটা জানেন না। আইয়ূবীর গুপ্তবাহিনী এ অঞ্চলেও রয়েছে। হঠাৎ কেউ যদি আপনাকে চিনে ফেলে তবে সারাজীবন আমরা দু'জন আফসোস করে মরব, কেন আপনার নিরাপত্তার জন্যে সঙ্গী হলাম না আমরা। ঘটনাক্রমে আমরা যেহেতু এসে গেছি, আর আমাদের সাথে ঘোড়াও আছে, হাতিয়ারও রয়েছে, আমরা আপনার সাথে যাবো। আপনার মতো কোন শাসক নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া একাকী যাওয়া ভালা দেখায় না।"

দেহরক্ষীর প্রয়োজন অনুভব করছিল সাইফুদ্দীন। কেননা এমনিতেই যে ভীতু ছিল, দাউদ তাকে আরো ভয় পাইয়ে দিল। সে তাদের বলল, তোমরা কাপড়-চোপড় ধুয়ে নাও এবং আগামী রাতে রওয়ানা হওয়ার জন্যে তৈরী হও। ওরা বিদায় নিয়ে ঘরে চলে গেলে সাইফুদ্দীন ফৌজীর আগমন প্রত্যাশায় অধীর হয়ে রইল। কিন্তু সে রাতে ফৌজী আর সাইফুদ্দীনের ঘরে পা বাড়াল না। দিনের বেলায় দাউদ ও হারেস সাইফুদ্দীনের জন্য খাবার নিয়ে গেল। এভাবেই ফৌজীর দেখা না পেয়েই কেটে গেল দিন।

* * *

জাতিদ্রোহী তিন শাসক সাইফুদ্দীন, গোমশতগীন ও মালিক যখন আইয়ূবীর বিরুদ্ধে পুনর্বার যৌথ আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল, ঠিক সে সময় ওদের থেকে কিছু দূরে খ্রিস্টান সেনা অফিসার, কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের কনফারেন্স চলছে। সেখানে পর্যালোচনা হচ্ছে, তিন বাহিনীর পরাজয়ের কারণ। মূলত এরা সবাই ছিল পরাজিত। পরাজয় পর্যালোচনা এবং এর কারণ অনুসন্ধানই ছিল কনফারেন্সের মূল লক্ষ্য।

"তিন বাহিনীর পরাজয় প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরাজয়।" বলল রিমান্ড। আমি যতদূর জানি, তিন বাহিনীর মোকাবেলায় আইয়ূবীর সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল না।"

"আপনার সাথে আমি একমত হতে পারছি না।" বলল ফরাসী শাসক রেনাল্ট। আমাদের উদ্দেশ্য ওদের জয় পরাজয় নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমরা পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত থাকুক আর একটি পক্ষ আমাদের ক্রীড়নক হয়ে

কাজ করুক। আমাদের প্রধান শত্রু আইয়ূবী। আমরা চাই, ওর মুসলিম ভাইয়েরা ওর বিপক্ষে লড়াই করে ওর শক্তি বিনষ্ট করুক। আইয়ূবীর প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। এমনও হতে পারে যে, আইয়ূবীকে পরাজিত করতে পারলে ওর প্রতিপক্ষ মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে পড়বে।

আমি আপনাকে মুসলিম বাহিনী ও এ অঞ্চলের বিস্তারিত রিপোর্ট দিচ্ছি। আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দারা এ রিপোর্ট পাঠিয়েছে। বলল এক ইহুদী কর্মকর্তা। তারা লিখেছে—সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর প্রতিপক্ষ তিন বাহিনীর সৈন্যদের অবস্থা এমন যে, সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ করার সাহস মোটেও নেই। ওরা সাহস হারিয়ে ফেলেছে। রণাঙ্গনে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্রও ফেলে পালিয়েছে। এক্ষুণি এরা পুনর্বার যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত নয়। আমাদের যেসব উপদেষ্টা তিনবাহিনীতে কাজ করছে বহু কষ্ট করে তাদেরকে আইয়ূবী বিরোধী যুদ্ধে সম্মত করিয়েছিল। বর্তমানে আইয়ূবী তুর্কমান অঞ্চলের সবচেয়ে উর্বর ময়দানে তাঁবু গেড়েছে। এক্ষুণি অগ্রাভিযানের অভিপ্রায় তার নেই বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের উপদেষ্টাগণ চেষ্টা করছে মৌসুল, হিরন ও আলেপ্পোর বাহিনীর অবস্থা যাই থাকুক যাতে তড়িৎ আক্রমণে ওদের সম্মত করানো যায়। আমার বিশ্বাস, এক্ষুণি হামলা করতে সক্ষম হলে আইয়ূবীর অজ্ঞাতে আকস্মিক হামলা করে তাকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে। আইয়ূবীকে পরাজিত করার এটা একটা মোক্ষম সুযোগ।"

"এ কৌশলে কোনই কাজ হবে না।" বলল অগাস্টার। "কারণ আইয়ূবী কখনও অপ্রস্তুত নির্বিকার হয়ে বসে থাকে না। তার গোয়েন্দারা সব সময়ই জাগ্রত, তৎপর। প্রতিপক্ষের যে কোন আক্রমণের সংবাদ দু'দিন আগেই তার কাছে পৌঁছে যায়। আমাদের যে সব উপদেষ্টা মুসলমানদের মধ্যে কাজ করছে, তাদের নির্দেশ দিয়ে দিন, তারা যেন গোয়েন্দা তৎপরতা আরো জোরদার করে। গোয়েন্দা কাজে আরো লোকবল বাড়াতে বলুন। তাদেরকে বলে দিন, তাদের গোটা এলাকায় গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিতে। সন্দেহজনক কোন লোককে পেলেই পাকড়াও করতে। যখন তারা যুদ্ধের জন্য বের হয় তখন বহু দূর পর্যন্ত যাতে গোয়েন্দারা সক্রিয় থাকে, যে কোন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখতে পেলেই যেন আটক করে। ভ্রমণকারী, তীর্থযাত্রী, বণিক পথে যাদেরই পাবে সবাইকে তল্লাশী করবে। যাতে তিনবাহিনীর সৈন্যরা আইয়ূবীর শিবিরে আক্রমণের আগে তার কাছে কোন সংবাদ পৌঁছাতে না পারে।"

"আমরা আরো সংবাদ পেয়েছি, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী অধিকৃত অঞ্চল থেকে তার বাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করছে।" বলল আরেক অফিসার।

অন্য এক অফিসার বলল, আইয়ূবীর এসব কার্যক্রম রুখা দরকার।

"সেনা ভর্তি রোধ করতে হলে আমাদের পরিকল্পনা মতো দ্রুত আক্রমণ করা দরকার। এ ছাড়া ভিন্ন একটা কৌশলও হতে পারে। মিশরে আমরা সেটি প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছিলাম। যেসব এলাকায় আইয়ূবী সেনা ভর্তি করছে, ওসব অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নৈতিক ও চারিত্রিক দুষ্কর্ম ছড়িয়ে দিতে হবে আইয়ূবীর সেনাবাহিনীর বেশ ধরে। তাতে আইয়ূবীর বাহিনীর প্রতি মানুষ ক্ষেপে উঠবে।

অবশ্য মিশরে আমাদের কার্যক্রম পুরোপুরি সফল হয়নি, আইয়ূবী সেখানে তার অবস্থান সংহত করেছে, আর আমরা বহু অভিজ্ঞ গোয়েন্দাকর্মী ও প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা মেয়েকে হারিয়েছি। বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ে আইয়ূবীর গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে এবং নিহত হয়েছে। তদুপরি আমাদের একথা স্মরণ রাখতে হবে যে; আজ হোক, কাল হোক আমাদের প্রত্যেকের একদিন না একদিন মরতে হবে। তাই সেই মৃত্যু যীশু খ্রিস্টের জন্যে হোক সেটাই আমাদের জন্যে উত্তম। খ্রিস্টের মান রক্ষা ও ধর্মের খাতিরে নিজেদের জীবন যেমন কুরবানী করতে হবে অনুরূপ প্রয়োজনে আমাদের সন্তানদেরও উৎসর্গ করতে হবে।

সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর বড় শক্তি সাধারণ নেতা। সে তার বাহিনী ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। মুসলিম জাতীয়তা ও ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সৈন্যরা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করে। তাই তার সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে জীবন বাজী রেখে আমাদের সৈন্যদের উপর গেরিলা হামলা করে, তাদের এই ধর্মীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধে চির ধরাতে হবে।"

"সব সময়ই আমরা বিদ্রোহ ও নারী লিপ্সার টোপ ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি।" বলল অগাস্টাস। মুসলমানদের মধ্যে যারা বিত্তশালী তারা সব সময়ই ক্ষমতা লিপ্সু, এ সুযোগ আমরা সব সময়ই ব্যবহার করেছি। তেমন নতুন কিছু পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই আমাদের। তবে একটা ব্যাপার আমাদের বুঝতে হবে যে, আইয়ূবীর বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ধিক্কার ও ঘৃণা জন্মাতে পারলে আমাদের তৎপরতা বেশী কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কাজটা হলো, আইয়ূবীর নামে জঘন্য অপবাদ রটাতে হবে। কাজটা আমাদের করলে হবে না, করাতে হবে মুসলমানদের দ্বারা। প্রতিপক্ষও শত্রুদের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচারে নিজেদের মর্যাদা আত্মসম্মান নিয়ে ভাবলে হবে না, নিয়ম হলো, তোমার শত্রু তোমার তুলনায় যে মানের উঁচু ও শক্তিশালী তার বিরুদ্ধে তত শক্তিশালী ও জোড়ালো অপবাদ প্রচার করতে হবে। যাতে তোমাদের সৃষ্ট অভিযোগ মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকে। বিশ্বাসযোগ্য ভাষায়, অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় মানুষের কাছে প্রকাশ করতে হবে। মনে রাখবে, যখন একটা বিষয় হাজারো মুখে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও কানাঘুষা হবে তখন শয়ের মধ্যে পাঁচজন হলেও বিশ্বাস করতে শুরু করবে।"

"এ মুহূর্তে সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা খুব জরুরী।" বলল এক কর্মকর্তা। আমরা ধারণার চেয়ে অনেক বেশী অবকাশ পেয়েছি। অগাস্টাসের ভূমিকা খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে ক্ষমতার সংঘাত মহামান্য অগাস্টাসের কৌশলের ফল। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে এতদিনে আইয়ূবী ফিলিস্তিন দখল করে নিতো। অথচ এখন ওর মুসলমান ভাইয়েরাই ওর যাত্রা পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করছে।"

"একটা ব্যাপার আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলছে, বললো রিমান্ড। এসব মুসলিম যোদ্ধা আইয়ূবীর বাহিনীতে মোকাবেলা করতে সাহস পায়। আর আইয়ূবীর বাহিনীর সেই সৈনিকেরাই যখন তার প্রতিপক্ষে যুদ্ধে নেমেছে, তখন এদের বীরত্ব গেল কোথায়? এতো বিপুল সংখ্যক সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এলো!"

"এটাতো বিশ্বাস ও আকীদার ব্যাপার। মুসলমানরা যাকে বলে ঈমান।" বলল রেনাল্ট। যে সেনাপতি বা সৈনিক ঈমান খুইয়ে বসে সে আর যুদ্ধ করার সাহস পায় না। তখন তার কাছে জীবন আর সম্পদই হয়ে উঠে মুখ্য। এজন্যই তো আমরা গোয়েন্দা কার্যক্রমের মধ্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। যে কোনভাবে মুসলিম সৈনিক ও কর্মকর্তাদেরকে মদ-নারী, ভোগ-বিলাসিতায় আসক্ত করে ফেলো, তাহলে দেখবে অযথা তোমাদের ঘোড়া আর জীবনহানি ঘটবে না, বিনা যুদ্ধে বিজয় তোমাদের পা চুমু দেবে।"

সেই কনফারেন্সেই সিদ্ধান্ত হলো, যে করেই হোক তিন বাহিনীকে আলেপ্পোয় একত্রিত করে এক কমান্ডের অধীনে পুনর্বার যুদ্ধে পাঠাতে হবে এবং সেই সাথে তিনবাহিনীর মধ্যে প্রয়োজনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির সুযোগও রাখতে হবে।

* * *

রাতের দ্বিপ্রহর। আস্তাবল থেকে বের করা হলো তিনটি ঘোড়া। একটিতে সওয়ার হলো সাইফুদ্দীন, একটিতে হারেস ও অপরটিতে দাউদ। দাউদ ও হারেসের হাতে বর্শা। সৈনিকসুলভ সতর্কতা তাদের মধ্যে। ফৌজী, তার ভাবী ও বৃদ্ধ পিতা তাদের বিদায় জানাতে গেটের বাইরে দাঁড়ানো। হারেসের হাতে মশাল। সাইফুদ্দীনের দৃষ্টি নিবদ্ধ ফৌজীর দিকে। আর ফৌজী দাউদের ঘোড়ার পাদানী বেঁধে দেয়ার কাজে মগ্ন। বিদায়লগ্নে ফৌজী দাউদের প্রতি নিজের মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ভাই ও সাইফুদ্দীনের উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করল না। একটু পরে "আল্লাহ্ হাফেয, আল্লাহ্ হাফেয" ধ্বনি উচ্চারিত হলো সবার মুখে। অশ্বারোহী তিনজন নিমিষের মধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

দীর্ঘক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল ফৌজী ও তার ভাবী। যতক্ষণ অশ্বক্ষুরের আওয়াজ কানে ভেসে আসছিল ততক্ষণ তারা কান পেতে রইল সেদিকে।

অশ্বের আওয়াজ যত ক্ষীণ হতে থাকল ফৌজীর হৃদয় মন ততই বিষণ্ন হয়ে উঠল। তার কানে কেবল ধ্বনিত হলো দাউদের কণ্ঠস্বর। "সত্যপথের সৈনিকদের শাদী আসমানে হয়ে থাকে। তাদের বাসর হয় আকাশের গ্রহে গ্রহে। তারকারা তাদের বিয়েতে আলোজসজ্জা করে ....।"

আনমনে ননদ-ভাবী ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল কিন্তু ফৌজীর কানে আরো উচ্চকিত হতে থাকল দাউদের সেই কণ্ঠ... ....। হঠাৎ ফৌজীর মনে উঁকি দিল একটা প্রশ্ন। আমি কি দাউদকে বিয়ে করতে চাই? মনে হতেই লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল, অন্ধকারের মধ্যেও উড়নায় মুখ ঢেকে ফেলল ফৌজী। পরক্ষণেই তার স্মরণ হলো দাউদের আরেকটি কথা—"আমাদের সামনে এখন বিশাল রক্ত ফোরাত, সেখানে নেই কোন পুল, কোন সাঁকো। একথা স্মরণ হতেই দেহের রক্ত টগবগিয়ে উঠল ফৌজীর। বিয়ে ও বাসরসজ্জার স্বপ্ন কর্পূরের মতো উবে গেল, ফৌজীর সারা শরীর কঠিন হয়ে উঠল।

সারারাত সাইফুদ্দীন, হারেস ও দাউদ ঘোড়া হাঁকাল। বেলা উঠার পর দাউদ ও হারেস থেকে কিছুটা আগে আগে চলল সাইফুদ্দীন। দাউদ ও হারেস ইচ্ছে করেই দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল আর পরস্পর কথা বলতে লাগল। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ ও দূরত্বের কারণে সাইফুদ্দীন তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিল না।

"আমি বুঝতে পারছি না, তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন?" ক্ষুব্ধ স্বরে বলল হারেস। "এখানে ওকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেললে কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না।"

"ওকে জীবিত রেখে ওর গোটা বাহিনীকেই আমি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই।" বলল দাউদ। "শুধু একে হত্যা করলে কি হবে তার বাহিনীর কমান্ড আর কেউ নিশ্চয়ই হাতে নেবে। তাই আমার ইচ্ছা এর উদ্দেশ্য অবগত হয়ে ওদের সম্পূর্ণ শিকড় সমূলে উৎখাত করা। শুধু খোঁচা দিয়ে সতর্ক করা নয়। তুমি দয়া করে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখ। দেখ না আমি কি করি।"

দুপুরের আগেই ওদের গোচরিভূত হলো আলেপ্পো শহরের সুউচ্চ মিনার। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল আল-মোবারক হ্রদের তীরবর্তী সুশোভিত উদ্যান। হ্রদের কাছে পৌছলে সাইফুদ্দীনের প্রেরিত কমান্ডার দৌড়ে এসে জানাল, মালিক আস্-সালেহ সাইফুদ্দীনের সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আল মোবারক উদ্যানে পৌছালে মালিকের দু'জন অফিসার সাইফুদ্দীনকে অভিবাদন করল।

সাইফুদ্দীন বলল, সে এখন প্রাসাদে যাওয়ার চেয়ে এ হ্রদের পাশেই অবস্থান করতে আগ্রহী। অতএব, তাকে যদি এখানে তাঁবু খাটিয়ে দেয়া হয় সেটিই হবে তার পছন্দনীয়। সাইফুদ্দীনের আগ্রহে হ্রদের তীরবর্তী উদ্যানে প্রাসাদ সদৃশ তাঁবু খাটিয়ে দিতে অল্প সময়ের মধ্যে রাজ কর্মচারীরা লেগে গেল। রাজ প্রাসাদ থেকে সকল আরাম-আয়াশের সরঞ্জামাদির ও সেবার আয়োজনও করা হল। সাইফুদ্দীন দাউদ ও হারেসকে নিজের সাথেই রাখল। রাতে মালিকের পক্ষ থেকে প্রাসাদে নৈশভোজের দাওয়াত করা হল সাইফুদ্দীনকে এবং বলা হল সেই দাওয়াত ও মোলাকাত পর্বে উভয়ের মধ্যে কথা হবে।

* * *

সন্ধ্যায় মালিক আস-সালেহ্ ও সাইফুদ্দীনের বৈঠক হল। আল-মালিক সাইফুদ্দীনকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাল। সাইফুদ্দীন কিশোর মালিকের হাতে চুমু দিয়ে কেঁদে ফেলল। বৈঠকে আলোচনা ও নৈশভোজের পর সাইফুদ্দীন তার জন্যে তৈরী বিশেষ তাঁবুতে ফিরে গেল এবং ওখানেই অবস্থান করল।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, সাক্ষাতে সাইফুদ্দীন মালিককে আইয়ূবীর সাথে কৃত চুক্তি সম্পর্কে তার উদ্বেগ ও প্রেরিত পয়গামের প্রতিউত্তর না দেয়ার কথা উত্থাপন করলে মালিক বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, না! আমি পরদিনই দূত মারফত লিখিত জবাব দিয়েছি। কিন্তু আপনার কাছে না পৌঁছার ব্যাপারটি আমার মোটেও জানা নেই। আমি সেখানে লিখেও দিয়েছি, আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না, চুক্তির ব্যাপারটি সম্পূর্ণই একটি সময়ক্ষেপণের কৌশলমাত্র।

"আপনার কোন পয়গাম আমার কাছে পৌঁছেনি।" বলল সাইফুদ্দীন। "আমিতো এ নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম এই ভেবে যে, আপনি আইয়ূবীর সাথে সন্ধিচুক্তি করে আমাদের ধোঁকা দিয়েছেন এবং এটা আপনার জন্যে হবে মারাত্মক ভুল। বৈঠকে মালিকের দু'জন সেনা অফিসারও ছিল। পয়গাম না পৌঁছার খবরে তাৎক্ষণিক তারা খোঁজ খবর শুরু করল দূতের। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, যে দূতকে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছিল সেদিন রওয়ানা হওয়ার পর আর তাকে এখানে দেখা যায়নি। এরপর বহু তালাশ করেও দূতের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। জানা গেল পয়গামবাহী দূত কখনও সেনা শিবিরে থাকতো না। সে একাকী দূরে থাকতো। কোথায় থাকতো তা কেউ জানতো না। এটা কেউ ধারণা করতে পারেনি যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়গাম আইয়ূবীর কাছে পৌঁছে যেতে পারে।"

এ সংবাদ যখন মালিকের খ্রিস্টান উপদেষ্টাদের কানে গেল তখন তারা এই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিল, হয়তো প্রেরিত দূত নিজেই ছিল আইয়ূবীর

গোয়েন্দা, নয়তো দূত আইয়ূবীর গোয়েন্দাদের কাছে ধরা পড়ে নিহত হয়েছে। এই ঘটনার পরিণতি এই হতে পারে যে, আইয়ূবী প্রস্তুতি দ্রুত করছে, অথবা দ্রুত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তোমাদের প্রয়োজন তিনবাহিনী একত্রিত করে এখনই আইয়ূবীর উপর আক্রমণ করা।

খ্রিস্টানরা চাচ্ছিল মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি লড়াই অব্যাহত থাকুক। সে লক্ষ্যে পরদিন হিরনে ও মৌসুলে পয়গাম পাঠানো হল, সৈন্যরা যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থাতেই আলেপ্পো পৌঁছাতে। হিরনের গভর্নর গোমশতগীন এক্ষুণই আক্রমণে সম্মত ছিল না, নানাভাবে সে তাৎক্ষণিক আক্রমণে তার বাহিনীকে সম্পৃক্ত করতে চাচ্ছিল না, কিন্তু যৌথ বৈঠকে বসে তার পক্ষে আর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম করা সম্ভব হলো না। বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হলো যে, তিনবাহিনী একক হাই কমান্ডের অধীনে থাকবে। আর সুপ্রীম কমান্ডার থাকবে সাইফুদ্দীন। গোমশতগীন তার সৈন্যবাহিনী দিল বটে কিন্তু নিজে আলেপ্পোতেই অবস্থান করল। সাইফুদ্দীনের অধীনে যুদ্ধ করতে সে যে মোটেও ইচ্ছুক নয় তা পরিষ্কার হয়ে উঠল।

তিন দিনের মধ্যে আলেপ্পো, হিরন ও মৌসুলের সৈন্যরা একত্রিত হয়ে গেল। খ্রিস্টানরা পূর্ব থেকেই যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য রসদের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তদুপরি আরো বেশী রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র দেয়ার আশ্বাস দিয়ে সৈন্যদের অভিযানে পাঠিয়ে দিল।

ঝটিকা আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী হল। আরো বলা হল, তিন বাহিনীর অগ্রাভিযানের খবর যাতে আইয়ূবী না পেতে পারে সে জন্য শুধু রাতের বেলায় সৈন্যরা অগ্রসর হবে আর দিনের বেলায় যাত্রা বিরত রাখবে। তা ছাড়াও ডানে বামে অগ্রভাগে গোয়েন্দা দল ও গুপ্তবাহিনীকে নির্দেশ দিল, পথের আশেপাশে কোন মুসাফের পাওয়া গেলেও তাকে গ্রেফতার করে আলেপ্পোয় পাঠিয়ে দিতে, যাতে কোন অবস্থাতেই প্রতিপক্ষ তিন বাহিনীর অভিযান সম্পর্কে অবহিত হতে না পারে।

অভিযান শুরুর আগে সাইফুদ্দীন দাউদ ও হারেসকে ডেকে সাধুবাদ দিয়ে বলল, তোমরা কঠিন সময়ে আমাকে সঙ্গ দিয়েছো, এজন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ। অবশ্যই যুদ্ধের পরে তোমাদের পদায়ন করা হবে এবং পুরস্কৃত করা হবে। সাইফুদ্দীন হারেসকে বলল, "তোমার বোনের একটি ঋণ আছে আমার উপর। আমি তার সামনে সেদিনই যাব যেদিন তার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করতে পারব।" হারেসের বিস্ময়ে সাইফুদ্দীন বলল, "ফৌজী আমাকে বলেছিল, 'আইয়ূবীকে পরাজিত করে তার তরবারী নিয়ে যেতে পারলে সে আমার সাথে চলে আসবে।' হারেস! আমি বিজয়ী বেশে ফিরে এলে তোমার বোন মৌসুলের রাণী হবে।"

"ইন্শাআল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার আশা পূরণ করবেন। আচ্ছা তিন বাহিনী কি এক সঙ্গে যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ। আমিই তিন বাহিনীর চীফ কমান্ডার।"

"জিন্দাবাদ। এবার হয়তো আইয়ূবীর পালানোর পালা।" বলল দাউদ।

দাউদ ও হারেস চরম আনুগত্যের অভিনয় করে এবং ফৌজীর কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে নারীলোভী সাইফুদ্দীনের কাছ থেকে তিন বাহিনীর যুদ্ধ পরিকল্পনা জেনে নিল।

এরপর সাইফুদ্দীন বলল, তোমরা দু'জন এখন নিজ নিজ বাহিনীতে চলে যাও। আমার দেহরক্ষী এসে পড়েছে। তোমাদের কথা আমি স্মরণ রাখব। এদিকে তিনবাহিনী সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীকে তার অজ্ঞাতসারে পরাজিত করতে এগিয়ে চলল আলেপ্পোয়।

রাতের বেলায় শুরু হল তিন বাহিনীর যৌথ অভিযান। দাউদ ও হারেস মৌসুলের সেনাবাহিনীর সাথে মিশে গেল। হারেস মৌসুল সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈনিক হওয়ার কারণে অনেকেই তাকে চিনতো। কিন্তু দাউদ ছিল অপরিচিত মুখ। সন্দেহ নিরসনের জন্যে হারেস নিজেই দাউদ সম্পর্কে সৈনিকদের বলল, সে গভর্নরের প্রেরিত লোক। চলার পথে দাউদ সম্পর্কে কেউ আর তেমন ঘাটাঘাটি করল না। তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিন বাহিনীর সৈন্য অগ্রসর হতে লাগল। অর্ধরাত পেরিয়ে যাওয়ার পর বাহিনী পাহাড়ী উঁচু-নীচু গিরিখাদ অতিক্রম করতে গিয়ে অবিন্যস্ত হয়ে পড়ল। এই সুযোগে দাউদ হারেসকে বলল, পালানোর এই তো সুযোগ, সুযোগ বুঝে দল থেকে কেটে পড়তে হবে। রাতের আঁধার ও দুর্গম পথের বন্ধুরতার সুযোগে উভয়েই তাদের ঘোড়া দল থেকে পিছু হটিয়ে আড়াল হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। দাউদের ইচ্ছা ছিল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ঊর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। দিনের বেলায় যখন তিন বাহিনীর অগ্রাভিযান থেমে যাবে ইত্যবসরে তারা এদের খবর নিয়ে তুর্কমান পৌঁছে যেতে পারবে। একদিন আগেই সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী আক্রমণের সংবাদ পেয়ে মোকাবেলার আগাম প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হবেন।

দাউদ মনে করেছিল তার পরিকল্পনায় ক্রুটি নেই। কিন্তু শত্রুবাহিনীর উপদেষ্টাদের অতিরিক্ত সতর্কতা ও বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে দাউদের কোন ধারণা ছিল না। তদ্রূপ এই অঞ্চলের ভৌগোলিক দুর্গমতা সম্পর্কেও দাউদ অবগত ছিল না। শত্রু বাহিনী তাদের আশপাশের তিন মাইল পর্যন্ত গুপ্ত বাহিনী ও গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। দুর্গম পথের ঝোঁপ ঝাড়ে ঘাতকবাহিনী সন্দেহভাজনদের গতিবিধি ওঁৎ পেতে থেকে পর্যবেক্ষণ করছিল। এ বিষয়টি ঘুণাক্ষরেও দাউদের জানা ছিল না।

দাউদ ও হারেস উন্মুক্ত ময়দানের দিকে বেরিয়ে এল। তারা যখন ভাবল যৌথ বাহিনী থেকে নিরাপদ দূরত্বে এসে গেছে; তখন তাদের ঘোড়াকে তুর্কমানের পথে ঘুরিয়ে দিল এবং ঘোড়া তীব্র বেগে ছুটানোর পরিবর্তে ধীরে ধীরে চালাতে লাগল।

তারা খুব দ্রুতবেগে ঘোড়া না ছুটিয়ে ধীরে সুস্থে যেতে লাগল, যাতে বিরতিহীনভাবে এক নাগাড়ে যেতে পারে। রাত শেষে ভোরের আলো যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন দাউদ ঘোড়া থেকে নেমে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে যৌথ বাহিনীর গমন পথ দেখতে লাগল। কিন্তু দাউদের দৃষ্টিতে যৌথ বাহিনীর গমন পথের ধূলো ছাড়া আর কিছুই নজরে এলো না। টিলার উপরে দাঁড়িয়ে দাউদ ভাবল, তারা দুশমন থেকে নিরাপদ।

নিরাপদ ভাবাটাই ছিল দাউদের বড় ভুল। টিলার উপর দাঁড়ানো অবস্থায় দুশমনদের দৃষ্টি পড়ল তাদের উপর। কারণ এলাকাটি ছিল ঘন বালিয়াড়ী আর টিলায় ভরা। টিলা থেকে নেমে দাউদ ও হারেস তীব্র বেগে ঘোড়া হাঁকাল। কয়েকটি টিলা পেরিয়ে একটি সংকীর্ণ গিরিপথে বাঁক নিতে গেল দাউদ ও হারেস। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের পথ আগলে দাঁড়াল চারজন অশ্বারোহী। হাতে তাদের উন্মুক্ত তরবারী, উত্তোলিত বর্শা। অশ্বারোহীরা ঘিরে ফেলল দাউদ ও হারেসকে। ধমকের স্বরে বলল, "ঘোড়া থেকে নেমে তরবারী ফেলে দাও। পালানোর চেষ্টা করলে বাঁচতে পারবে না।"

"আমরা মুসাফের, আমাদের পথ আগলে দাঁড়ালে কেন?" বলল দাউদ।

"মুসাফের মৌসুল সেনাবাহিনীর উর্দি পরিহিত থাকে না" বলল এক অশ্বারোহী। মুসাফেরদের সাথে এমন অস্ত্রও থাকে না, যে অস্ত্র তোমাদের কাছে রয়েছে। তোমরা যেই হও না কেন, তোমাদের আলেপ্পো যেতে হবে, ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেল।"

এরা ছিল আলেপ্পো বাহিনীর গুপ্তচর। এরা সন্দেহভাজন লোকদের গ্রেফতার করে কর্তাদের নির্দেশ মতো আলেপ্পো নিয়ে যেতো। বিগত যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর গোয়েন্দা তৎপরতা নস্যাৎ করে দিতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে খ্রীস্টান উপদেষ্টারা।

দাউদ হারেসকে অনুচ্চকণ্ঠে বলল, ভাই! সময় এসে গেছে, শেষ চেষ্টা করতে হবে। হারেস নিজ ঘোড়ার লাগাম ধরে হেচকা টান দিলে ঘোড়া সামনে দু'পা উঁচু করে দাঁড়াল, আর হারেস সম্মুখের অশ্বারোহীকে বর্শা বিদ্ধ করল কিন্তু ইতিমধ্যে পাশের অশ্বারোহীর বর্শা এসে হারেসের কাঁধে পড়ল। দাউদ ছিল গুপ্ত ও ঝটিকা আক্রমণে পারদর্শী। সে হঠাৎ ঘোড়াকে ঘুরিয়ে এক অশ্বারোহীকে হত্যা করে ফেলল। কিন্তু শত্রু চারজন আর এরা মাত্র দু'জন। তাছাড়া জায়গাটি ছিল সংকীর্ণ।

অশ্বযুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ অনুপোযোগী। তদুপরি দাউদ এদের তিনজনের মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হল। দীর্ঘক্ষণ চলল বর্শা ও তরবারীর ঝনঝনানি আর ঘোড়ার লম্ফ ঝম্ফ। হারেসের আঘাত ছিল খুবই গভীর। বেশী রক্তক্ষরণে সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। তিনজনের মোকাবেলা করতে গিয়ে দাউদও আহত হলো মারাত্মকভাবে। তারপরও সে বোধ ও চিন্তাশক্তি স্থির রাখতে সক্ষম হল। এক পর্যায়ে সব শত্রুই দাউদের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো। দাউদের আঘাতে আঘাতে নিস্তেজ ও নীরব হয়ে গেল সব ঘাতক। দাউদ যখন দেখল যুদ্ধ খতম তখন হারেসের গ্রামের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। যদিও ঘোড়া হাঁকানোর মতো শক্তি তার গায়ে ছিল না, তবুও শেষ চেষ্টা হিসেবে হারেসের বাড়ি পর্যন্ত পৌছে শত্রু বাহিনী আক্রমণের আগে সংবাদটা আইয়ূবীর কাছে পৌছানোর কর্তব্য পালনে ব্রতী হল দাউদ।

হারেসের প্রতি তাকানোর অবকাশ রইল না তার। কেননা হারেসের শরীর নিথর হয়ে পড়েছিল, সে ধারণা করেছিল হারেস ইতিমধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেছে। দাউদের নিজের প্রাণও ওষ্ঠাগত। বেঁচে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। তবুও চাচ্ছিল কোন মতে হারেসের বাবার কাছে পৌছে বলবে, শহীদ সন্তানের মর্যাদা রক্ষায় তিনি যেন আইয়ূবীর কাছে সংবাদটা পৌছে দিতে সচেষ্ট হন। তুর্কমান ছিল অনেক দূর। তদপেক্ষা হারেসের গ্রাম কাছে; তাই হারেসের গ্রামের উদ্দেশেই ঘোড়া ছুটাল আহত দাউদ।

দাউদের শরীর শত্রুদের বর্শার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। ঘোড়ার জীন ও পিঠ রক্তে লাল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর। তবুও শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাবুক হানল দাউদ। ঘোড়া যতো তীব্র ছুটতে লাগল ঝাঁকুনি খেয়ে দাউদের শরীর থেকে ততই বেশী রক্ত বেরিয়ে যেতে লাগল। রক্তক্ষরণের কারণে তার মাথা চক্কর দিতে লাগল। বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। চোখে অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করল। ঘোড়ার পিঠে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে চেষ্টা করল দাউদ। কিন্তু প্রাণবায়ু যেন উড়ে যেতে উদ্যত। আর ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার শক্তি পাচ্ছে না সে। আসমানের দিকে তাকিয়ে বারবার কালেমা তাইয়্যেবা পড়ছিল আর বলছিল, "হে আসমান ও যমীনের মালিক! তোমার রাসূলের দোহাই! আমাকে আরেকটু সময় জীবন ভিক্ষা দাও, আমার কর্তব্য পালনের সুযোগ দাও!" ঘোড়া উর্ধশ্বাসে হারেসের বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগল। এক সময় মাথা ঘুরে পড়েই গিয়েছিল প্রায়, কোন মতে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অশ্বপিঠের উপর পড়ে রইল দাউদ।

পুনর্বার ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল শরীর। ঘোড়ার শরীর জড়িয়ে ধরে নিজেকে সামলাতে প্রাণপণ চেষ্টা করল দাউদ, কিন্তু পারল না। দ্রুত

ধাবমান অশ্বপিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল নীচে। অনুধাবন করল তার শরীর মাটি স্পর্শ করেছে। দুচোখে নেমে এল অন্ধকার।

কতোক্ষণ এমন অবচেতন অবস্থায় ছিল বলতে পারবে না সে। কিছুটা হুঁশ ফিরে এলে অনুভব করল মানুষের স্পর্শ। তাকে ধরে রেখেছে কোন মানুষ। শত্রু কবলিত ভেবে মুক্তির আশায় উঠে দাঁড়াতে চাইল দাউদ। কিন্তু তাকে শুইয়ে দিয়ে কানে কানে কে যেন বলল, 'দাউদ! তুমি এখন ঘরে রয়েছ, ভয় পেয়ো না।' মুমূর্ষু অবস্থায়ও ফৌজীর কণ্ঠ নির্ণয় করতে পারল দাউদ। বেহুঁশ অবস্থায়ই হেঁচড়ে হেঁচড়ে দাউদ ফৌজীদের বাড়িতে পৌছে গিয়েছিল। ফৌজী ও তার ভাবী অবচেতন দাউদকে সেবা শুশ্রূষা ও ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিয়ে গায়ের রক্ত পরিষ্কার করে শুইয়ে রেখেছিল। দীর্ঘক্ষণ পরে হুঁশ ফেরার পর দাউদ বুঝল, ফৌজী তার কাছে, তখনই জিজ্ঞেস করল "তোমার বাবা কোথায়?"

উত্তরে বলল ফৌজী, 'তিনি এক জায়গায় গেছেন, আগামীকাল হয়তো ফিরবেন।' পানি পানি.... ....অতি কষ্টে বলল দাউদ।

ফৌজী একটি পানপাত্র ভরে পানি এনে ধরল দাউদের মুখে। ধীরে ধীরে সবটুকু পানি পান করল দাউদ। ফৌজীর হাতের পানি পান করে যেন প্রাণ ফিরে এলো দাউদের। সে বলতে লাগল 'ফৌজী! তুমি বলেছিলে পুরুষের কাজ মেয়েরাও করতে পারে। দাউদের কণ্ঠ আটকে যাচ্ছিল, কথা বেরুচ্ছিল না। অনেক কষ্টে সেবারত ফৌজী ও দাউদের ভাবীকে নিবৃত্ত করতে দাউদ বলল, 'আমার সেবা করা অর্থহীন। আমার গায়ের রক্ত সব নিঃশেষ হয়ে গেছে, আমাকে তোমরা বাঁচাতে পারবে না। আমার পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব হলে তোমাদেরকে ঘরের বাইরে পাঠানোর কল্পনাও করতে পারতাম না। কিন্তু এখন বিষয়টি তোমার আমার জীবন ও মর্যাদার নয়, বিষয়টি মিল্লাতের। রাসূল (স.)-এর পবিত্র আমানতের ব্যাপার এখানে জড়িত। দাউদ তুর্কমানের পথটি ফৌজীকে যথাসম্ভব বুঝিয়ে বলল, 'আলেপ্পো, মৌসুল ও হিরনের যৌথ বাহিনী রাতের অন্ধকারে আইয়ূবীর সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আইয়ূবীর কাছে এর কোন সংবাদ নেই। তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং আশংকামুক্ত মনোভাবে রয়েছেন। তোমাকে তার কাছে গিয়ে এ সংবাদ পৌছাতে হবে, তোমার ভাই এপথে শহীদ হয়ে গেছে।'

দাউদের কথা শুনে ফৌজী তখনই তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু তার ভাবী দাউদকে এ অবস্থায় রেখে যেতে ইতস্তত করছিল, এমতাস্থায় খুব ক্ষীণকণ্ঠে ফৌজীকে কাছে ডাকল দাউদ। ফৌজী কাছে এলে তার হাত ধরে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'ফৌজী! সত্যের পথের সৈনিকদের বিয়ে আসমানে হয়ে থাকে, আসমানের পথে হয় তাদের

বরযাত্রা, তাদের বিয়েতে তারকারাজী আলোকসজ্জা করে...। আমাদের বিয়েতে ফেরেশতারা বরযাত্রী হবে......।' এই বলে দাউদের মাথা একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল, নিথর হয়ে গেল তার দেহ। দাউদের অর্পিত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে, এই অবস্থায়ই আল্লাহ্র উপর বাড়িঘর ছেড়ে দাউদের ঘোড়া ও আস্তাবল থেকে অপর একটি ঘোড়া এনে ননদ-ভাবী রওয়ানা হল। গমন পথ জানা ছিল না ফৌজীর। দাউদের কথার ভিত্তিতে রাতের আঁধারে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বাড়ি থেকে দু'টি অবলা মেয়ে দু'টি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দাউদ ফৌজীকে পথের নির্দেশনা দিয়েছিল একটি তারা দেখিয়ে। সেই নির্দিষ্ট তারা লক্ষ্য করে পথ চলল ফৌজী ও তার ভাবী। যে মেয়ে কোনদিন বাড়ির বাইরে যায়নি, সেই কিশোরীই আজ রাতের আঁধারে নির্বিক, নিঃশঙ্ক।

ওদিকে যৌথবাহিনী সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে রাতের আঁধারে আবারো অগ্রসর হতে লাগল। তুর্কমান তেমন বেশী দূরে নয়। কিন্তু আইয়ূবী আসন্ন আগ্রাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। তিনি গোয়েন্দা ব্যবস্থা বহাল রেখেছিলেন ঠিকই কিন্তু শত্রু পক্ষ এবার তার গোয়েন্দা তৎপরতাকে অকার্যকর করে দিয়েছিল। এদিকে তিনি সেনা অফিসারদের কাছেও বলছিলেন, মনে হয় না সাইফুদ্দীনরা পুনর্বার তাড়াতাড়ি আক্রমণের সাহস পাবে। অথচ তিনি সাইফুদ্দীনের উদ্দেশে পাঠানো মালিক আস-সালেহ এর চিঠি ঠিকই পেয়েছিলেন। তবুও তার মনে হচ্ছিল এরা এতো তাড়াতাড়ি আক্রমণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না। এজন্য সালাহ্ উদ্দীন সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন প্রতিপক্ষের আক্রমণ আশংকা থেকে। যার ফলে যৌথবাহিনী তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ও অপ্রস্তুতিতে রাতের আঁধারে আক্রমণ করে তাকে বেহাল করে দিতে সক্ষম হতো।

* * *

ফৌজী ও তার ভাবী দাউদের অর্পিত কর্তব্য পালনে এতোটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল যে, তারা যে নারী, পথে তাদের পদে পদে বিপদ, শংকা, আর সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হতে পারে একথা ভুলেই গিয়েছিল। রাত পেরিয়ে সূর্যের আলো উঠা পর্যন্ত তারা দেখে দেখে অবিরাম পথ অতিক্রম করল ফৌজী। সকালের সূর্য যখন চারদিকে আলোকিত করে উদিত হল, তখন তারা পৌঁছে গেল সেই বালিয়াড়ী, টিলা ও ঝোপঝাড়ের এলাকায় যেখানে দাউদ ও হারেস আক্রান্ত হয়েছিল শত্রু বাহিনীর দ্বারা। ফৌজী দেখতে পেল একটি টিলার পাদদেশে একজন লোক যেন বসে রয়েছে। ফৌজী তার ভাবীকে বলল, মনে হয় কোন আহত জখমী ব্যক্তি। কিন্তু জানাতো নেই কে, কাজেই কাছে যাবো না। তাদের গমন পথ ছিল লোকটির পাশ ঘেঁষে, কিন্তু তারা ঘোড়া কিছুটা দূর দিয়ে নিতে সচেষ্ট হল।

এমতাবস্থায় আহত লোকটি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল সে দাঁড়াতে পারছে না, তার শরীর রক্তে রঞ্জিত। তারপরও লোকটিকে পরখ করে নেয়ার জন্য গতি বাড়িয়ে কিছুটা কাছ দিয়েই যেতে লাগল ফৌজী। লোকটার চেহারার দিকে তাকিয়ে ফৌজী চিৎকার দিয়ে উঠল, হায় আল্লাহ্! ভাইয়া! এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে এল ফৌজী।

আহত লোকটিই ছিল হারেস। দাউদ মৃত মনে করে চলে গেলেও আকস্মিক কঠিন আঘাতে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল হারেস। ফৌজী ও তার ভাবী কয়েকটি ছোট পাত্রে পানি ভরে সাথে এনেছিল। পাত্র থেকে পানি পান করিয়ে হারেসের মুখে পানি ঝাপটা দিল ফৌজী। হারেস কিছুটা সম্বিত ফিরে পেয়ে বলতে লাগল, 'আমিতো ঘরে এসে পড়লাম, দাউদ কোথায়?'

ফৌজী তাকে বলল, 'ভাইয়া, তুমি ঘরে নও, এখনো তুর্কমানের পথে, পাহাড়ে।'

ফৌজী সংক্ষেপে দাউদের মৃত্যু ও তার উপর অর্পিত দায়িত্বের কথা ভাইকে জানাল এবং বলল, আমরা এখন তুর্কমানের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছি।

হারেস ফৌজীর কথা শুনে বলল, 'তোমরা আমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দ্রুত তুর্কমানের দিকে ঘোড়া হাঁকাও। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

দু'জনে মিলে হারেসকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। ফৌজী একই ঘোড়ায় হারেসের পিছনে সওয়ার হয়ে ওকে এক হাতে ধরে অন্যহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরল।

হারেসের বেঁচে থাকাটা ছিল বিস্ময়কর। গভীর ক্ষত থেকে যে পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়েছে, এতে হারেসের বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু তবুও আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে সে বেঁচে ছিল। ফৌজীর বুকে পিঠ ঠেকিয়ে ঘোড়ার উপরে বসেছিল হারেস। ফৌজী ভাইকে একহাতে ধরে রেখে অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখল। ক্ষীণ আওয়াজে তাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল হারেস।

সুলতান আইয়ূবীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তার শত্রুবাহিনী সাইফুদ্দীনের কমান্ডে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, আর এদিকে নিরাপদ পথ ধরে ভয়ানক আক্রমণের সংবাদ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল ফৌজী ও তার ভাই-ভাবীর তিনজনের ছোট্ট কাফেলা।

এমন সময় আকাশ অন্ধকার করে ধূলি উড়তে শুরু করল। চারদিকে নেমে এলো অন্ধকার, আকাশে ঘনকালো মেঘের আবরণ। আকাশের অবস্থা দেখে ভড়কে গেল ফৌজীর ভাবী। ভীতকণ্ঠে ফৌজীকে আকাশের দিকে দেখিয়ে বলল, দেখেছ, এটা কি? আকাশের অবস্থা দেখে ফৌজীও কিছুটা ভীত হয়ে পড়ল। হারেস জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ফৌজী?

'মরুঝড়! আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে।' ওই অঞ্চলের মানুষ হিসেবে ফৌজী মরুঝড়ের সাথে পরিচিত। মরু ঝড়ের ভয়াবহতা সম্পর্কেও জ্ঞাত সে। এজন্য আকাশের অবস্থা ও ধূলিঝড়ের আশংকায় কিছুটা ভয় পেয়ে গেল ফৌজী। কেননা এলাকাটি ছিল বালুকাময় ও টিলাযুক্ত। এসব জায়গায় মরু ঝড়ে এক জায়গার বালিয়াড়ী অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। ধূলি আর বালু চাপা পড়ে মানুষ, গাছপালা, পশু-পাখি কোথায় যে হারিয়ে যায় কোন পাত্তাই থাকে না।

সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী জানতেন না, এই মরু ঝড়ের চেয়েও প্রচণ্ড ঝড় ধেয়ে আসছে তার অজ্ঞাতে কোন জানান না দিয়ে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সম্মিলিত বাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা ভেবেছিল, ঝড় থেমে গেলে তারা সবকিছু ঠিকঠাক করে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখতে পারবে, কিন্তু বিধি বাম! ঝড়ের তাণ্ডবে সাইফুদ্দীন বাহিনীর সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। দিনের বেলায় বিশ্রামের জন্য তৈরী তাঁবুগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল ঝড়। সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল, অনেকে আহতও হলো। যে যেভাবে পারে পাহাড়ের টিলার আড়ালে জীবন বাঁচাতে ঠাঁই নিল। আর মালবাহী উট ও বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলো দড়ি ছিঁড়ে দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পালাতে লাগল। এদিকে ফৌজী ঝড় উপেক্ষা করেই পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে গন্তব্যে চলছে, মৃত্যুপথযাত্রী ভাইয়ের প্রতি খেয়াল নেই তার।

* * *

সুলতান আইয়ূবীর সেনা শিবিরও ঝড়ের তাণ্ডবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কমান্ডারগণ ঝড়ের মধ্যেই সিপাহীদেরকে চিৎকার করে রদসপত্র বাঁচানোর জন্যে তাকিদ দিচ্ছে। ঝড়ে উড়ে আসা কাঁকর ও বালিতে সিপাহীদের গায়ে ধূলোর মোটা আস্তরণ পড়ে যাচ্ছে, উড়ে আসা কাঁকরগুলো যেন তীরের মতো বিদ্ধ হচ্ছে শরীরে। তবুও তারা নিজেদের রসদপত্র বাঁচাতে তৎপর। এই তীব্র প্রলয়ংকরী ঝড়ের মধ্যে একটি ঘোড়া ক'জন সিপাহীর উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। আরোহী ঘোড়াকে সামলাতে পারছে না। অবস্থা দেখে এক সিপাহী আরোহীকে চিৎকার দিয়ে বলল, আরে হতভাগা ঘোড়া থামাও! কোন্ আড়ালে যাও! ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে! ঘোড়া থামল। এক সিপাহী আরোহীকে দেখে সাথীদের বলল, আরে এ যে মহিলা! সাবধান! কিছু বলো না! অন্য সিপাহী বলল, একজন নয় মহিলাতো দু'জন দেখা যাচ্ছে।

সিপাহীরা ভাবল, ঝড়ের ধাক্কায় হয়তো পথ হারিয়ে এরা এদিকে এসেছে। তাই দু'জন দু'টি ঘোড়ার বাগ ধরে তাদেরকে একটু আড়ালে নেয়ার জন্য চেষ্টা করল—

সিপাহীদের তৎপরতা দেখে ঝড়ের বিকট আওয়াজকে ছাড়িয়ে গলা চড়িয়ে ফৌজী বলল, "আমাদেরকে সুলতান আইয়ূবীর কাছে নিয়ে যাও, আমরা খুব জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছি। জলদি আমাদেরকে সুলতানের কাছে নিয়ে চল; না হয় তোমরা সবাই মারা পড়বে!"

কয়েকজন সিপাহী বহু কষ্টে তাদেরকে সুলতানের তাঁবুর কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু হায়! সেখানে তাঁবুর নাম-গন্ধও নেই। সব ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সুলতানের এক দেহরক্ষী এদের দেখে সুলতানের কাছে নিয়ে গেল। তাঁবু উড়ে যাওয়ার পর সুলতান একটি স্থাপনার আড়ালে আশ্রয় নিলেন। দু'জন মহিলা আরোহী এদিকে আসতে দেখে সুলতান নিজেও এগিয়ে এলেন।

সবার আগে হারেসকে ঘোড়া থেকে নামানো হল। এরপর নেমে এল ফৌজী ও তার ভাবী। তখনও জীবিত হারেস। ফৌজী অতি সংক্ষেপে সুলতানকে বলল, দাউদের বার্তা এবং শত্রুবাহিনীর আগমনের সংবাদ। হারেস ক্ষীণ কণ্ঠে সুলতানকে জানাল, দাউদ ও তার মিশনের কথা। খুব কষ্টে কথা শেষ হতে না হতেই হিমশীতল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল হারেস।

কিছুক্ষণ পর মরু ঝড়ের তীব্রতা কমতে শুরু করল। ঝড় কিছুটা থেমে এলেই কমান্ডারদের ডাকালেন সুলতান। তিনি কমান্ডারদের বললেন, তাঁবু ঠিক করার দরকার নেই, খুব তাড়াতাড়ি সৈনিকদের যুদ্ধের জন্যে তৈরী কর। গুপ্ত বাহিনীকে এখনই ডেকে পাঠাও। আইয়ূবী কমান্ডার ও সেনাকর্তাদের জানালেন, তাদের বিরুদ্ধে কি আগ্রাসন আসছে। এখন তাদের কি কি করতে হবে, মোকাবেলার ধরণ ও কৌশল কি হবে।

এক সময় ঝড় থেমে গেল বটে, কিন্তু নিকষ আঁধারে ছেয়ে গেল যেন দুনিয়া। আকাশে একটি তারা পর্যন্ত দেখা যায় না, আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘের পর্দা।

সাইফুদ্দীনের নেতৃত্বে তিনবাহিনীর সৈন্যরা ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া রসদপত্র ও তাঁবু গোছানোর কাজে লিপ্ত। সবকিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে রাতের আক্রমণ স্থগিত ঘোষণা করল সাইফুদ্দীন। অধিকাংশ সৈন্য ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বেশীরভাগ রসদপত্র তখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অগোছালো।

কিন্তু সুলতান আইয়ূবীর শিবির কর্মমুখর। তাদের কারো চোখে ঘুম নেই। রাতের আঁধারেই আইয়ূবীর ঝটিকা বাহিনী সাইফুদ্দীনের শিবির থেকে তিন মাইল ঘুরপথ অতিক্রম করে তাদের পিছনে অবস্থান নিল, সাইফুদ্দীন ঘুর্ণাক্ষরেও জানে না যাদের সে চিরতরে নিঃশেষ করতে বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছে, তারাই অগ্র-পশ্চাতে ঘিরে ফেলেছে তাদের।

* * *

সূর্য উঠল। দেখা গেল, সাইফুদ্দীনের বাহিনীর রসদপত্র এলোমেলো হয়ে গেছে। তাঁবুগুলো ঝড়ে উড়িয়ে কোথায় নিয়ে গেছে খোঁজ নেই। ভীত-সন্ত্রস্ত উট ও ঘোড়াগুলো ঘুমন্ত সৈন্যদের পায়ে পিষে কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে শুরু করেছে। দ্রুততার সাথে সাইফুদ্দীন সৈন্যদের নির্দেশ দিল সবকিছু গুছাতে। কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আসবাবপত্র গোছাতেই তাদের দিনের অর্ধেক কেটে গেল।

সাইফুদ্দীন তিনবাহিনীর সেনা কমান্ডারদের নির্দেশ দিল যেহেতু আইয়ূবী বে-খবর তাই দিনের আলোতে মুখোমুখি আক্রমণ করেই ওদের পরাস্ত করা সম্ভব হবে।

দিনের শেষ প্রহরে সাইফুদ্দীনের নির্দেশে সুলতানের শিবিরে আঘাত হানল যৌথবাহিনী। তিনবাহিনীর সৈন্যদের অবস্থানের ডানে বামে অসংখ্য টিলা, বালিয়াড়ী ঝোপ-ঝাড়, ঘন বৃক্ষাদি। যেমনি সাইফুদ্দীনের নির্দেশে যৌথবাহিনী সুলতানের শিবিরে আক্রমণ করল অমনি দু'পাশের টিলার ঘন গাছ-গাছালীর আড়াল থেকে তাদের উপর তীর বর্ষণ শুরু করল সুলতানের গুপ্তবাহিনী। আর সম্মুখ থেকে সুলতানের সৈন্যরা ছুঁড়তে শুরু করল অগ্নিগোলা। মিনজানিক থেকে নিক্ষেপ করলো ছোট ছোট অগ্নিযুক্ত মটকা। যা উপর থেকে মাটিতে পড়ে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে সাইফুদ্দীন বাহিনীকে পশ্চাদপসারণে নির্দেশ দিল। সাইফুদ্দীনের নির্দেশে যৌথবাহিনী যখন পিছু হটতে শুরু করল অমনি পিছন দিকে সুলতানের ঝটিকা বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে হামলে পড়ল। সাইফুদ্দীনের যৌথবাহিনী চতুর্মুখী আক্রমণের মুখে প্রমাদ গুণতে শুরু করল। যে যেভাবে পারে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। সেনা কমান্ড ভেঙ্গে পড়ল, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিল তিনবাহিনীর মধ্যে। সাইফুদ্দীনের নিরাপত্তা বাহিনীও আক্রান্ত হল। ইত্যবসরে চারদিক আঁধার করে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, রাতের আঁধারেও অব্যাহত থাকল সুলতানের সিংহ শার্দুলদের আক্রমণ।

প্রত্যুষে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে সুলতান আইয়ূবী যুদ্ধের পরিস্থিতি সচক্ষে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি পদাতিক বাহিনীর কমান্ডারের কাছে দূত পাঠালেন। নির্দেশ পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে চতুর্দিক ঘিরে ফেলল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা। সাইফুদ্দীনের সৈন্যরা তখন সুলতান বাহিনীর দ্বারা বেষ্টিত। গগনবিদারী তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হল, একসাথে সুলতানের সৈন্যরা শত্রুদের উপর হামলে পড়ল।

সাইফুদ্দীনের রণক্লান্ত সৈন্যরা সুলতানের সৈন্যদের প্রতিআক্রমণের দখল সামলাতে মোটেও সক্ষম হলো না। সাইফুদ্দীন নিজেও হয়ে পড়ল শঙ্কিত।

তার আহত সৈন্যরা নিজ বাহিনীর অশ্বখুরেই পিষ্ট হয়ে নিহত হচ্ছিল। আহত ঘোড়া, উট ও খচ্চরগুলো উল্টো তার বাহিনীকেই পিষ্ট করতে শুরু করল। সাইফুদ্দীন দেখল তার সৈন্যদের প্রত্যাঘাততো দূরে থাক আত্মরক্ষার শক্তিও নেই। সৈন্যদের অনেকেই অস্ত্র ছেড়ে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে। সুলতানের ঝটিকা বাহিনী পিছন থেকে শত্রু নিধন করে তকবির ধ্বনি তুলে সম্মুখ বাহিনীর সাথে মিলিত হচ্ছে। বস্তুত সাইফুদ্দীনের সৈন্যরা তখন একটি অনতিক্রম্য বেষ্টনিতে আটকে কচু কাটা হচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রতিপক্ষের করুণার উপর সহযোদ্ধাদের ছেড়ে সাইফুদ্দীন জীবন নিয়ে পালাল।

সুলতানের সৈন্যরা যখন সাইফুদ্দীনের কেন্দ্রীয় কমান্ড আঘাত করে পদানত করল, তখন সেখানে পাওয়া গেল অসংখ্য মদের মটকা। সেখান থেকে যাদের গ্রেফতার করা হলো, তারা জানাল, সকালের দিকে চীফ কমান্ডারকে একটি টিলার আড়ালে দেখা গিয়েছিল, এরপর আর তাকে দেখা যায়নি। ধুরন্ধর সাইফুদ্দীন যুদ্ধের পরিস্থিতি আঁচ করেই জীবন নিয়ে পালাল। যুদ্ধ শেষ হল, বিজয় হল সুলতান বাহিনীর। অবশ্যম্ভাবী একটি পরাজয় ও নির্মূল আগ্রাসন থেকে সুলতানের বাহিনী রক্ষা পেল। শত্রুবাহিনী হল কুপোকাত।

রাতের বেলায় বিশেষভাবে তৈরী একটি তাঁবুতে আপন ভাইয়ের লাশের পাশে বসে ফৌজী বলছিল—"আমি রক্ত নদী পার হয়ে তোমার অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছি দাউদ! ভাইয়ের মৃতদেহ আমার কর্তব্য পালনের সাক্ষী হয়ে আমার চোখের সামনেই পড়ে রয়েছে। দাউদ! আমি সেই রক্ত ফোরাত পেরিয়ে এসেছি যেখানে কোন পুল নেই, সেতু নেই...।"

ইত্যবসরে সুলতান আইয়ূবী সেই তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। ফৌজী সুলতানকে জিজ্ঞেস করল, মাননীয় সুলতান! আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যায়নি তো? যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে?

"আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের পরাজিত করেছেন। তোমরা বিজয়ী, হে-মা! তোমরা বিজয়ী। মা তোমাদের... সুলতান কথা শেষ করতে পারলেন না, তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, দু'চোখ গড়িয়ে পড়তে লাগল অঝোর অশ্রুধারা....।

* * *

জিন জযবা ও যোদ্ধা

তুর্কমান রণাঙ্গনের উত্তাপ থেমে গেল। সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর কমান্ডার ও সহযোদ্ধারা মালিক আস্-সালেহ্, সাইফুদ্দীন ও গোমশতগীনের যৌথ বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। বিজয়ী সৈন্যদের সামনে এখন পরাজিতদের মৃতদেহ, আর আহতদের তড়ফানোর করুণ দৃশ্য। ক্ষেপা ঘোড়া, উট ও গাধাগুলো নিজেদের বাঁধনমুক্ত করতে আহত সৈন্যদেরকেই পায়ে পায়ে পিষতে শুরু করেছে। যে সব শত্রুসেনা পালাতে সক্ষম হয়নি তারা হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে এক জায়গায় জড়ো হতে শুরু করেছে। বিপুল পরিমাণ ঘোড়া, উট, তীরে ভরা তীরদান, ঢাল, তলোয়ার, বর্ম, সড়কী, তাঁবু, আহার ও সোনাদানার মতো দামী জিনিসপত্র বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গোটা এলাকায়।

সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী শত্রুপক্ষের মহানায়ক সাইফুদ্দীনের বিশেষ তাঁবুতে দণ্ডায়মান। নিজ দলের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় ও আইয়ূবীর বিজয় অনিবার্য হয়ে উঠার লক্ষণ দেখে সাইফুদ্দীন সৈন্য সামন্ত ময়দানে রেখেই জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল। তার সাথে গেল তার ক'জন বিশেষ প্রশিক্ষিত নর্তকী, বিউটিশিয়ান। সাথে নিল প্রচুর নগদ মুদ্রা, সোনাদানা। যেসব সোনা দানা ও মুদ্রা সৈন্যদের বেতনভাতা হিসেবে তার কাছে ছিল রাষ্ট্রীয় আমানত।

সাইফুদ্দীনের তাঁবুটি খুব দামী শামিয়ানা এবং জড়িদার কাপড়ে তৈরী। চারদিকে কারুকার্যময় রঙ-বেরঙের নকশা। জায়গায় জায়গায় চুমকী ও মোতির দানাদার কাজ। আর তাঁবুতে ছিল বিলাসী রাজন্যবর্গের আরাম-আয়েশের সব আসবাব আয়োজন।

বিলাসী রাজা-বাদশারা যেমন আরাম আয়েশ ও মদ-নারীর আয়োজন ছাড়া এক দণ্ড টিকতে পারে না। সাইফুদ্দীনের ঘর থেকেও অনুরূপ বাহারী রঙ-বেরঙের মদভর্তি মশক বের হলো, পাওয়া গেল নানা বর্ণের ও নানা ধরনের বর্ণিল পানপাত্র।

সুলতান আইয়ূবী মনোমুগ্ধকর তাঁবু দেখছিলেন। তাঁর দৃষ্টি পালংকের উপর পড়তেই চমকে গেলেন, সাইফুদ্দীনের তরবারী পালংকের উপরে পড়ে রয়েছে!

সাইফুদ্দীন এমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেল যে তরবারীটি পর্যন্ত নেয়ার অবকাশ পেল না।

আইয়ূবী তরবারীটি উঠিয়ে খাপমুক্ত করলেন। ঝিলমিলে তরবারীটি সূর্যের আলোতে চমকাতে লাগল। আইয়ূবী তরবারীটি পরখ করে দেখলেন। পাশে দাঁড়ানো সেনাপতিদের ইঙ্গিত করে বললেন, "মুজাহিদের তরবারীতে যখন মদ ও নারীর ছায়া পড়ে, তখন তরবারী পরিত্যক্ত লোহায় পরিণত হয়। যে তরবারী ফিলিস্তিন বিজয়ের জন্যে কোষমুক্ত হওয়ার কথা ছিল, খ্রীস্টানরা সেটাকে মদ-নারী ও পাপে চুবিয়ে বেকার বানিয়ে ফেলেছে। যে তরবারীতে একবার শরাবের ছোয়া লাগে সেই তরবারী শত্রু নিধনে অক্ষম হয়ে পড়ে।"

সাইফুদ্দীনের রাজকীয় তাঁবুর পাশেই আরেকটি বিশাল সুদৃশ্য তাঁবুতে দেখা গেল কিছুসংখ্যক রূপসী যুবতী তরুণী অর্ধনগ্ন অবস্থায় ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। ওরা নিজেদের পরিণতি নিয়ে শংকিত। সাধারণত বিজয়ী সৈন্যরা বিজিতদের নারীদের সাথে যে ব্যবহার করে তা এসব তরুণী জানতো বলেই তাদের এতো ভয়। বিশেষ করে এসব অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণীদের দেখে বিজয়ী যোদ্ধার পক্ষে পাশবিকতার লাগাম টেনে ধরা বড়ই কঠিন। কিন্তু এসব অসহায় বিপন্ন তরুণীদের বিবর্ণ ভবিষ্যতের কালোমেঘের পরিবর্তে যখন সুলতানের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো, "তোমরা সবাই মুক্ত আযাদ। তোমরা যে যেখানে যেতে চাও, বলো। তোমাদেরকে সসম্ভ্রমে, সযত্নে পূর্ণ নিরাপত্তাসহকারে ঠিকানা মতো পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।"

ঘোষণা শুনে এসব তরুণীদের চোখ ছানাভরা। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে আরো বেশী ভড়কে গেল তরুণীরা। আইয়ূবী তরুণীদেরকে সরাসরি নিজের নিরাপত্তায় নিয়ে নিলেন। তাদের কাছে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, "তোমাদের সংখ্যা কতো?"

তারা বললো, "মাত্র দু'জন ছাড়া আর বাকী সবাই এখানেই রয়েছে। যে দু'জন নিখোঁজ ওরা ছিল খ্রীস্টান এবং সাইফুদ্দীনের একান্ত সেবিকা। সাইফুদ্দীনের সাথেই ওরা চলে গেছে হয়তো। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের নিয়ে আসা কখনও বরদাশত করতেন না আইয়ূবী।"

সাধারণত সেই যুগে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিজয়ী সৈন্যরা পরাজিতদের ফেলে যাওয়া রসদ ও সামগ্রী কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। সৈন্যদের একটা লক্ষ্য থাকতো পরাজিত বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঘরবাড়ি ও তাঁবুগুলো কব্জা করা। কারণ ওগুলোতে সোনাদানা, টাকা-পয়সা আরাম-আয়েশের বিচিত্র জিনিস পত্রের সমাহার থাকে এবং বেশী প্রাপ্তির আশা থাকে। বস্তুত পরাজিত হওয়ার পর

সাধারণত পরাজিত বাহিনীর কর্মকর্তাদের বাসস্থানগুলোতে বিজয়ী সৈনিকদের তাণ্ডব চলে। নারী তরুণীদের জীবন হয় বিজয়ীদের ভোগের সামগ্রী। দামী আসবাব ও তৈজসপত্র নিয়ে চলে দখলে নেয়ার প্রতিযোগিতা। মোদ্দাকথা, পরাজিতের জীবনে পরাজয় বয়ে আনে ভয়ংকর কেয়ামত।

কিন্তু সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর বিজয়ী বাহিনী এর ব্যতিক্রম। তাঁর কঠোর নির্দেশ— "যতো বড় অফিসারই হোক না কেন শত্রু বাহিনীর কোন মালে গনীমতের দিকে হাত বাড়ালে তাকে ক্ষমা করা হবে না।" মালে গনীমত জড়ো করা এবং সেগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করার জন্যে সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেডকে নির্দেশ দেয়া হতো। শুধু তারাই মালে গনীমত কুঁড়ানোর কাজ করবে। সকল আসবাব ও প্রাপ্ত সম্পদ জড়ো হওয়ার পর সুলতান আইয়ূবী নিজের হাতে মালে গনীমত সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। তুর্কমানের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ অবসানের পর আইয়ূবী মালে গনীমত কুঁড়ানোর নির্দেশ কোন ব্রিগেডকে দেননি। তিনি স্বদলীয় ও শত্রুবাহিনীর আহত সৈনিকদের তাঁবুতে তুলে আনা, তাদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজের ব্যবস্থা ও মৃতদের দাফন-কাফনের জন্যে সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন। হুকুম দিলেন আহত কয়েদী ও সুস্থ কয়েদীদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রাখতে, যাতে কারো অযাচিত কষ্টের মুখোমুখি হতে না হয়।

রণাঙ্গনে আইয়ূবীর রীতি-নীতি ও কৌশল ছিল খুব কঠোর ও অলঙ্ঘনীয়। চূড়ান্ত লড়াইয়ে যৌথবাহিনী অকল্পনীয় আক্রমণে দিকভ্রান্ত হয়ে পালাতে শুরু করে। সুলতান আইয়ূবীর বিশেষ বাহিনী ওদের পশ্চাদ্বাবন করে। সুলতানের ওইসব পশ্চাদ্বাবনকারী বাহিনী শত্রু সেনাদের তাড়িয়ে নেয়ার সময় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখতো এবং একটা নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হতো। সুলতান পশ্চাদ্বাবনকারীদের ফিরে আসতে নির্দেশ দিলেন এবং ডানে বামের দুই বাহুতে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত সেনাদের পূর্বেকার মতো সতর্ক প্রহরা অব্যাহত রাখতে বললেন।

আক্রমণে সুলতান ব্যবহার করেছিলেন ঝটিকা বাহিনী, তীরন্দাজ ইউনিট ও মিনজানিক পরিচালনাকারীদের। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বাহুতে অবস্থানকারী সৈন্যদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে ফিরিয়ে আনেননি। হামলা শেষ হওয়ার পর পরই তিনি তাঁর একান্ত নিরাপত্তারক্ষী রিজার্ভ বাহিনীর কমান্ড পুনরায় নিজের আয়ত্ত্বে নিয়ে নিলেন। "শত্রুদের আসবাব, সওয়ার, গাড়ি ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র কি করা হবে? মাননীয় সুলতান!" জানতে চাইল এক সেনাপতি। লড়াইয়ে আমাদের বিজয় হয়েছে।"

"এখনও আমি বিজয়ের আনন্দে বিভোর হতে পারছি না। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। আমার শিক্ষা তোমাদের এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে চলবে না।" বললেন সুলতান। "আমরা শক্রদের কেন্দ্রীয় কমান্ড তছনছ করে দিয়েছি বটে কিন্তু আমাদের কোন ইউনিট কি তাদের দু'বাহুর কোনটিতে আক্রমণ করেছিল? মনে হয় না। তাহলে বুঝতে হবে ওদের দুই বাহু না হোক অন্তত একটি বাহু অক্ষতই রয়ে গেছে। ওদের সেনাপতি ঈমান বিক্রেতা হতে পারে কিন্তু ওদের আনাড়ি ভাবা ঠিক হবে না। তাদের যে সেনা ইউনিট সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে তারা জবাবী আক্রমণ না করে ক্ষান্ত হবে না। এ-ও ত হতে পারে যে, তাদের রিজার্ভ ফোর্সও সম্পূর্ণ বহাল তবিয়তে রয়েছে।"

"ওদের কেন্দ্রীয় কমান্ড নিঃশেষ হয়ে গেছে সুলতান! তাদের সেনাদের কমান্ড দেয়ার মতো কেউ নেই।" বলল এক সেনাপতি।

"খ্রীস্টান বাহিনীর প্রতিআক্রমণের আশঙ্কাও করছি আমি। এ অঞ্চল খুবই জটিল। অসংখ্য টিলাপাহাড়ে ভর্তি। হতে পারে খ্রীস্টান বাহিনী কোন টিলার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে সুযোগের প্রত্যাশায়। শত্রুবাহিনী আর সাপের উপর কখনও নির্ভর করা ঠিক নয়। মরতে মরতে সাপ যেমন ছোবল মারতে পারে শত্রুবাহিনীও চরম দুরবস্থার মধ্যেও প্রতিআক্রমণ করে বসতে পারে। তাছাড়া সাইফুদ্দীনের কমান্ডার মোজাফফর উদ্দীনের কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। তোমরা সবাই জানো, মোজাফফর উদ্দীন এতো সহজে পালিয়ে যাওয়ার পাত্র নয়। আমি তার অপেক্ষা করছি। তোমরা সবাই সতর্ক থেকো। সৈন্যদের একত্রিত করো। মোজাফফর উদ্দীন যদি আমার সবক ভুলে গিয়ে না থাকে তবে দেখবে সে অবশ্যই জবাবী হামলা করবে।"

সুলতানের আশংকা ছিল যথার্থ। মোজাফফর উদ্দীন সুলতান আইয়ূবীর সেনাবাহিনীতে উঁচু পদের অফিসার ছিল এবং কেন্দ্রীয় কমান্ড দীর্ঘদিন খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছে। এক পর্যায়ে স্বার্থের মোহে পড়ে সাইফুদ্দীনের জালে পা দিয়ে সুলতানের শত্রুবাহিনীতে যোগ দেয়। মোজাফফর উদ্দীন ভালোভাবে জানে আইয়ূবী কোন দিকগুলোর প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়ে রণাঙ্গনের পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং যুদ্ধ চলাকানীর সময়ে কতো নাটকীয় ও নিপুণভাবে রদবদল করেন। মোজাফফর উদ্দীন ব্যক্তি হিসেবে যেমন সাহসী তেমনি মেধাবী। দীর্ঘদিন সুলতান আইয়ূবীর সান্নিধ্যে থেকে মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের দ্বারা যোদ্ধা হিসেবে তার বিশেষ একটা অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে গোটা মুসলিম বাহিনীতে। মোজাফফর উদ্দীনের মেধা প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা এবং বীরত্ব তাকে রণাঙ্গন থেকে পালানো থেকে বিরত রাখে। গভর্নর সাইফুদ্দীনের চাচাতো ভাই

হওয়ার সুবাদে শাসন ক্ষমতা ও মসনদের প্রতিও কিছুটা আসক্তি জন্মে মোজাফফর উদ্দীনের মনে। সুলতান মিশর থেকে বাগদাদ পদার্পণ করলে বাগদাদের অধিকাংশ ক্ষমতাশীন ব্যক্তি ও শীর্ষ আমলাশ্রেণী সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে ঠিক এ সময়ে মোজাফফর উদ্দীনও সুলতানের পক্ষ ত্যাগ করে বিরোধী শিবিরে শামিল হয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়।

মোজাফফর উদ্দীনকে যুদ্ধ বিদ্যায় ও আক্রমণ প্রতিআক্রমণ শামলানোর পারঙ্গমতায় যথেষ্ট সমীহ করেন আইয়ূবী। আইয়ূবীর বিরুদ্ধে 'কুরানে হুমাতের' যুদ্ধে মোজাফফর উদ্দীন যে চাল চেলেছিল সুলতান উভয় বাহুর কমান্ড নিজ হাতে নিয়ে তাকে শামাল দিতে হয়েছিল। তারপরও বহু মূল্য দিতে হয়েছিল সুলতানের।

এবারো অনেক শত্রুসেনাকে মোজাফফর উদ্দীনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন সুলতান। তারা সবাই মোজাফফর উদ্দীনকে দেখেছে বললেও ঠিক কোন ইউনিটে রয়েছে সে সম্পর্কে কেউ বলতে পারেনি। এ থেকে সুলতানের ধারণা আরো দৃঢ় হয়েছে যে, মোজাফফর উদ্দীন হামলা না করে মোটেও ফিরে যাওয়ার লোক নয়।

সুলতান যখন তার বাহিনীকে প্রতিআক্রমণের জন্যে তৈরী থাকতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে আইয়ূবীর শিবির থেকে দুই/তিন মাইল দূরে মোজাফফর উদ্দীন সহযোদ্ধাদের বলছিল, "আমি লড়াই না করে যাবো না।"

ঠিক সে সময় সাইফুদ্দীনের এক গোয়েন্দা এসে মোজাফফর উদ্দীনকে সাইফুদ্দীনের বার্তা জানাল, "অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, আমাদের অভিযান সম্পর্কে আগাম খবর পেয়েছিল আইয়ূবী। এজন্য আমরা আত্মপ্রতারিত হয়ে হেরেছি। তোমাকেও সহযোদ্ধাদের নিয়ে ফিরে গিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। কাউকে কিছু না জানিয়ে আমিও অজানা উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছি।"

"আমরা আপনার সব নির্দেশ মাথা পেতে নেবো। তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয়, যখন আমাদের অধিকাংশ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে এবং মাত্র এক-চতুর্থাংশ সৈন্য আমাদের বেঁচে আছে, এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে প্রতি আক্রমণ করা ঠিক হবে না।" বলল এক কমান্ডার।

"যে পরিমাণ যোদ্ধা আমার কাছে রয়েছে, আমার কাছে এ সংখ্যাই যুদ্ধের জন্যে যথার্থ। কেননা আইয়ূবী এর চেয়েও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করেও বিজয়ী হয়ে থাকে। এবার আমি তাকে ডানবাহু দিয়ে আক্রমণ করবো। বিগত কুরানে হুমাতের চাল এবার তাকে আমি চালতে দেব না।" বলল মোজাফফর উদ্দীন। তোমরা মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হও।

"আলী মাকাম! মৌসুলের গভর্নর তিনবাহিনীর বিশাল সমর আয়োজন ও শক্তি নিয়েও পরাজিত হয়েছেন। এতো অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আপনার প্রতিআক্রমণ

করা হবে আত্মহত্যার নামান্তর। আমি আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যে অনুরোধ করছি।" বলল ডিপুটি সেনাপতি।

"যে অধিনায়ক যুদ্ধ ময়দানে শরাবের মশক আর হেরেমের নর্তকী নিয়ে আসে ওদের নের্তৃত্বে তিন কেন দশটি সেনাবাহিনী থাকলেও সাইফুদ্দীনের মতোই পরিণতি বরণ করতে হবে।" বলল মোজাফফর উদ্দীন।

"শরাব আমিও পান করি বটে কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটু পানিও যদি না মিলে আমার পরোয়া নেই। সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবী আমাকে বেঈমান, গাদ্দার বলে থাকে, কিন্তু মুসলমান বলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত হবো না। কেননা, এযুদ্ধ হবে দুই সেনাপতির, দুই কৌশলী সমর নায়কের মোকাবেলা.....।

তোমরা সবাই নিজ নিজ ইউনিটকে তৈরী রাখো, কেননা, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর গোয়েন্দারা মাটির নীচের খবরও বলতে পারে। আজ রাতের অভিযানকে আরো সতর্কতার সাথে পরিচালনা করো। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রহরী ছড়িয়ে দাও। কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি দেখা মাত্রই যেন ধরে নিয়ে আসে। কমান্ডারদের বলল সেনাপতি মোজাফফর উদ্দীন।

শিবির স্থাপনের জন্যে মোজাফফর উদ্দীন এমন একটি জায়গা নির্বাচন করল যেখানে অনায়াসে সৈন্যরা তাঁবু খাঁটিয়ে থাকতে পারে। দূর থেকে কারো চোখে পড়ার অবকাশ নেই। মোজাফফর উদ্দীন হামলার জন্যে কোন সময় ঠিক করেনি—কমান্ডারদের সে বলল—'সুলতান আইয়ূবী শিয়ালের মতো ধূর্ত আর খরগোশের মতো ক্ষীপ্রগতির মানুষ।' আমার গোয়েন্দারা খবর দিয়েছে, সে এখনও মালেগনীমত কুড়ায়নি এবং তার দুই প্রান্তের সৈন্যদেরকেও ফিরিয়ে নেয়নি। এর মানে হলো, সে এখনই যুদ্ধ শেষ করতে চাচ্ছে না, সে আশংকা করছে আমি প্রতিআক্রমণ করব। কিন্তু এবার তাকে আমি অন্য চালে কুপোকাত করবো। সে দু'দিনের বেশী প্রতিআক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করবে না। আমি দু'দিনের মধ্যে আক্রমণ করবো না। তার সৈন্যরা যখন মালে গনীমত কুঁড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সেই সুযোগে আক্রমণ করবো আমি। কারণ, আমি তার যুদ্ধ কৌশল জানি, বুঝি কোন ক্ষেত্রে সে কি সিদ্ধান্ত নেবে। আমি আক্রমণ বিলম্বিত করে তাকে এ ধারণা দেব যে, আমরা পালিয়ে গেছি, তার আর প্রতিআক্রমণের আশংকা নেই। দেখো, এবারের মোকাবেলা হবে দুই বাহাদুরের বুদ্ধি ও কৌশলের লড়াই। বাস্তবে মোজাফফর উদ্দীনের এ আক্রমণের আশংকাই করছিলেন আইয়ূবী।

* * *

অকল্পনীয়ভাবে সাইফুদ্দীনের বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে সুলতানের সৈন্যরা। সাইফুদ্দীন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি এমন ঝড়ের মধ্যে আইয়ূবীর বাহিনী তার বিশাল বাহিনীর উপর চতুর্দিক থেকে হামলে পড়বে।

সুলতান ফৌজীর সংবাদ পেয়ে ঝড়ের তাণ্ডব কমার সাথে সাথেই তীরন্দাজ বাহিনীকে সাইফুদ্দীনের বাহিনীর দুই প্রান্ত থেকে আরো নিরাপদ দূরত্ব ঘুরে পিছনে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন, সেই সাথে ঝটিকা বাহিনীর বিশেষ কমান্ডোদেরও পাঠিয়ে দেন শত্রুসেনাদের রসদপত্রের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাতে।

চারজন করে একটি টিমে মোট তিনটি টিমের সমন্বয়ে বারোজনের একটি ইউনিট বিশেষ কমান্ডো বাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠন করা হতো। এসব যোদ্ধা শক্তি সাহস ও বাহাদুরীতে থাকতো অনন্য এবং বুদ্ধি ও কৌশলেও হতো প্রতিপক্ষের জন্যে যমদূত। এমনই একটি ইউনিট পলায়নপর শত্রুসৈন্যদের পশ্চাদ্বাবন করতে করতে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়ে অসামান্য সাফল্য লাভ করে কিন্তু বারোজনের গোটা ইউনিটে মাত্র তিনজন বেঁচে থাকল; আন্-নাসের এই ইউনিটের কমান্ডার।

তুর্কমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নপর শত্রু সেনাদের তাড়া করতে করতে মূল দল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল কমান্ডার আন্-নাসের-এর কমান্ডো ইউনিট। তার সহযোদ্ধাদের সবাই অশ্বারোহী, আগুনে তীর ও আধুনিক বর্শা ও প্রয়োজনীয় সব ধরনের সরঞ্জামে সজ্জিত।

আন্-নাসেরের জন্যে সুবিধা এই ছিল যে, তুর্কমান এলাকাটি ঘন বনজঙ্গল আর টিলা ঝোঁপ ঝাড়ের কারণে সহজেই তারা শত্রু বাহিনীর অনতিদূরে লুকিয়ে থাকতে পারতো এবং সুবিধা মতো রাতের আঁধারে শত্রুদের খাদ্য সামগ্রী বোঝাই গাড়ি ও অস্ত্রশস্ত্রবাহী গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দুশমনদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হতো।

এভাবে শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্বাবন ও রাতের আঁধারে গেরিলা আক্রমণ করে করে মূল শিবির থেকে বহু দূরে অচেনা জায়গায় চলে আসে তারা। দিনের বেলায় একদিন আন্-নাসের তার সেনা ইউনিট নিয়ে একটি টিলার নীচে তাঁবু খাটিয়ে আরাম করছিল, এমন সময় সে দেখতে পেল টিলার আড়াল থেকে শত্রু সেনারা তাদের অবস্থান দেখে ফেলেছে। কমান্ডোদের ক'জন টিলার উপরে তীর সজ্জিত ছিল, তাই শত্রুসেনারা আক্রমণে সাহস করেনি।

সন্ধ্যা নামতেই আন্-নাসের শত্রু বাহিনীর রসদপত্রের অবস্থান ও শিবিরটি পরখ করে দেখে নিল। ঘোড়াগুলোকে আগের স্থানেই বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু সে রাতের অপারেশন এতো সহজ ছিল না।

প্রতিপক্ষ গুপ্ত হামলাকারীদের প্রতিরোধ করতে পদাতিক ও অশ্বারোহী প্রহরা নিযুক্ত করে রেখেছিল। কিন্তু সবকিছু প্রত্যক্ষ করে আন্-নাসের সিদ্ধান্ত নিল, যে করেই হোক সে আজ রাতেই শত্রুবাহিনীর রসদপত্র ধ্বংস করে দেবে। সিদ্ধান্ত মতো সাথীদের তৈরী করে এক সুযোগে ঢুকে পড়ল শত্রুবাহিনীর রসদপত্রের ডিপোতে এবং আগুন ধরিয়ে দিল জ্বালানী ছিটিয়ে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। সাথীদের বলল, তোমরা ছড়িয়ে পড়। জ্বলন্ত আগুনের আলোতে কমান্ডোদেরকে শত্রুবাহিনী তীরের নিশানা বানাতে শুরু করল। অভিযানকারীরা নিজেদের রক্ষায় সফল হতে পারল না। একে একে সবাই শত্রু বাহিনীর তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করল। বেঁচে রইল আন্-নাসের ও তার সাথী তিনজন। বহু কষ্টে তারা চারজন জীবন নিয়ে শত্রু বাহিনীর ব্যারিকেড ডিঙ্গিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো।

শত্রু বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসে আন্-নাসের আসমানের দিকে তাকাল। কিন্তু কোন তারা গোচরীভূত হলো না। ঝটিকা বাহিনীকে তারা দেখে দিক নির্ণয় করার ট্রেনিংও দেয়া হতো। সেদিন আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। শত্রু বাহিনীর তাঁবুর আগুন দূর থেকেও দেখতে পেল নাসের। অন্য সাথীরা বেঁচে আছে না শহীদ হয়েছে মোটেও জানার সুযোগ ছিল না নাসেরের। সে মনে মনে তাদের মঙ্গলের জন্যে দুআ করল এবং সঙ্গীদের নিয়ে যেখানে তাদের ঘোড়া বাঁধা ছিল সেদিকে আন্দাজে রওয়ানা হল।

কিছুক্ষণ চলার পর শত্রুশিবির জ্বলার অগ্নিশিখাও আর দেখা গেল না। আকাশে জ্বলন্ত আগুনের যে লালিমা দেখা যেতো কিছুক্ষণ পর তাও মিলিয়ে গেল। পথ হারিয়ে ফেলল নাসের। আন্দাজের উপর চলতে শুরু করল।

অনেকক্ষণ চলার পর মাটির ধরনের পরিবর্তন মনে হলো। পাথুরে শক্ত যমীনের পরিবর্তে বালুকাময় নরম যমীনে দেবে যেতে লাগল পা। যেখানে কোন গাছ-গাছালী তো দূরে থাক কোন ঘাস লতাগুল্মও ছিল না।

বালুকাময় মাটি নাসের ও সাথীদের পাকে নিঃশ্চল করে ফেলল। আহার ও পানি ছিল তাদের অশ্বপৃষ্ঠে বাঁধা। ঘোড়া কোথায় আর নাসের ও সাথীরা কোথায় তা বলা মুশকিল।

নাসেরের প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেল, ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। তার সাথীরা বারবার তৃষ্ণার কথা বলতে লাগল। নাসের সেখানেই বিশ্রাম করার মনস্থ করল কিন্তু সাথীরা তাকে এই বলে অগ্রসর হতে বলল যে, সামনে হয়তো কোথাও পানি পাওয়া যেতে পারে।

অবশ্য এলাকাটি পানি শূন্য ছিল না, কিন্তু নাসের ও তার সাথীরা সেই অঞ্চলের সে দিকে অগ্রসর হতে থাকল যেদিকে ধুধু মরু ছাড়া পানির নাম-গন্ধও নেই। তারা পানির আশায় আরো কিছুক্ষণ পথচলার পর শ্রান্ত হয়ে সবাই বসে পড়ল।

ক্লান্ত-শ্রান্ত নাসের ও সহযোদ্ধারা কখন ঘুমের জগতে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল সেই অনুমান করার সামর্থ তাদের নেই। রাত পেরিয়ে পূর্বাকাশে সূর্য যখন চারদিকের মরুর বালু তপ্ত করতে শুরু করল তখন চোখ খুলে গেল নাসেরের। চারদিকে ধু ধু বালি আর বালি। সাথীদের দিকে তাকিয়ে দেখল নাসের, তারা তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঠিক ঘুম নয় যেন কয়টা অসার নিথর মরদেহ।

হতাশায় অবশিষ্ট মনোবলও উবে গেল তার। হৃদয়টা হাহাকার করে উঠল সাথীদের দিকে তাকিয়ে। মরুভূমি নাসেরের কাছে মোটেও অপরিচিত নয়, মরুতেই তার জন্ম। শৈশব থেকে বড় হয়েছে মরুর পরশেই। কত দুর্গম মরু পেরিয়েছে জীবনে, কতবার কঠিন যুদ্ধ করেছে মরুর বুকে। এই মরুভূমি তার চিরচেনা। কিন্তু এখানে এমন আদিগন্ত সীমাহীন মরুতে পথ হারিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে এটা কল্পনাও করতে পারেনি নাসের। মরুর অসীমতার চেয়ে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতরতা আর সাথীদের চলৎশক্তি রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি নাসেরকে আরো মারাত্মকভাবে দুর্বল করে ফেলল।

দৃষ্টি সীমায় কোন সবুজের চিহ্ন নেই, নেই কোন তরুলতা। বিগত দিনের কথা মনে হতেই পিপাসায় জ্বলতে শুরু করল কণ্ঠনালী। সাথীদের অবস্থা তো আরো করুণ।

সূর্য যেদিকে উঠেছে সেদিকে তাকিয়ে দেখল, সারিসারি পাহাড়। ওদিকে তার পক্ষে পা বাড়ানো নিরাপদ নয়। কারণ ওদিকে রয়েছে শত্রু বাহিনী। সাথীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল নাসের। ওরা চোখ মেলেই নিরাশার অন্ধকার দেখতে পেল। নিকট কোন স্থানে পানির দেখা মিলবে এ আশা ক্ষীণ হয়ে উঠল সবার কাছে।

"বন্ধুগণ! আরো দু'দিন ক্ষুধ-পিপাসা সহ্য করতে পারব আমরা। এই দুই দিনে আমরা ঠিকানায় পৌঁছাতে না পারলেও পানির সন্ধান ঠিকই পেয়ে যাবো।"

তিন সাথী প্রত্যেকেই নিজের মতো করে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে মতামত ব্যাক্ত করল। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, এরা মরুভূমির এতোটা গভীরে চলে এসেছে যে, এখান থেকে পায়ে হেঁটে সামনের দিকে হেঁটে কুল-কিনারা পাওয়া খুবই মুশকিল। সে সাথে ঘোড়া থাকলে হয়তো কিছুটা সহজ হতো। তাও তো নেই। অবশ্য রাতের দীর্ঘ ঘুমে তাদের শরীর কিছুটা চাঙ্গা হয়েছে, দেহে এসেছে সামান্য শক্তি।

"নাসের বলল, বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যে পরীক্ষার মুখোমুখী করেছেন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি কোন অভিযোগ না করা আমাদের কর্তব্য।"

এখানে বসে থেকে সূর্যের তাপে শুকিয়ে মরা অর্থহীন। এর চেয়ে চলো, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কোন পথ বের করে দেবেন। বলল এক সাথী।

চলতে শুরু করল তারা। আন্দাজের উপর দিক নির্ণয় করে নিল। একটু ঘোর পথে অগ্রসর হতে হলো তাদের। কেননা, শত্রু বাহিনীর দৃষ্টি সীমা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাটাও জরুরী। বেলা বাড়তে থাকল আর মরুর বালুকা রাশি তপ্ত হতে শুরু করল। দৃষ্টি সীমা ছোট থেকে ছোট হতে থাকল। মরুর মরীচিকায় মনে হতে থাকল সামনেই অথৈই পানির দরিয়া। যেন পানি থেকে বাষ্প উড়ছে, কিন্তু সবই ছিল মরীচিকা বাস্তব পানি নয়। এরা সবাই মরু চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত, তবুও পিপাসার কাতরতা তাদের হতাশ মনে মরীচিকাকেই পানি ভাবতে প্রতারণা দিচ্ছিল। নাসের অফুরন্ত প্রাণশক্তির বিনিময়ে এসব মরীচিকার ধোঁকায় না পড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ধীরগতিতে।

এক পর্যায়ে নাসের সাথীদের বলল, "বন্ধুগণ! আমরা ডাকাত নই যে, আল্লাহ্ আমাদের মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে প্রাণত্যাগে শাস্তি দিবেন। আমরা আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ। যদি মরুভূমিতে আমাদের মৃত্যু হয় তবে কিসের চিন্তা? এ মরণ হবে শাহাদত। কোন অপমৃত্যু নয়। সবাই আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহ্ অবশ্যই এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।"

"যদি এমন কোন মুসাফির পেয়ে যাই যে, তার কাছে পানি রয়েছে, তবে তার পানি ছিনিয়ে নিতে আমি মোটেও দ্বিধা করব না।" বলল এক সাথী।

সাথীর কথায় সবাই হেসে উঠল। অবশ্য এই কষ্ট হাসিতে তাদের খরচ করতে হল সঞ্চিত প্রাণশক্তি।

তখন একেবারে মাথার উপর সূর্যের আগুনে বয়লার। আর নীচে তপ্ত বালুতে জ্বলছে পা। শরীরের ঘাম নিঃশেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। সূর্যতাপ আর পিপাসায় শরীরের পানির অংশও নিঃশেষ প্রায়। সবাই মিলে মৃত্যুর পূর্বের তাহলিয়া পড়ার মতো ক্ষীণস্বরে আল্লাহ্ আল্লাহ্, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে লাগল। আর অবশিষ্ট সামর্থ ব্যয় করে করে সামনে এগুতে লাগল। মরুর তপ্ত লু-হাওয়া তাদের পদচিহ্ন মুছে দিচ্ছিল। এই বাতাস বাতাস নয় যেন আগুনের বয়লার উদগিরণ করছে গোশ্‌ত গলানো বাষ্প।

পশ্চিম দিকে হেলে পড়ল সূর্য, তখন নাসেরও সাথীদের চলার গতি একেবারেই ক্ষীণ। একেক জনের একেকটি পা যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছে, প্রতিটি কদম উঠাতে এবং সামনে ফেলতে হচ্ছে শক্তির সবটুকু প্রয়োগ করে। সবার মুখ শুষ্ক তবু ঠোঁটে আল্লাহ্র যিকির।

পড়ন্ত বেলায় তাদের শরীরের ছায়া বালিয়াড়িতে একেবেঁকে খেলা করতে শুরু করেছে, তখন এক সাথীর ঠোঁট নড়াও বন্ধ। কিছুক্ষণ পর অপর এক সাথীর ঠোঁটের স্পন্দনও নিঃশেষ। নাসের ও তার তৃতীয় সাথী শুধু ক্ষীণ আওয়াজে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির অব্যাহত রেখেছে। আর কিছুক্ষণ পর তাদেরও আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল।

নিজেদের আখেরী ওয়াক্ত সমাগত হতে দেখে শরীরের অবশিষ্ট শক্তির সবটুকুই দিয়ে নাসের সাথীদের উদ্দেশ্যে বলল, বন্ধুগণ! আমাদের শরীরের রক্ত ও জলীয় পদার্থ নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু ঈমানের বাষ্প নিঃশেষ হবার নয়। ঈমানী শক্তি আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে। নাসের সাথীদের দিকে তাকিয়ে দেখল সবার মুখই শুকিয়ে পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে, চোখ কোটরে ঢুকে গেছে, চেহারায় রক্তের লেশমাত্র নেই।

সূর্য ডুবে গেল। রাত বাড়ার সাথে সাথে মরুর বালু ঠাণ্ডা হতে শুরু করল। সাথীদের চলৎশক্তি বারবার থমকে গেলেও নাসের তাদের থামতে দিল না। রাতের ঠাণ্ডায় কিছুটা দ্রুত চলা সম্ভব। নাসের গতি বাড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার নিজের গতিইতো রহিত হওয়ার উপক্রম। যদি সে এবং তার সাথীরা আরব যোদ্ধা না হতো এবং সেনা বাহিনীর বিশেষ ইউনিটের স্পেশাল ট্রেনিংপ্রাপ্ত না হয়ে সাধারণ মুসাফির হতো অনেক আগেই মরুভূমিতে চলৎশক্তি হারিয়ে মরুর বুকে শুকিয়ে মরতে হতো তাদের। কিন্তু বিশেষ ট্রেনিং এবং প্রতিকূল পরিবেশে অত্যধিক কষ্ট সহিষ্ণু হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার কারণে আল্লাহ্‌র রহমতে এখনও সাথীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে তারা।

নাসের আরো কিছুক্ষণ চলার পর নিজেই দাঁড়িয়ে গেল এবং সাথীদের বলল শুইয়ে পড়তে।

* * *

অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগল নাসের। পরিষ্কার আকাশ। তারা দেখে নাসের আন্দাজ করল রাতের আর কতটুকু বাকি। সাথীদেরও জাগাল । সবাইকে নিয়ে সামনে এগুতে শুরু করল কিন্তু সবার অবস্থাই এমন যে কারো মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না। তবে তাদের গতি ছিল গত রাতের চেয়ে কিছুটা তীব্র।

"এই মরু প্রান্তর খুব বেশী দীর্ঘ হওয়ার কথা নয়। হয়তো আজ আমরা মরু এলাকা অতিক্রম করতে পারব, আর তা না হলে আশা করি পানি পেয়ে যাবো।" বলল নাসের।

যে পানি দিনের আলোতে ছিল মরীচিকা। রাতের অন্ধকারে তা আশার দীপ শিখায় পরিণত হলো। সেই আশার আলোতেই পথ চলতে শুরু করল নাসেরের কাফেলা। ভোর রাতের আঁধার কেটে পূর্বাকাশে যখন সূর্য উঁকি দিল সেই সাথে বিলীন হয়ে গেল তাদের পানি প্রাপ্তির প্রত্যাশা। অবশ্য নতুন এলাকাটি মরু বালিময় ছিল না, এখানকার যমীন শক্ত কিন্তু দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টিতে ফেটে চৌচির। শুধু পাহাড় আর পাহাড়ী টিলা। কোথাও কোন গাছ-গাছালী নেই। মাটি এতো শক্ত যে পায়ের আঘাতে ধূলো বেরিয়ে আসতো। কতো দিন থেকে এ মাটি তৃষ্ণার্থ তার কোন ইয়ত্তা নেই।

আট দশ মাইল দূরে দেখা গেল সারি সারি পাহাড় আর উঁচু টিলার চূড়াগুলোকে মনে হচ্ছিল মিনার চূড়া। যমীনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন শত বছর থেকে এরা তৃষ্ণার্ত, হয়তো এই সৈনিকদের রক্ত পান করে এরা তৃষ্ণা মেটাবে।

সাথীদের চেহারার দিকে তাকিয়ে নাসের বুঝতে পারল তার নিজের অবস্থা কি হয়েছে। তার এক সাথীর জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে। খুব ধীরলয়ে নড়ছে ঠোঁট। সার্বিক অবস্থা এতই ভয়ংকর যে পুনর্বার কারো দিকে তাকানোর সাহস হলো না তার। অবস্থা এমনই বেগতিক মনে হলো যে, দৃশ্যত মিনারগুলো পর্যন্ত এদের নিয়ে যাওয়া অসম্ভব মনে হলো নাসেরের কাছে।

নাসের এই ছোট কাফেলার কমান্ডার। নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন নাসের। যদিও তার নিজের অবস্থাও সাথীদের থেকে ভিন্ন নয়। তবুও জীবনের শেষ শক্তি ব্যয় করে সাথীদের উদ্দেশে দু'কথা বলার চেষ্টা করল নাসের। কিন্তু সংকল্প সংকল্পতেই রয়ে গেল, চেষ্টা করেও নাসেরের মুখ থেকে আওয়াজ বের হলো না। তখনও বোধশক্তি অন্যদের তুলনায় স্বাভাবিক ছিল তার। বলার শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল।

সূর্য যতই উপরে উঠতে শুরু করল, মরুর আগুন বাড়তে লাগল। সাথীদের অবস্থা এ পর্যায়ে উপনীত হলো যে, তারা পা আর উঠাতে পারছিল না। পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে এগুচ্ছিল। যে সিপাহীর জিহ্বা বেরিয়ে এসেছিল তার হাত থেকে বর্শা পড়ে গেল। কোমর থেকে তরবারী খুলে ফেলে দিল সে। সে কি করছিল সেই বোধ ছিল না তার। শরীরকে ভারমুক্ত করতে বোধহীন ভাবেই কাজ করছিল তার দু'হাত। সামনে হঠাৎ দ্রুত হাঁটতে লাগল সেই সাথী। মরুর নির্মম যাতনার প্রভাব এমনই যে, পথহারা কোন মুসাফির যখন পথ হারিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষের মতো নিজের অজান্তেই সে ভারমুক্ত হতে শরীর থেকে সব কাপড়-চোপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাব পত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

মরু মুসাফিররা যখন পথের কোন স্থানে এ ধরনের আসবাব পড়ে থাকতে দেখে তখন তারা ভাবতে থাকে সামনে হয়তো কোন হতভাগার মৃতদেহ দেখতে হবে।

নির্মম মরু নাসেরের এক সাথীকে জীবনের সেই পরিণতিতে পৌঁছে দিল, যে পর্যায়ে পৌঁছালে মানুষ দুনিয়ার আসবাব ও রসদপত্রকে অপ্রয়োজনীয় এবং স্বীয় কর্তব্য ভুলে যায়। নাসের সেই সহযোদ্ধার তরবারী ও বর্শা উঠিয়ে বড় কষ্টে বলল, "এতো জলদি হার মেনো না বন্ধু! আল্লাহর পথের সৈনিক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে কিন্তু তরবারী ফেলে না। নিজের মর্যাদা ও সম্মানকে বালিতে নিক্ষেপ করো না।"

নাসেরের কথায় সাথী তার দিকে তাকিয়ে রইল। নাসেরও অপলকনেত্রে দেখতে লাগল সাথীকে। হঠাৎ সেই সাথী অট্টহাসি শুরু করল এবং গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে বলতে লাগল দেখো—পানি... পানি... বাগান...। এই বলে সামনের দিকে দৌড় মারল। কয়েক কদম এগিয়ে হাত, পা ছড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সেই সাথী।

বাস্তবে না সেখানে পানি ছিল, না ছিল মরীচিকা। কারণ সেখানকার যমীনের চরিত্র এমন ছিল যে মরীচিকাও প্রতিফলিত হতো না। কারণ ধু ধু বালির উপরে রোদের কিরণ প্রতিবিম্বিত হয়ে পানিময় যে মরীচিকা দেখা যায় সেই যমীনটি সে ধরনের ছিল না। আসলে নাসেরের সেই সাথীর বোধশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল তৃষ্ণার যাতনায়। কষ্টে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে প্রত্যাশার কল্পনাই দৃষ্টিভ্রমে পরিণত হয়েছিল বাস্তব কোহেলিকা। কল্পনায় সে পৌঁছে গিয়েছিল সুসজ্জিত ঝর্ণাপাশের মনোরম বাগিচা সদৃশ স্থানে, যেখানে পিপাসার যাতনা নেই, পানির দুর্ভোগ নেই। ধূসর মরুর বুকেরই দৃশ্যমান পাহাড় চূড়াগুলো তার কাছে মনে হচ্ছিল সুসজ্জিত অট্টালিকা, বাতাসের ঢেউ আর ইতস্তত বালিয়াড়ীগুলো তার কাছে মনে হচ্ছিল গমনাগমনরত মুসাফির কাফেলা। মরুর মৃদু বাতাসের উড়ন্ত ধূলোবালিকে মনে হতে লাগল নৃত্যরত গায়িকা ।

নির্মম মরু নাসেরের এক সাথীকে পৌঁছে দিয়েছিল বাস্তব রূঢ়তা থেকে কল্পনার আয়েশী জগতে। মরু তার জীবনের আখেরী মুহূর্ত নিয়ে পরিহাসে মেতে উঠল। হয়তো বা এটা নিরস, রুক্ষ মরুর একটা মায়াবী দিক যে, কঠিন যাতনায় কোন মুসাফিরের জীবন হরণের আগে তাকে কল্পনার স্বর্গে প্রতারণার মায়াবীচক্রে নিক্ষেপ করে; যাতে করে যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায় হতভাগা মুসাফির।

নাসেরের সাথী নিজ থেকে আবার দৌড় লাগাল। কিন্তু অবসন্ন শরীর তাকে এগুতে দিল না বেশীদূর। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটি পা হেঁচড়ে বহু কষ্টে

এগুচ্ছিল, সেই এখন পর পর দু'বার পড়ে গিয়ে আবার সামনের দিকে দৌড়াতে লাগল। এটা ছিল নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের জ্বলে উঠার মতো। নাসের এবার দৌড়ে তাকে ধরে ফেলল। তার অন্য সাথীরাও পরিস্থিতির আকস্মিকতায় দৌড়ে ঐ সাথীকে ধরতে চেষ্টা করল। বেসামাল সাথী নাসেরের পাঞ্জা থেকে নিজেকে ছাড়ানোর জন্যে হাত পা ছুঁড়তে লাগল এবং চেচিয়ে বলতে লাগল, "তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, ঐ যে দেখো পানি ভর্তি পুকুর! সেখানে কত সুন্দর সুন্দর হরিণ দল পানি পান করছে। চলো সবাই সেই পুকুরে গিয়ে পানি পান করি।"

সাথীরা তাকে দু'বাহুতে ধরে রাখল। বেহুঁশ সাথী পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে সামনে এগুতে শুরু করল। নাসের তার মাথার কাপড় টেনে চেহারা ঢেকে দিল যাতে সে কিছু দেখতে না পারে।

* * *

মাথার ঠিক উপরে দুপুরের সূর্য তখন আগুন ঝরাচ্ছে। শুষ্ক মরুময় মাটি ফেটে তামার মতো আগুনে রূপ ধারণ করেছে। ইতিমধ্যে আরেক সাথী হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, ...ঐ দেখো, কতো সুন্দর বাগান, নর্তকীরা নাচছে। ধিক তোমাদের, পানি...! চলো, নৃত্য দেখি, সুন্দর বাগান দেখি। বন্ধুরা, চলো, ঐ দেখো, সেখানে কতলোক আহার করছে, পানি আছে, অঢেল পানি। আমি ওদের সবাইকে চিনি। কোন অসুবিধা হবে না। চলো!.......। এই বলে সেই সাথীও সামনের দিকে দৌড়াতে লাগল।

যে সাথী কিছুক্ষণ আগে কল্পনায় বেসামাল হয়ে পড়েছিল অনেকক্ষণ ধরে আর কোন কথা বলল না। নিশ্চুপ পথ চলছে। ফলে তাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল অন্য সাথীরা। কিন্তু অপর সাথীকে চিৎকার করে দৌড়াতে দেখে ওর পিছনে সেও পুনর্বার দৌড় দিল। আর চিৎকার করে বলতে লাগল, "আহ্! ভারী সুন্দর নৃত্য, এই নর্তকীকে আমি চিনি। কায়রোতে আমি ওকে দেখেছিলাম। ও আমাকে চিনে। আমি ওর সাথে নাচবো, গাইবো। শরবত পান করবো....।"

নাসেরের মাথা এবার চক্কর মারল। বোধশক্তি তার তখনও অক্ষুণ্ন ছিল। দীর্ঘ যাতনা ও কষ্ট তাকে এখন পর্যন্ত বেহাল করতে পারেনি। কিন্তু সাথীদের বেহাল অবস্থা তাকে অসহায় করে তুলল। এদের এই দুরবস্থায় সামলানো তার পক্ষে অসম্ভব। তার নিজের শারীরিক অবস্থাও তো ওদের মতোই...। কিন্তু দু'জন সাথীকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করা তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব। মাত্র এক সাথীর বোধশক্তি এখনও ঠিক রয়েছে। কিন্তু শারীরিক দিক থেকে তার অবস্থাও যে শোচনীয়!

যে দুই সাথী কাল্পনিক নৃত্যরত নর্তকী ও বাগানের পিছনে দৌড়াল একটু অগ্রসর হয়ে উভয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নাসের ও তার অপর সাথী এদের উঠিয়ে বসাল এবং কাপড় দিয়ে ওদের চেহারা আড়াল করে দিল। এদের মাথা দুলছে, ঘাড় সোজা করতে পারছে না।

"বন্ধুরা! তোমরা আল্লাহ্‌র পথের সৈনিক। তোমরা প্রথম কেবলা ও খানায়ে কা'বার রক্ষী। ইসলামের শত্রুদের কোমর ভেঙে দিয়েছো তোমরা। তোমাদের ভয়ে কম্পমান বেঈমান কাফের শক্তি। আগুন পেরিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার মতো মর্দে মু'মিন তোমরা। এই রুক্ষমরু, এই সূর্যতাপ, এই ক্ষুৎ-পিপাসায় তোমরা এতোটা বেসামাল হয়ে গেলে! তোমরা কি লক্ষ্য করেছো, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হচ্ছে। মু'মেন পানির শীতলতায় নয় ঈমানের উষ্ণতায় বেঁচে থাকে।" ক্ষীণ আওয়াজে সাথীদের উদ্দেশে বলল নাসের।

উভয় সাথী চোখ খুলে নাসেরকে দেখল। নাসের তাদের প্রতি তাকিয়ে শুষ্ক হাসি দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল। আবেগের আতিশয্যে নাসের সাথীদের উদ্দেশে বলা কথায় কাজ হলো, উভয় সাথী কল্পনার স্বর্গরাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে এলো এবং উঠে খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

সকাল বেলায় যেসব মিনার তাদেরকে আশার আলো দেখাচ্ছিল এগুলো এখন কাছে চলে এলো এবং মিনার ও শহরের অট্টালিকার পরিবর্তে উঁচু উঁচু টিলা ও পর্বত হয়ে চোখের ভ্রম দৃষ্টিকে বাস্তবতার নির্মম অবয়বে ভেসে উঠতে লাগল। অবশ্য অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল এখানকার কোথাও না কোথাও পানি পাওয়া যাবে। নাসের সাথীদের বলল, "আশা করি আমরা পানির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। হয়তো সন্ধ্যার আগেই আমরা পানি পেয়ে যাবো।" কিন্তু পাহাড়ী সেই যমীন ও জায়গাটার বাস্তব অবস্থা দেখে পানি প্রাপ্তির আশা ভোরের শিশিরের মতোই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। যেন পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছল তারা। হঠাৎ করে আবার এক সাথী চেচিয়ে দৌড়াতে লাগল এই বলে যে, "হায়! আমার গ্রামে এসে গেছি, এই তো দেখা যায় বাচ্চারা কূয়া থেকে পানি উঠাচ্ছে। এসো, এসো। তোমাদের জন্যে আমি উমদা খানাপিনার ব্যবস্থা করব।"

আকাশের দিকে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে কাতর মিনতি করল নাসের। বলতে লাগল, "আয় যুলজালাল! তোমার নামে আমরা যুদ্ধ করতে এবং মরতে এসেছিলাম। আমরাতো চুরি, ডাকাতি করিনি; তোমার নাফরমানিও করিনি। বেঈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি অপরাধ হয় তবে আমাদের তুমি মাফ করে দাও। আমাদের ক্ষমা করে দাও। হে অসহায়দের সাহায্যকারী প্রভু! আমার জীবন

নিয়ে নাও, আমার শরীরের অবশিষ্ট রক্তকে পানিতে পরিণত করে হলেও সাথীদের তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করে দাও, তাদের বাঁচিয়ে রাখো। ওরা তো তোমার রাসূলের সম্মানে বেঈমানদের অধিকৃত প্রথম কিবলাকে উদ্ধার করতে জিহাদ করছে, ওরা কোন কসুর করেনি। আমার রক্ত পানি করে ওদের প্রাণ বাঁচাতে পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা কর প্রভু...! তার সাথীরা উঠে দাঁড়াল এবং দু'হাত প্রসারিত করে সামনে অগ্রসর হতে লাগল যেন তারা কিছু একটা পেয়ে গেছে। নাসের ও তার যে সাথীর এখনও পর্যন্ত মাথা ঠিক ছিল সাথীদের অগ্রসর হতে দেখে সেও পা হেঁচড়ে অগ্রসর হতে লাগল। নাসেরের দু'চোখও হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল কিন্তু পরক্ষণেই মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো অন্ধকার কেটে গেল নাসেরের দৃষ্টি থেকে। সে নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হলো। নাসের অনুধাবন করল নির্মম মরু সাথীদের মতো তাকেও ধোকা দিতে শুরু করেছে, ক্ষণিকের জন্যে হলেও তার চোখের সামনেও ভেসে উঠেছিল সবুজ শ্যামলের সমারোহ। অবশ্য বেশী সময় স্থায়ী হলো না দৃষ্টিভ্রম। নাসেরের চোখের সামনে উঁচু টিলা আর পাহাড়ের অবস্থান তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে বাধ্য করল।

* * *

অতি কষ্টে সাথীদের নিয়ে পাহাড়ের নীচুভূমি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল নাসের। যেন জীবন্মৃত এক কাফেলা। দু'টি সমতল অনুচ্চ টিলার বুক অতিক্রম করছিল তারা। নাসের আগে আগে সাথীরা তার পিছনে। একটু সামনে নাসের দেখতে পেল অনেক পূর্বেকার পানিবাহিত একটি মরা নদীর ছাপ। হয়তো শতবছর আগে এখানে পানি ছিল, পানি প্রবাহের চিহ্ন রুক্ষ মরু এখনও ধরে রেখেছে।

হঠাৎ নাসের মাথা ঝাঁকাল, চোখ দু'টি রগলে নিল একটু। নিজের দৃষ্টির উপরে বিশ্বাস করতে না পেরে চোখ বন্ধ করে পুনরায় চোখ মেলল, কিন্তু পূর্ববৎ সেই দৃশ্যই দেখতে পেল নাসের। সমতল টিলাটি এক জায়গায় গিয়ে কিছুটা নীচে গিয়ে হারিয়ে গেছে, কিন্তু এক পাশে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট একটি তাঁবুর মতো বাড়তি টিলার আড়ে অল্প জায়গায় ছায়া পড়েছে, সেই ছায়ার মধ্যে দু'টি ঘোড়া দাঁড়ানো। ঘোড়া দু'টির পাশেই বসা দু'টি অনিন্দ্য সুন্দরী, এরা নাসেরের কাফেলাকে আসতে দেখে চকিত হরিণীর মতো সূক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে উঠে দাঁড়াল।

নাসের এদের দেখে থেমে গেল। সাথীদের জিজ্ঞেস করল, "তোমরাও কি ওখানে দু'টি ঘোড়া এবং দু'জন তরুণী দেখতে পাচ্ছ?"

যে দুই সাথী সর্বাগ্রে দৃষ্টিভ্রম ও বোধ বিলুপ্তির শিকার হয়েছিল এদের একজন কোন কথা বলল না। অপরজন বলল, "সব ধূয়াশা, আমি কিছুই দেখছি না।" যে

সাথীর তখনও পর্যন্ত মাথা ঠিক ছিল সে নাসেরের কানে কানে বলল, "হ্যাঁ। আমিও তো তাই দেখতে পাচ্ছি।"

"আল্লাহ্ আমাদের রহম করুন। আমাদের দেমাগও খারাপ হয়ে গেছে। আমিও মনে হয় তাই দেখছি যা বাস্তব নয়। এই বিরান দোযখে এমন অনিন্দ্য সুন্দরী কোত্থেকে আসবে?"

"এরা যদি মরু এলাকার যাযাবর হতো তাহলে হয়তো মনে করা যেতো যে আমরা সত্যিই দেখছি। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তো এমনটি মনে হয় না। আচ্ছা, চলো ছায়ায় বসি। এরা আসলে কোন নারী নয় আমাদের দৃষ্টিভ্রম।" বলল নাসেরের সাথী।

"আমার কিন্তু বোধশক্তি সম্পূর্ণ ঠিক আছে।" বলল নাসের। আমি তোমাদের ঠিক মতোই দেখছি, অনুধাবন করছি তোমাদের কষ্ট। তোমাদের কথাবার্তাও বুঝতে পারছি, আমার কোন বিভ্রম নেই।"

"দেমাগ আমারও খারাপ হয়নি।" প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি ভুল না দেখে থাকি তবে মেয়ে দু'টি মানুষ নয় জ্বীন হবে।" বলল নাসেরের সাথী।

মেয়ে দু'টিও নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে মূর্তির মতো। নাসের সাহসী যোদ্ধা। কোনকিছুর পরোয়া না করে সে মেয়ে দু'টির দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু মেয়ে দু'টি আগের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য! জ্বীন তো মানুষের উপস্থিতিতে মানুষের অবয়বে থাকে না!

মেয়ে দু'টি থেকে নাসের যখন মাত্র পাঁচ/ছয় কদম দূরে তখন এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্কাটি ডান হাত নাসেরের দিকে প্রসারিত করে দিল, তবে তার হাত ছিল মুষ্ঠিবদ্ধ। সে শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল দু'টি নাসেরের প্রতি বাড়িয়ে দিল। থেমে গেল নাসের। এমন অনিন্দ্য সুন্দরী নারী জীবনে কখনও দেখেনি নাসের। মেয়েটির ওড়নার ফাঁকে বেরিয়ে থাকা চুলগুলো যেন রেশমের সূতীক্ষ্ণ নরম সূতো। চোখ দুটো তারার মতো উজ্জ্বল। গভীর মনোহর চাহনী, এক কথায় কোন মৃতপ্রায় পুরুষের মধ্যেও পৌরুষ জাগানিয়া অপরূপা তরুণী দু'টি।

"তোমরা সৈনিক! তাই না?" জিজ্ঞেস করল বড় মেয়েটি। "কার সৈনিক তোমরা?"

"সবই বলব, কিন্তু এর আগে আমাকে বল, তোমরা কি মরু বিভ্রম না জান্নাতের হুর?"

"আমার যাই হই না কেন, আগে তুমি বল, তোমরা কে? কোত্থেকে এদিকে কেন এসেছো? আমরা মরু বিভ্রম নই, তোমরা যেমন আমাদের দেখছো, আমরাও ঠিক তোমাদের দেখছি।" বলল বড় মেয়েটি।

"আমরা সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর গেরিলা ইউনিটের সৈনিক। তোমরা যদি জান্নাতের হুর হয়ে থাকো, অথবা জ্বীন গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে থাকো, তবে হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোহাই, আমার সাথীদের পানি পান করিয়ে দাও। প্রয়োজনে এর পরিবর্তে আমার জীবন নিয়ে নাও। কারণ এদের প্রাণ রক্ষা করা এখন আমার জিম্মাদারী।"

"হাতের অস্ত্র আমাদের সামনে ফেলে দাও।" হাত নামাতে নামাতে বলল তরুণী। "হযরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের আবেদন আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না। তোমার সাথীদের ছায়ায় নিয়ে এসো।"

মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক ধরনের শিহরণ অনুভব করল নাসের। যেন শীতল একটা বাতাস মাথা দিয়ে প্রবেশ করে তার পায়ের পাতা ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। তার সারা শরীরকে কেমন যেন বোধহীন করে শীতল করে দিয়েছে, যে অনুভূতি একান্তই অনুভবের, ব্যক্ত করার মতো নয়। কারণ মানুষ শত্রুদের মোকাবেলা করতে অভ্যস্ত সে। তার গেরিলা আক্রমণের ভয়ে প্রতিপক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। গোটা মুসলিম বাহিনীতে তার ছিল ঈর্ষণীয় সাফল্য। কিন্তু এই তরুণী দু'টির সামনে তার বীরত্ব সাহস সবই কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেলো। তার মনের গহীনে এমন এক ভয়ের সঞ্চার হলো যা কোনদিন সে অনুভব করেনি। জীবনে জ্বীন-পরীর বহু গল্প শুনেছে সে; কিন্তু জ্বীনের মুখোমুখী হয়নি কখনও। তার বিশ্বাস ছিল, যে কোন সময় এই মেয়ে ও ঘোড়া দু'টি অদৃশ্য হয়ে যাবে, অথবা রূপ বদলে ফেলবে। এদের বিরুদ্ধে তার কিছুই করার নেই। তাই মেয়ে দু'টির সামনে সে নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় করে ফেলল। সে সাথীদের এসে বলল, চলো ছায়ায় যাই। তার সাথীদের একজন তো ইতিমধ্যেই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। তাকে টেনে হেঁচড়ে ছায়ায় নিয়ে গিয়েছিল নাসের।

তোমাদের পরিচয় কি, কোত্থেকে এসেছো? জিজ্ঞেস করল তরুণী।

আগে পানি পান করাও! অনুরোধ করল নাসের। শুনেছি, জ্বিনরা না-কি বলার সাথে সাথে সবকিছু হাজির করতে পারে।

ঘোড়ার পিঠে পানির পাত্র আছে। ওখান থেকে একটি খুলে নিয়ে এসো।

নাসের একটি ঘোড়ার জিন থেকে পানির পাত্র খুলে নিল। এরপর সবার আগে বেহুঁশ সাথীর চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিল। পানির ঝাপটায় সে চোখ খুলে উঠে বসল। নাসের পানির পাত্রটি এগিয়ে দিল ওর মুখে। সে পান করল কয়েক ঢোক। এরপর অন্যদেরকেও অল্প অল্প করে পান করাল। নিজেও পান করল কয়েক ঢোক। পানি পানের পর নাসেরের ঘোর কেটে গেল। সে অনুভব করল এরা

জিন্নাত হতে পারে না। জিন হলে আমাদের চেতনা পুরোপুরি ফিরে আসার সাথে সাথে ওরা উধাও হয়ে যেতো। কিন্তু ওরাতো বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। আরো অনুভব করল পানিতো তারা কল্পনায় পান করেনি। বাস্তবিকই পান করেছে। শরীরটায় প্রাণ ফিরে এসেছে। এতো জীবন্ত বাস্তবতা। আবারো গভীরভাবে নিরীক্ষা করল তরুণীদের। আগের চেয়ে বেশী সুন্দর লাগছে ওদের। আবারো সৌন্দর্যের মোহে আত্মহারা হলো নাসের। না, এরা মানুষ হতেই পারে না। মানুষ কি এতো সুন্দর হতে পারে? এরা অবশ্যই জিন হবে।

ক্ষুধা-পিপাসা, আবেগ-যাতনায় নাসেরের দেমাগ এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে, সে বিষয়টিকে আর বাস্তবতার নিরীখে যাচাই করার শক্তি পেল না। সে অনুভব করল, তার বিবেক বোধ আর নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। মৃতপ্রায় সাথীদের মধ্যে প্রাণ ফিরে এসেছে। কিন্তু মেয়ে দু'টিকে কেন্দ্র করে ওদের মধ্যে দেখা দিল আতংক। তারা যে জায়গাটিতে বসা ওখানে ছায়া ছিল, তাই মরুর আগুন অতোটা তাদের গায়ে পড়ছিল না কিন্তু বাইরের দিকে তাকানোর শক্তি ছিল না কারো। আগুনে লু হাওয়া মাঝে মধ্যেই ওদের জানিয়ে দিল কতো ভয়ংকর যাত্রা তারা পাড়ি দিয়ে এসেছে।

তরুণী দু'টি নীরবে দেখছিল ওদের। আর নাসের ও সাথীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে। ভিতরে ভিতরে ওদের আতংক। তাদের জানা মতে, জিনরা অনেক শক্তির অধিকারী। ইচ্ছে হলে, পাহাড় উঠিয়ে চাপা দিতে পারে, আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে। এমনকি মানুষকে অপহরণও করে ওরা। জানা নেই এরা ওদের সাথে কি ব্যবহার করে।

বড় তরুণীটি ডান হাতের মধ্যমা উঁচু করে হাত প্রসারিত করল নাসেরের দিকে। বলল, ওই পুটলীটা খুলে তোমার সাথীদের দাও।

যন্ত্রচালিতের মতো নাসের ঘোড়ার জিন থেকে পুটলী খুলে আনল। খুলে দেখল ওর মধ্যে কিছু খেজুর ছাড়াও রয়েছে রান্না করা শুকনো গোশ্ত। সাধারণত আমীর ব্যক্তিরা এ ধরনের গোশ্ত খেয়ে থাকে। পুটলী খুলে নাসের তাকাল তরুণীর দিকে।

তরুণী বলল, সাথীদের নিয়ে খাও!

নাসের সাথীদের মধ্যে সবগুলো ভাগ করে দিল। বাহ্যত খাবারের পরিমাণ বেশী ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থায় এগুলো একজনের খাবার। কিন্তু সবাই মিলে খেয়েও তারা তৃপ্ত হলো। কারণ কয়েক দিনের টানা অনাহার, অনিদ্রা ও তৃষ্ণায় ওদের পেট-পিঠের সাথে লেগে গেছে। কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে। চিবিয়ে খাবার মতো শক্তি পর্যন্ত রহিত হয়ে গেছে। পানি পানের পর তাদের মধ্যে যে প্রাণ ফিরে

এসেছে এর ফলে খাবারগুলো চিবুতে পেরেছে তারা। সবাই খাবার গলাধঃকরণ করে যখন পানি পান করল, তখন তাদের কাছে জগতটা মনে হলো অন্য রকম। তরুণীদ্বয় হয়ে উঠেছে আরো সুন্দরী, জান্নাতী হুর যেন।

এখন তোমরা আমাদের সাথে কি আচরণ করবে? বড় তরুণীটিকে প্রশ্ন করল নাসের। কারণ জিন আর মানুষের মধ্যে কোন সমতা নেই। তোমরা আগুনের তৈরী, আমরা মাটির মানুষ। অবশ্য আমরা সবাই আল্লাহ্‌র মাখলুক। দয়া করে তোমরা আমাদেরকে তুর্কমানের পথটি দেখিয়ে দাও। ইচ্ছে করলে মুহূর্তের মধ্যে তোমরা আমাদের পৌঁছে দিতে পার তুর্কমানে।

তোমরা কি কোথাও রাতের বেলায় গুপ্ত হামলা করতে গিয়েছিলে? জিজ্ঞেস করল বড় তরুণী। সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর ঝটিকা বাহিনীও জিনের মতো। বল তোমরা কোথা থেকে কি করে এসেছো?

তরুণীর জিজ্ঞাসায় নাসের তার গোটা কার্যক্রম বলে দিল। তার ইউনিট কতো ভয়ংকরভাবে শত্রু বাহিনীর রসদপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে সবিস্তারে বলল সবই। কিভাবে তারা মরুভূমিতে পথ হারিয়ে কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে তাও বলে দিল নাসের।

মনে হয় তোমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে তোমরা সেরা, বলল তরুণী। তোমরা যে কাজ কর, তোমাদের প্রত্যেক সৈনিকই কি এ ধরনের অপারেশন করতে পারে?

না। যে কোন সৈনিক আমাদের মতো ঝটিকা অপারেশন করতে সক্ষম নয়। আমাদের তুমি সাধারণ মানুষ মনে করো না। আমাদের উস্তাদ আমাদেরকে যে কঠিন প্রশিক্ষণ দিয়েছে সাধারণ সৈনিক তা সহ্য করতে পারবে না। চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র আমাদের গতি, হরিণের মতো মরুভূমিতেও আমরা দৌড়াতে পারি। ঈগলের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আমরা। শারীরিক গঠনের দিক থেকেও আমরা অন্য সাধারণের চেয়ে ভিন্ন। বিরূপ পরিস্থিতিতেও মাথা ঠিক রেখে সঠিক কাজটি আমরা করতে পারি।

আমরা এ ব্যাপারেও প্রশিক্ষণ নিয়েছি, শত্রু এলাকায় প্রবেশ করে কিভাবে ওদের গোপন তথ্য বের করে আনা যায়। আমরা যে কোন সময় বেশ পাল্টাতে পারি, আওয়াজ বদল করতে পারি। একাধিক ভাষা জানি। প্রয়োজনে অন্ধের ভূমিকা পালন করতে পারি। ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা হলে জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ করি। গ্রেফতার হওয়া আমাদের জীবনে নেই, আমরা লড়াই করে শাহাদাত বরণ করি কিন্তু কখনও গ্রেফতার বরণ করি না।

আমরা যদি জিন না হতাম, তাহলে তোমরা আমাদের সাথে কি ব্যবহার করতে? বলল তরুণী।

আমরা মানুষরূপী পাথর। নারী সৌন্দর্য আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারে না। তোমরা মানুষ হলে যদি জানতে পারতাম যে, রাস্তা ভুলে গেছো, তাহলে আমাদের ঈমানের মতোই পবিত্র আমানত মনে করে তোমাদেরকে আমাদের দায়িত্বে নিয়ে নিতাম। বাস্তবে তো তোমরা মানুষ নও। তোমাদের মতো হুর এমন জাহান্নামে আসতে পারে না। তোমরা অবশ্যই জিন। আমার অনুরোধ, তোমরা আমাদের নিরাপত্তা দান কর!

আমরা মনুষ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত নই। বলল বড় তরুণী। আমরা জানতাম তোমরা কি করতে পার। আমরা এটা জানতাম যে, তোমরা পথ হারিয়ে ফেলেছ। তোমরা যে মরুতে পথ হারিয়েছিলে সেখান থেকে কোন মানুষ বেঁচে আসতে পারে না। কোন গোনাহ্‌গার এই মরুভূমিতে পথ হারালে সে আর পথ খুঁজে পায় না। মরু তাদের রক্ত শুষে নেয়। তপ্ত বালুকারাশি হাড় গোশ্‌ত খেয়ে ফেলে। কিন্তু তোমরা পরহেজগার। আমরা তোমাদের সাথেই ছিলাম কিন্তু তোমাদের এজন্য কষ্ট দেয়া হয়েছে যাতে কষ্টযন্ত্রণা সহ্য করে তোমাদের কু-রিপু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। মন বদ খেয়াল মুক্ত হয়। আমাদের আশংকা ছিল, আমাদের মতো সুন্দরী রমণী দেখে তোমরা বেশামাল হয়ে পড়বে।

তোমরা আমাদের সাথে সাথে রইলে কেন? জিজ্ঞেস করল নাসের।

তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন—যিনি পথভোলা মরুযাত্রীদের পথ দেখান। বলল বড় তরুণী।

তোমাদের উপর আল্লাহ্ যে দয়া করেছেন তা হিসাব করে তোমরা শেষ করতে পারবে না। তিনি আমাদের বলেছিলেন, পুরুষ মানুষ মৃত্যুমুখেও নারীলোভ সামলাতে পারে না। তোমাদের অন্তর থেকে কুপ্রবৃত্তি দূর করার জন্যই তিনি তোমাদেরকে ক্ষুধা পিপাসার দুর্ভোগে ফেলেছিলেন। অতঃপর তোমরা যখন একেবারে কষ্টের শেষ ঠিকানা স্পর্শ করেছ, তখন আমাদের নির্দেশ করেছেন, এদেরকে তোমরা আশ্রয়ে নিয়ে নাও। আমরা জানতাম, শত্রুদের কিভাবে তোমরা নাকানী চোবানী খাইয়েছো।

"তাহলে আমার কাছ থেকে আবার জিজ্ঞেস করলে কেন?" প্রশ্ন করল নাসের।

"জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা কতটুকু সত্য আর কী পরিমাণ মিথ্যা বল তা বোঝার জন্য। তোমরা সত্যবাদী।"

"মিথ্যা আমরা কখনও বলি না। বলল নাসের। জানো, রাতের ঝটিকা বাহিনী আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কাজ করে। আমরা যখন কাজ করি তখন আমাদের

পর্যবেক্ষণ করতে কোন অধিনায়ক থাকে না। আল্লাহকে হাজির নাজির মনে করে আমরা অপারেশন করি। আমরা মনের মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে নিই যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সর্বদ্রষ্টা। তিনি আমাদের সবকিছু দেখছেন। তাকে ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ নেই।... থেমে গেল নাসের। আচ্ছা তুমি কিন্তু আমার সেই প্রশ্নের জবাব দাওনি, আমাদের সাথে তোমরা কি ব্যবহার করবে?"

"আমাদের যা হুকুম করা হয়েছে, এর বরখেলাপ আমরা করতে পারি না। বলল তরুণী। আমাদের আচরণ খারাপ হবে না। আমরা দেখছি, তোমাদের মুখে কথা ফুটছে না। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে কিন্তু তদুপরি ভয়ের কারণে তোমরা ঘুমাতে পারছ না। আমি তোমাদের অভয় দিচ্ছি, কোন ভয় নেই, সাথীদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়।"

"তারপর কি হবে?" জিজ্ঞেস করল নাসের।

"আল্লাহ্র যা নির্দেশ তাই হবে। তবে পালানোর ইচ্ছা করলে এই বালির ঢিবির মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকবে। এই যে দেখছো বালির টিলাগুলো! এগুলো আসলে টিলা নয় মানুষ। অপরাধ করার কারণে এগুলোকে এভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছে। আমাদের হুকুম নেই এগুলোর প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করার। না হয় তুমি তরবারী দিয়ে আঘাত করলে এগুলো থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হতে দেখতে পেতে।"

একথা শুনে নাসের ও সাথীদের চোখ ভয়ে গোল হয়ে গেল। সবাই ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল।

"এই মরু—যমীনের জাহান্নাম। পাপিষ্ঠ লোক ছাড়া এখানে কেউ পথ হারায় না। যারা এখানকার পথভোলা মুসাফিরদের পথ দেখায়, এরা হয় হরিণের বেশ ধরে আসে, নয়তো আমাদের মতো সুন্দরী নারীর বেশ ধরে আসে। তাদের পানি পান করায়, খাবার দেয় এবং পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু জানো, মানুষ স্বভাবতই অপরাধ প্রবণ। যে হরিণ এদেরকে পথ দেখানোর জন্যে হরিণের বেশ ধরে আসে, ওরা সেটিকেই বিষাক্ত শরাঘাতে হত্যা করে খেতে চায়। আর আমাদের মতো সুন্দরী নারী দেখলে ওদের অসহায় মনে করে সম্ভ্রম লুটে নেয়, হারেমের বউ করার প্রস্তাব করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না, এসব কর্মই তাদের জন্য করুণ পরিণতি বয়ে আনবে। ওই যে সব টিলা দেখছো, সবগুলোই তোমাদের মতো পুরুষ ছিল, কিন্তু তোমাদেরকে এমন বানানো হবে না।

তোমরা শুয়ে পড়। আমাদের দেখে যদি তোমাদের মধ্যেও কোন বদখেয়াল মাথাচাড়া দিয়ে থাকে তবে সেই বদখেয়ালটিকেও ঘুম পাড়িয়ে দাও। নইলে কিন্তু তোমাদের পরিণতিও হবে ওদের মতো। যা তোমরা নিজ চোখে দেখছো। আসলে

এটা মানুষের একটা চরম দুর্বলতা যে, মানুষ যে সুখের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে সেই সুখানুভূতির জন্যে মানুষ ধ্বংস টেনে আনে, করুণ পরিণতি বরণ করে। মানুষের এই আত্মদুর্বলতা বহু জাতিকে ধ্বংস করেছে।"

তরুণীর কথা ছিল যাদুমাখা। ওদের কথা থেকে নাসের ও সাথীরা কল্পনাও করতে পারেনি এরা এই মর্তের নারী। ওদের প্রতিটি কথার মধ্যে অলৌকিকতার আলোকচ্ছটা। তরুণীর কথায় নাসের ও সাথীরা স্বপ্নালোকের ঐশী প্রেরণায় আপ্লুত। ভুলে গেল তারা নিজেদের অস্তিত্বের কথা। ধীরে ধীরে প্রত্যেকের চোখ বুজে এলো ঘুমে। এক এক করে সবাই ঘুমের মধ্যে হারিয়ে গেল। সবাই যখন ঘুমে অচেতন, তখন বড় তরুণীটি ছোট তরুণীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। আর তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস।

* * *

নাসেরের মিশন যেমন সফল হয়েছিল তার সেনাবাহিনীর মিশনও ছিল সফল। তার জানার কোন উপায় ছিল না, সুলতান আইয়ূবী কৌশলের ফাঁদে ফেলে তিন বাহিনীর কমান্ডার সাইফুদ্দীনকে কতটুকু বিপর্যয়ে ফেলেছিলেন। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে সাইফুদ্দীন সৈন্যসামন্ত ফেলে রেখেই রণাঙ্গন থেকে পালিয়েছিল। সাইফুদ্দীন পালিয়ে যাওয়ার পর আইয়ূবী সাইফুদ্দীনের চীফ কমান্ডার মোজাফফর উদ্দীনের পাল্টা আক্রমণের অপেক্ষায় ছিলেন। আইয়ূবী আশংকা করছিলেন মোজাফফর উদ্দীন যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে জবাবী হামলা করা ছাড়া ফিরে যাবে না।

আইয়ূবীর আশংকা ভিত্তিহীন ছিল না। মোজাফফর উদ্দীন ঠিকই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তিনবাহিনীর এক চতুর্থাংশের কমান্ড ছিল তার অধীনে। বাকীরা আইয়ূবী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে পালিয়ে গেল। কিন্তু মোজাফফর উদ্দীন পালালো না; কারণ তার অধীনস্থ এক চতুর্থাংশ সৈন্য ছিল রিজার্ভ। ওরা যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার আগেই সাইফুদ্দীনের কমান্ড ভেঙে যায়। তার বাহিনী শোচনীয় মার খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

আইয়ূবী তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার আলোকে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, মোজাফফর উদ্দীন অবশ্যই সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে এবং সুযোগ মতো সে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবে। ঐ ছিল আইয়ূবীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তি পাঁচটি হলেও বিশেষ ব্যক্তিদের এমন ধরনের নিরীক্ষণ ক্ষমতা থাকে যে, এর দ্বারা তারা সাধারণের চেয়ে ভিন্ন কিছু আন্দাজ করতে পারেন। আইয়ূবীর এ ধারণাও ছিল তদ্রূপ।

তিনি গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিলেন বহু দূর পর্যন্ত। সবাইকে নির্দেশ দিলেন কারো চোখে সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব অনুভূত হলেই আমাকে দ্রুত সংবাদ পৌছাবে। আইয়ূবীর সৈন্যরা ভেবেছিল, যৌথবাহিনীর কমান্ডার সাইফুদ্দীন পালিয়ে গেছে এবং যুদ্ধ পুরোপুরিই খতম। তাদের মতে শত্রুবাহিনীর আর কোন জীবিত সৈন্য খুঁজে পাওয়া যাবে না রণাঙ্গনে। হয় সবাই পালিয়ে গেছে, অন্যথায় আহত-নিহত হয়েছে।

এলাকাটি ছিল আইয়ূবীর গোয়েন্দাদের জন্যে দুর্গম। ঘন টিলা, ঝোপঝাড়, পর্বত সংকুল। যে কোন টিলার আড়ালে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে গোটা একটা বাহিনী আড়াল করে রাখা কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। আইয়ূবীর যে গোয়েন্দারা মুক্ত এলাকায় শত্রুবাহিনীর পেটের খবর বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম ছিল, তারা এই দুর্গম অঞ্চলের সব টিলা আর পর্বতের আড়াল খুঁজে দেখার অবকাশ পেল না।

মোজাফফর উদ্দীন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আড়াই মাইল দূরে একটি বড় পর্বতের আড়ালে গুহার মতো জায়গায় নিজের বাহিনীকে আড়াল করে রেখেছিল। সে তার তাঁবুতে বসে আইয়ূবীর উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল। খুব তাড়াতাড়িই চাচ্ছিল সে আইয়ূবীর উপর আঘাত হানতে। এমন সময় তার তাঁবুতে প্রবেশ করল তার আর এক ডেপুটি। ডেপুটির সাথে অন্য এক লোক।

'নতুন কোন সংবাদ আছে?' জিজ্ঞেস করল মোজাফফর উদ্দীন।

'সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর সেনাবাহিনী বহাল তবিয়তে রয়েছে।' বলল ডেপুটি। 'ও স্বচক্ষে দেখে এসেছে সবকিছু, ওর মুখ থেকেই শুনুন।'

ডেপুটির সাথের লোকটি ছিল মোজাফফর উদ্দীনের গোয়েন্দা। সে বলল, 'আইয়ূবীর সৈন্যরা আমাদের পালিয়ে যাওয়া সৈন্যদের রসদপত্রও কুড়ায়নি। শুধু আহতদের উঠিয়ে নিয়েছে। আর ওদের ও আমাদের মৃতদেরকে আলাদাভাবে দাফন করছে।'

'মৃতদের খবরের কোন দরকার নেই আমার। জীবিতরা কি করছে, ওদের সংবাদ বল।' বলল, মোজাফফর উদ্দীন। 'যারা মরে গেছে তাদেরকে দাফন তো করতেই হবে, আর সেটি তারা করবে, এটা তোমার সংগ্রহের মতো কোন সংবাদ নয়। সেটি বল, আইয়ূবী কি তার সেনাদের অবস্থানে কোন হেরফের করেছে? তার সৈন্যদের ডান বাহু কি আগের অবস্থানেই রয়েছে?'

"সম্মানিত সেনাপতি! আমি সিপাহী নই, কমান্ডার। যে সংবাদটি পরিবেশন করছি তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বুঝে-শুনে, চিন্তা-ভাবনা করে করছি। আমি আপনাকে খুশী করার জন্যে, আপনার ক্ষোভের ভয় করে কিছু বলছি না। আপনি যেমন আইয়ূবীর জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করতে চান, আমারও প্রত্যাশা

তা-ই। আপনার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, আক্রমণ-আয়োজন দ্রুত করুন তাতে অসুবিধা নেই কিন্তু তাড়াহুড়ো করবেন না। মেহেরবানী করে আমাকে বলতে দিন। আমি বলতে চাই—আপনার দৃষ্টি আইয়ূবীর ডান বাহুর দিকে। কেননা, আপনার জন্যে আইয়ূবীর ডান বাহুতে আক্রমণ শানানো সহজ হবে কিন্তু আমি তার বাম বাহুকেও পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, তার ডান বাহু আক্রান্ত হলে বাম বাহুতে অবস্থানরত সৈন্যদের সে খুব তাড়াতাড়ি টেনে এনে আঘাত প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো, সে আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে তাই-না? বলল মোজাফফর উদ্দীন। তার চাল আমি জানি। আমি এক অবস্থায় স্থির থাকব না। কখনও আমাদের সৈন্যদেরকে ছড়িয়ে দেবো, আবার কখনও সংকুচিত করবো। ওদেরকে খেলিয়ে খেলিয়ে নাস্তানাবুদ করবো আমি। তুমি যা বলবে এসব অগ্রিম আমি বলে দিতে পারি।"

"আইয়ূবী তার যে রিজার্ভ সৈন্য ব্যবহার করে আমাদের বাহিনীকে পরাজিত করেছে, ওদেরকে সে আবার পিছনের সারিতে সরিয়ে নিয়ে প্রস্তুত রেখেছে। আপনার ধারণা ঠিক, সে আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে। আমি কবরের যে কথা বলছিলাম, তা হলো, আইয়ূবীর ডান বাহু যেখানে অবস্থান নিয়েছে, ওখান থেকে এক ক্রোশ দূরে। প্রায় দেড় হাজারের মতো হবে কবরের সংখ্যা। আপনি জানেন, দেড় হাজার কবর খননে কতটুকু জায়গায় গর্ত খোড়া হয়েছে। আপনি এভাবে হামলা করবেন, যাতে আইয়ূবীর সৈন্যরা পিছনে সরে যেতে বাধ্য হয়, যাতে তারা খননকৃত কবরের কাছে চলে যায়। আপনি কি ভাবতে পারেন, ওরা যখন সওয়ারী ঘোড়াগুলো নিয়ে গর্তগুলোতে পড়তে থাকবে মৃতদেহ দাফনকৃত কবরগুলোর খোড়া মাটিতে ঘোড়ার পা তলিয়ে যাবে তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে?

আইয়ূবীর ডান বাহুতে কি পরিমাণ সৈন্য রয়েছে এবং এরা কতটুকু শক্তিশালী মনে হয় তোমার কাছে?"

"অন্তত এক হাজার অশ্বারোহী আর দেড় হাজার পদাতিক সৈন্য হবে। বলল, গোয়েন্দা কমান্ডার। এরা সম্পূর্ণ আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত। এদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করা সম্ভব নয়।"

মোজাফফর উদ্দীনের সামনে খোলা নক্শার এক জায়গায় সে হাত রেখে বলল, এখানে অবস্থান করছে শত্রু বাহিনীর ডান বাহু। আমার ধারণা, এরা অন্তত আটশ' গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদের সামনের জায়গাটা খুব উঁচু নীচু। ওদের ডানপাশটা পরিষ্কার। আক্রমণের জন্য ডানপাশটাই বেশী উপযুক্ত মনে হয় কিন্তু আক্রমণ সামনের দিক থেকেই করা উচিৎ, তাহলে এরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

"আমার আক্রমণ সামনের দিক থেকেও হবে, ডান দিক থেকেও হবে। ওদের খোড়া কবরগুলোকে ব্যবহার করব আমি। ডেপুটিকে বলল মোজাফফর। অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে কোথাও পেলে ধরে নিয়ে আসবে, এখানকার গোটা এলাকাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কোন সাধারণ লোক এ মুহূর্তে এদিকে আসবে না। গোয়েন্দা ছাড়া এদিকে আর কাউকে দেখতে পাবে না তুমি। কাজেই অজ্ঞাত লোক পেলেই তাকে গ্রেফতার করতে হবে।"

* * *

অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে দুই অভিযাত্রীর হয়তো জানা ছিল না, এই এলাকাটি যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। একজন অভিযাত্রী উটে আরোহণ করেছিল। সে ছিল বয়স্ক। দীর্ঘ ধবধবে সাদা দাড়ি। কান্তিময় চেহারা। তার উটে বোঝাই করা কিছু মালপত্র। অপর লোকটি উটের মিহার টেনে আসছিল। উভয়েই ছিল গ্রামীণ পোশাকে সজ্জিত। মোজাফফর উদ্দীনের নিয়ন্ত্রিত এলাকা অতিক্রম করছিল তারা। মোজাফফর উদ্দীনের গোয়েন্দারা জায়গায় জায়গায় ওঁৎ পেতে ছিল সুলতানের গোয়েন্দা শিকারের জন্যে। অভিযাত্রীর নজরে পড়ে গেল মোজাফফর উদ্দীনের সেনাবাহিনী। অমনি এক সৈন্য ওদের থামাতে হাঁক দিল। সেনার হাঁক শুনে ওরা চলার গতি বাড়িয়ে দিল। এক অশ্বারোহী গিয়ে অভিযাত্রীদ্বয়ের পথ আগলে দাঁড়ালে থামল তারা। সৈনিক তাদেরকে বলল, আমার সাথে চল।

"আমরা মুসাফির। তোমাদের আমরা কি ক্ষতি করলাম যে আমাদের যেতে বাঁধা দিচ্ছ? আমাদের পথ ছেড়ে দাও।"

"এ পথে যে কাউকে পাওয়া যাবে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। অতএব তোমাদের যেতে দেয়া হবে না।" অশ্বারোহী সৈনিক অভিযাত্রীদ্বয়কে তার সাথে ক্যাম্পে যেতে বাধ্য করল।

তাদেরকে একটি তাঁবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল এক কমান্ডার। কমান্ডার উভয়কে নানা কথা জিজ্ঞেস করল। তাদের জবাবে সন্দেহমুক্ত হয়ে গেল কমান্ডার। কিন্তু তাদেরকে জানানো হলো, তোমাদের যেতে দেয়া হবে না। তোমাদের বন্দী নয় মেহমান হিসেবে ক'দিন এখানেই রাখা হবে। তারা বারবার প্রশ্ন করলেও পরিষ্কারভাবে একথা বলা হয়নি ক'দিন তাদেরকে এখানে আটকে রাখা হবে। এরাই ছিল প্রথম অভিযাত্রী; যাদেরকে মোজাফফর উদ্দীনের সৈন্যরা তাদের এলাকা থেকে ধরে নজরবন্দী করে রেখেছিল। তাদের আর কোন কথাই শোনা হলো না। দু'জন সৈনিকের হাতে ওদের তুলে দিয়ে বলা হলো, ওদেরকে তোমাদের তাঁবুতে রাখবে।

যে দুই সৈনিকের তাঁবুতে অভিযাত্রীদ্বয়কে রাখা হয়েছে ওরা ঘুমিয়ে। উভয়েই নাক ডাকছে। কিন্তু বৃদ্ধের চোখে ঘুম নেই। সে যখন নিশ্চিত হলো, সৈনিক দু'জন ঘুমিয়ে অচেতন তখন সাথীকে খোঁচা দিয়ে জাগাল সে। উভয়েই হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর দরজা পর্যন্ত পৌঁছল। দরজার সামনে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে নিল বাইরের পরিস্থিতি। বাইরে কাউকে না দেখতে পেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ল দু'জন। তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে বৃদ্ধ সাথীকে বলল, তুমি আমার কাছ থেকে ভিন্ন হয়ে যাও। যেদিক থেকে পারো ক্যাম্পের সীমানা পেরিয়ে যাও।

ওরা ভেবেছিল ক্যাম্পে হয়তো সবাই ঘুমিয়ে। আসলে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করে রেখেছিল মোজাফফর উদ্দীন। ছায়ার মতো কিছু একটা নড়তে দেখে ডাক না দিয়ে অনুসরণ করল এক প্রহরী। ছায়াটি ছিল সেই বৃদ্ধ। সে প্রহরীকে দেখে লুকিয়ে পড়ল। প্রহরী এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করল জিনিসপত্রের স্তূপের মধ্যে। কিন্তু বিশাল পণ্যের ফাঁকে বৃদ্ধ লোকটি এভাবে নিজেকে আড়াল করল যে প্রহরী তাকে খুঁজে বের করতে পারল না। প্রহরী চলে যাওয়ার পর বৃদ্ধ লোকটি অন্ধকারে পা টিপে টিপে জায়গা ছেড়ে আরো সরে আসল। একইভাবে অপর এক প্রহরী বৃদ্ধের সাথীকেও দেখে ফেলল। মোজাফফর উদ্দীনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল নিশ্ছিদ্র। সে জানতো আইয়ূবীর গোয়েন্দারা খুবই পারদর্শী। এরা মাটির নীচ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এজন্য সে সেনা ক্যাম্পে রাত্রিকালীন প্রহরার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল যাতে আইয়ূবীর কাছে তার কোন তথ্য পাচার না হতে পারে বা আইয়ূবীর ঝটিকা বাহিনী তার ক্যাম্পের ক্ষতি করতে সুযোগ না পায়। নির্দেশ মতো প্রহরীরা ছিল পূর্ণ সতর্ক। অপর এক প্রহরীর দৃষ্টি পড়ল বৃদ্ধের সাথীর উপর। কিন্তু সে সন্দেহভাজনকে না ডেকে ওর পিছু নিল। বৃদ্ধের সাথীও প্রহরীর দৃষ্টি এড়াতে লুকিয়ে পড়ল। এদিকে অনুসরণকারী প্রহরীর সাথে কানামাছি খেলায় মেতেছিল বৃদ্ধ। এমতাবস্থায় বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পর এমন এক জায়গায় লুকিয়ে পড়ল যে, প্রহরী তাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ তার কোমরের খঞ্জর বের করে ফেলল, প্রহরীর খবরদারী থেকে নিষ্কৃতির জন্য সে প্রহরীকে হত্যা করবে। খঞ্জর হাতে নিয়ে প্রহরীর অবস্থান পরখ করছিল বৃদ্ধ আর ভাবছিল কোন দিক দিয়ে সে ক্যাম্পের বাইরে যেতে পারবে। ঠিক এই মুহূর্তে তার একেবারে পিছনে এসে দাঁড়াল এক লোক। বৃদ্ধ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই সেই লোকের বুকে খঞ্জর ঢুকিয়ে দিল। পরপর দুবার বিদ্ধ করল বুকে ধারাল খঞ্জর। আর্তচিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটি। বৃদ্ধ সেখান থেকে পালানোর দিক ঠিক করছিল, এমন সময় পিছন থেকে একজন তাকে ঝাপটে ধরল। বৃদ্ধ এমন তীব্র ঝটকা দিল যে, ঝাপটে ধরা লোকটি দূরে ছিটকে পড়ল। ভোঁ দৌড় দিল বৃদ্ধ ক্যাম্প থেকে

পালিয়ে যেতে। কিন্তু হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বৃদ্ধের পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে যে জিনিসটির সাথে সে হোঁচট খেয়েছিল উঠে তাকে ঝাপটে ধরল। নিরাপত্তা রক্ষীদেরই ক'জন গাছের মতো শুয়ে পড়েছিল মাটিতে সম্ভাব্য শত্রুকে ঘায়েল করতে। তাদেরই একজন বৃদ্ধকে ধরতে দৌড় লাগাল পিছে পিছে। দৌড়ে সে ধরে ফেলল বৃদ্ধকে। চিৎকার দিল তার সহযোগিতার জন্য। শত শত মশাল জ্বলে উঠল বিপদ সংকেত পেয়ে। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করেও বৃদ্ধ মুক্ত হতে পারল না বহু জনের পাকড়াও থেকে। সবাই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল, দৃশ্যত বৃদ্ধের গায়ে এতো তাকত যে, প্রশিক্ষিত অনেকজনের সাথেও সে যে শক্তির মহড়া করেছে, তা হতবাক করল তাদের। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে বৃদ্ধের সাদা দাড়ি খসে বেড়িয়ে এল কালো দাড়ি। মুখোশের আড়াল খসে বেরিয়ে এলো তাগড়া জোয়ান চেহারা। সবাইতো হতবাক। একি! এযে সেই বৃদ্ধ। কিন্তু ওকে আমরা যেমন দেখেছিলাম সেতো সে রকম নয়! খুব কৌশলে কালো দাড়ির উপরে সাদা দাড়ি প্রতিস্থাপন করে বৃদ্ধ সেজেছিল লোকটি। এবার বুঝতে কারো বাকি রইল না; এ যে পাকা গোয়েন্দার কৌশলী কাজ।

তাকে গ্রেফতার করে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল যেখানে নিহত হয়েছিল অন্য আরেকজন। দেখা গেল নিহত লোকটিও ক্যাম্পের কোন সৈনিক নয় বৃদ্ধেরই সাথী। রাতের আঁধারে শত্রুসেনা মনে করে অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই ওকে হত্যা করেছিল এই ছদ্মবেশী গোয়েন্দা। ওদের উটের মালপত্র তল্লাশী করে দেখা গেল, কোন মালপত্র নেই, সবই ধোঁকাবাজী।

তাকে ধরে নিয়ে গেল একজন সহ-অধিনায়কের তাঁবুতে। সহ-অধিনায়ক জেগে উঠল। সহ-অধিনায়ক তাকে অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করল কিন্তু তার মুখ থেকে কোন তথ্যই উদ্ধার করতে পারল না, সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করল ধৃত ব্যক্তি। তার মুখোশ দেখানো হলো অধিনায়ককে। মুখোশের ব্যাপারে পূর্ববৎ নীরব রইল সে। তাকে বলা হলো যে, তোমার এই মুখোশকে তুমি কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারবে না। তোমাকে অবশ্যই স্বীকার কতে হবে যে তুমি আইয়ূবীর সৈনিক, তোমার সহযোগীও আইয়ূবীর গোয়েন্দা। । কোন কথাই বলল না অভিযুক্ত। তাকে বহু শাস্তি দেয়া হলো। নির্যাতন করা হলো কিন্তু আইয়ূবীর সাথে সংশ্লিষ্টতার স্বীকৃতি স্বীকার করল না। রাত পেরিয়ে গেল।

সকালে মোজাফফর উদ্দীনের সামনে হাজির করা হল তাকে। বলা হল রাতের সব ঘটনা। তার নকল দাড়ি, মুখোশ ও উটের কৃত্রিম মালপত্রও রাখা হল মোজাফফর উদ্দীনের সামনে।

'আলী বিন সুফিয়ানের শিষ্য তুমি, না হাসান বিন আব্দুল্লাহ্র?' জিজ্ঞেস করল মোজাফফর।

আলী বিন সুফিয়ান আইয়ূবীর মিলিটারী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান আর হাসান বিন আব্দুল্লাহ্ তার ডিপুটি। অভিযুক্ত ব্যক্তি বলল, 'আমি এদের কাউকেই চিনি না।'

বলল মুজাফফর—তুমি না চিনলেও আমি চিনি তাদের। উস্তাদ সাগরিদকে কখনও ধোঁকা দিতে পারে না। বুঝলে?

আপনার বা আইয়ূবীর সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, আপনাদের সম্পর্কে কিছু জানার আগ্রহও নেই আমার।

"হতভাগ্য বন্ধু! শোন, অভিযুক্তের কাঁধে হাত রেখে বলল মুজাফফর। তোমার সাথে তর্কে যাবো না আমি। আমি একথাও বলবো না, তুমি অযোগ্য। তুমি নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছো। ধরা পড়ে যাওয়া সৈনিকের জীবনে কোন দূষণীয় ঘটনা নয়। তোমার দুর্ভাগ্য যে তোমার সাথী তোমার হাতেই নিহত হয়েছে। তুমি শুধু আমাকে একথা বলো যে, তোমার কোন সাথী এখানকার পরিস্থিতি অবলোকন করে আইয়ূবীর কাছে পৌঁছে গেছে কি? আর একথা বল, এ মুহূর্তে কোন কোন জায়গায় তোমাদের সৈন্য অবস্থান করছে এবং কোন দল কোথায় আছে? এসব কথার জবাব দিলে আমি কুরআনের শপথ করে বলছি—যুদ্ধ খতম হতেই তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে সম্মানের সাথেই এখানে রাখা হবে।"

"আপনার কসমের উপর আমার আস্থা নেই। কেননা কুরআনের বিশ্বাস থেকে আপনি বিচ্যুত।" বলল অভিযুক্ত।

'আমি কি মুসলমান নই?' ক্ষোভ হজম করে ধৈর্যের সাথে বলল মোজাফফর।

আপনি মুসলমান বটে কিন্তু আপনি কুরআন তো খ্রীস্টানদের সহযোগী।'

'তুমি আমাকে যে অপবাদই দাও না কেন সবই আমি সহ্য করব, যদি আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দাও তুমি। তোমার মনে রাখা উচিত; তোমার জীবন এখন আমার হাতের মুঠোয়।'

"আল্লাহ্র কাছ থেকে আপনি আমার জীবন ছিনিয়ে নিতে পারবেন না। আপনি আমাদের সেনাবাহিনীতে ছিলেন। আপনি জানেন আমাদের প্রতিটি সৈনিক জীবন আল্লাহকে সোপর্দ করেছে। আপনাকে বলে দিচ্ছি—আমি সুলতানের একজন গোয়েন্দা, আমার সাথীও গোয়েন্দা দলের সদস্য। আমি এর বেশী কিছু বলতে পারব না। জীবন্ত অবস্থায় আমার দেহ থেকে চামড়া তুলে নিলেও আমার মুখ থেকে আর কিছু শুনতে পারবেন না আপনি। একথাও আমি আপনাকে বলে দিতে পারি যে, আপনার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।'

'পায়ে রশি বেঁধে ওকে গাছের সাথে ঝুলিয়ে দাও।' একটি বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে তাঁবুতে চলে গেল মোজাফফর উদ্দীন।

* * *

'ওরা দু'জনতো এখনো ফিরে এলো না।' আইয়ূবীর সাথে বলছিল হাসান বিন আলী। ওদের তো গ্রেফতার হওয়ার আশংকা নেই। আমাদের গোয়েন্দা গ্রেফতার করতে পারে এ অঞ্চলে! এমন কে আছে, তাছাড়া বেশী দূর যাওয়ারও কথা নয় এদের।

'হয়তো ওরা গ্রেফতার হয়েছে। সকালে যাওয়ার পর বিকেল পর্যন্ত ফিরে না আসার অর্থ হলো ওরা ধরা পড়েছে। ওদের গ্রেফতার করার লোক রয়েছে এ অঞ্চলেই। আজ রাতে আরো দূর দিয়ে পর্যবেক্ষণ টিম পাঠাও।' বললেন সুলতান।

সুলতানও গোয়েন্দা বাহিনীর ডিপুটি ধৃত দুই গোয়েন্দা সম্পর্কেই কথা বলছিলেন। সুলতান আইয়ূবীর প্রধান হাতিয়ার ছিল গোয়েন্দা ব্যবস্থা। তিনি গোয়েন্দাদের অগ্রিম তথ্যের ভিত্তিতেই রণকৌশল নির্ধারণ করতেন। ফলও হতো আশাপ্রদ। কিন্তু মোজাফফর উদ্দীনের কার্যক্রম সম্পর্কে অগ্রীম তথ্য সংগ্রহে আইয়ূবীর গোয়েন্দা সূত্র ব্যর্থ হচ্ছিল। গত পরশু রাতে তুর্কমানের বিরানভূমিতে সুলতানের এক গোয়েন্দাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার পাঁজরে তীর বিদ্ধ ছিল। মোজাফফর উদ্দীন ছিল সুলতানের বাহিনীর একজন শীর্ষ কমান্ডার। সে তার অধীনস্থদের বলেছিল, আইয়ূবীর গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে যদি বেকার করে দিতে পার তবেই তোমরা আইয়ূবীর বিরুদ্ধে বিজয়ের আশা করতে পার। গোয়েন্দা তথ্য ছাড়া আইয়ূবী অচল। সে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাবে। আইয়ূবী দুই গোয়েন্দার ফিরে না আসা এবং একজনকে মৃত পাওয়ার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন। অন্যেরা এটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করলেও আইয়ূবী হাসান বিন আলীকে বললেন—তুমি জোর তৎপরতা চালাও। আরো লোক পাঠাও। নিশ্চয়ই আমাদের ধারে পাশে শত্রু অবস্থান নিয়েছে। আইয়ূবীর নির্দেশে হাসান বিন আব্দুল্লাহ্ ছয়জনের একটি বিশেষ দলকে তথ্য সংগ্রহে পাঠিয়ে দিলেন।

ভোর বেলায় 'আল্লাহু আকবারের' তাকবীর ধ্বনিতে ঘুম ভাঙল আইয়ূবীর। তিনি তাঁবুর বাইরে এলে তার একান্ত খাদেম জ্বলন্ত মশাল তার সামনে রাখল। এ সময় এক অশ্বারোহী এসে থামল আইয়ূবীর সামনে। ঘোড়া থেকে নেমে বলল, সুলতানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক। আমাদের ডানবাহুর কাছেই সৈন্যবাহিনীর আগমন বোঝা যাচ্ছে। পরিস্থিতি দেখে দু'জন খবর এনেছে। শত্রুবাহিনী আসছে।

আইয়ূবী শীর্ষ কমান্ডারদের নাম ধরে বললেন, ওদের জলদি ডাকো। সুলতান মাটিতে বসে তৈয়াম্মুম করলেন। পানি আনিয়ে অযু করার সময় নেই। জায়নামায

ছাড়াই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন। নামাযান্তে খুবই সংক্ষিপ্ত দু'আ শেষ করে তার ঘোড়া নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন।

'মোজাফফর উদ্দীন ছাড়া এ লস্কর আর কারো নয়।' অধিনায়কদের উদ্দেশ্যে বললেন আইয়ূবী। আমি নিশ্চিত খ্রীস্টান বাহিনীর সৈন্য নয় এরা। খ্রীস্টানদের অভিযানের ধরণ এমন নয়। যদি এ সংবাদ সঠিক হয় যে, দুশমন আমাদের ডান বাহুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তবে খেয়াল রাখবে দৃশ্যতঃ দুশমন ডান বাহুতে আত্মপ্রকাশ করলেও হামলা হবে উভয় বাহুতে। উভয় দিকে দুশমনদের প্রতিরোধ করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আমাদের কোন বাহিনী যেন পশ্চাৎপসরণ না করে। পিছনে খননকৃত দেড় হাজার কবর আমাদের সৈন্যদের জন্যে মৃত্যুফাঁদে পরিণত হবে।

সুলতান আইয়ূবী অশ্বারোহণ করলেন। তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর চৌকস বারোজন তার অনুগামী হল। আট দশজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীকেও তিনি সাথে নিলেন পয়গাম বহনের জন্য। আরো সাথে নিলেন দু'জন অধিনায়ক। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন তিনি। একটি উঁচু টিলার উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। যেখান থেকে তার ডান বাহুর সৈন্য ও সামনের গোটা এলাকা দৃশ্যমান হয়। তখন ভোরের আঁধার কেটে যাচ্ছে প্রায়। এমন সময় তিনি ডান বাহুর কমান্ডারদের ডেকে নির্দেশ দিলেন, অশ্বারোহীদেরকে সওয়ার করে দাও এবং পদাতিক ইউনিটের তীরন্দাজদের অগ্রসর হয়ে গুহা, গর্ত ও পাহাড়ের ঢালে মরিচাবন্দী হতে নির্দেশ করো।

এখন থেকে ডানবাহুর চীফ কমান্ড থাকবে আমার হাতে। প্রত্যেক অধিনায়ক ও কমান্ডার সংবাদবাহীদের সাথে রাখো। সব সময় আমার সাথে যোগাযোগ রাখবে। আমার সর্বশেষ নির্দেশ পালনে তৎপর থাকবে।

আইয়ূবীর সামরিক ট্রেনিং-এ দ্রুত স্থান বদলের কৌশলকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হতো। রণাঙ্গনে তাঁর যে কোন নির্দেশ অভাবনীয় দ্রুততার সাথে পালিত হতো। মোজাফফর উদ্দীনের বাহিনীর দৃষ্টিসীমায় আসার আগেই আইয়ূবী তাঁর বাহিনীকে তৈরী করে ফেললেন।

* * *

অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে আক্রমণ করল মুজাফফর। যখনই মুজাফফরের অশ্বারোহী বাহিনী সুলতানের অশ্বারোহী বাহিনীর মুখোমুখি হলো, অমনি টিলার গর্তে, পাহাড়ের ঢালুতে লুকিয়ে থাকা তীরন্দাজেরা তীর বৃষ্টি শুরু করে দিল। তীরের আঘাতে শত্রুবাহিনীর ঘোড়া লুটিয়ে পড়তে লাগল, আহত ঘোড়াগুলো এদিক সেদিক দৌড়াতে শুরু করল। অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিরোধের মুখে হতভম্ব হয়ে

গেল মোজাফফরের অশ্বারোহীরা। মুজাফফরের কাছে হঠাৎ আক্রমণের মুখে পতিত হওয়া বিস্ময়কর ঘটনা ছিল না। কিন্তু সে ভেবেছিল যে, সুলতানের অজ্ঞাতে ইচ্ছে মতো সুবিধাজনক জায়গায় সুলতানকে লড়াবে সে। সে আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। ধারণাতীতভাবে সুলতানের প্রতিরোধের মুখে পড়ে গেল মুজাফফর। সুলতানের বহু তীরন্দাজ এ আক্রমণে হতাহত হলো কিন্তু এই লোকসানের বিনিময়ে তিনি স্বস্তি লাভ করলেন। মুজাফফরের আক্রমণের তীব্রতা কমে এলো। প্রতিপক্ষের অশ্বারোহীরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও জনবল হারাল।

এখন আইয়ূবী স্বাধীনভাবেই তাঁর রণকৌশল বাস্তবায়নের সুযোগ পেলেন। মোজাফফর উদ্দীনের একটি অশ্বারোহী দল বহু সংখ্যক সাথীর লাশ ফেলে এগিয়ে এলো, সামনেই ছিলেন সুলতান নিজে। তিনি আক্রমণকারীদের আগমন দেখে তার বাহিনীকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। আক্রমণকারীরা যখন একেবারেই কাছে চলে এলো, তখন সুলতানের বাম বাহুর অশ্বারোহী বাহিনী নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করে আরো বামে চলে গেল। অনুরূপ ডানের অশ্বারোহীরাও আরো ডানে সরে পড়ল। প্রতিপক্ষের মুখোমুখি না হয়ে খালি ময়দানে এগিয়ে গেল অধিকাংশ শত্রু সৈন্য। কিছু সৈনিক ডানে বামে মোড় নিয়ে সুলতানের বাহিনীর মুখোমুখি হল। এবার সুলতানের বাহিনী উভয় দিক থেকে শত্রুসেনাদের দুই বাহুতে আক্রমণ করল। তাদের কোন আঘাত আর ব্যর্থ হলো না। প্রতিটি আঘাতেই শত্রুসেনা পড়তে লাগল। শত্রুবাহিনীর মূল অংশটি সোজা সামনে এগিয়ে যাওয়ায় তাদের দুই বাহুর সাহায্যে এগিয়ে আসার সুযোগ রইল না। ওদের জন্যে এখন একটাই পথ সামনের ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। সামনের ফাঁকা জায়গাটুকুতেই ছিল সদ্যখননকৃত দেড় হাজার কবর। ওরা সেই কবরের উপর দিয়েই যেতে লাগল।

মুজাফফর ভড়কে যাওয়ার পাত্র নয়। সে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী পাঠিয়ে অবস্থা বুঝে নিতে চাচ্ছিল। যখন দেখল অগ্রগামী দল সুবিধা করতে পারেনি, সাথে সাথে পঙ্গপালের মতো দ্বিতীয় দলকে পাঠালো। ওরা এমন গতিতে এসে সুলতানের বাহিনীর পিছনে আক্রমণ করল যখন সুলতানের বাহিনী শত্রুবাহিনীকে কবরে তাড়া করে নিজেরা কবর থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়েছে মাত্র। পিছন থেকে এসে তাদের উপর হামলে পড়ল মুজাফফরের দ্বিতীয় অশ্বারোহী ইউনিট। সুলতানের অশ্বারোহীরা ঘোড়া ঘুরিয়ে ওদের মোকাবেলার অবকাশই পেলো না। প্রতিপক্ষের তাড়া খেয়ে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী কবরে নিপতিত হতে লাগল। ওদিকে বাম বাহুতেও একই সাথে আক্রমণ করে বসল মুজাফফর বাহিনী।

আইয়ূবীর জন্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি হয়ে উঠল খুব সঙ্গীন। তিনি দূতদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, রিজার্ভ বাহিনীকে বলো পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে।

ডানবাহুকে সুলতান যেভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন তা তেমন কোন কাজে আসলো না। কারণ, মোজাফফর উদ্দীন সুলতানের চালকে রোধ করে দিচ্ছিল তারই কৌশলে। মোজাফফর উদ্দীনের দুর্বলতা এতটুকুই ছিল যে, তার সাহায্যকারী সৈন্যবলের ঘাটতি ছিল। সুলতান দূতদের মাধ্যমে ডানবাহুকে বিক্ষিপ্ত হতে নির্দেশ দিলেন। তার রিজার্ভ বাহিনীর পশ্চাতের আক্রমণে মোজাফফর উদ্দীনের রক্ষণভাগ খালি হয়ে গেল। তার নিজের নিরাপত্তাই হুমকির মুখোমুখি হল কিন্তু সে তখনও পালানোর চিন্তা করল না। অটল অবিচল থেকে মরণপণ লড়াই শুরু করল। দিনের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লড়াই এমন তীব্র আকার ধারণ করল যে, উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা জীবিতদের চেয়ে বেড়ে গেল। যুদ্ধে মোজাফফর উদ্দীন এমন কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, আইয়ূবী বারবার চাল বদলাতে বাধ্য হচ্ছিলেন। সুলতান আইয়ূবী বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মোজাফফর উদ্দীনের মতো ব্যক্তিই পারে এমন কঠিন মোকাবেলা করতে। শেষ পর্যন্ত উস্তাদের আখেরী চালে যদিও মোজাফফর উদ্দীন পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু আইয়ূবীকে সেদিন স্মরণীয় প্রতিপক্ষের মুখোমুখি ঘামঝরা লড়াইয়ে বহু প্রাণের বিনিময়ে বিজয়ের মুখ দেখতে হয়েছিল।

একেবারে শেষ প্রান্তে এসে আইয়ূবী সুইসাইড স্কোয়াড ব্যবহার করলেন। ওরা জীবনপণ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবার মোজাফফর উদ্দীনের রক্ষণভাগ ভেঙে পড়ল, সে রণে ভঙ্গ দেয়াকেই ভাল মনে করে পশ্চাৎপসারণ করল। বহু সংখ্যক শত্রু সৈন্য গ্রেফতার হলো সুলতানের হাতে। বন্দীদের অন্যতম ছিল মোজাফফর উদ্দীনের উপদেষ্ট ফখরুদ্দীন। ফখরুদ্দীন ছিল সাইফুদ্দীনের উজীর। সাইফুদ্দীনের পরাজয়ের পর সে আশ্রয় নিয়েছিল মোজাফফর উদ্দীনের কাছে। তাকে প্ররোচিত করেছিল সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

সময়টা ছিল ১১৭৬ সালের পয়লা এপ্রিল। মোজাফফর উদ্দীনের পরাজয়ে আইয়ূবীর জ্ঞাতি শত্রুদের কোমড় ভেঙে গিয়েছিল বটে কিন্তু এ বিজয়ের মূল্য এতো বিপুল রক্ত ও জীবন সম্পদ দিয়ে দিতে হয়েছিল যে, দু'মাসের আগে আইয়ূবী তুর্কমান ত্যাগ করতে পারলেন না।

আইয়ূবীর ডানবাহুর অধিকাংশ সৈন্য আহত ও নিহত হয়েছিল। তার প্রধান শক্তিই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেকে পঙ্গু ভাবতে শুরু করেন। খুব তাড়াতাড়ি বাহিনীকে সচল করতে নতুন সৈন্য রিক্রুট করার ঘোষণা দেন। দলে দলে মুসলমান যুবকেরা তার সৈন্যদলে যোগ দিচ্ছিল। এদের বুনিয়াদি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা তিনি তুর্কমানের ময়দানেই শুরু করেন। সৈন্যক্ষয় বিপুল হওয়ায় তিনি দামেশক ও মিশরে দ্রুত দূত পাঠালেন রসদ সামগ্রী পাঠানোর জন্যে। অপরদিকে

সামান্য একটু অগ্রসর হলেই জ্ঞাতি শত্রুদের খতম বা পরাজিত করে তিনি মৌসুল, হিরন, আলেপ্পো নিজের অধীনে নিয়ে ফিলিস্তিনের পথ পরিষ্কার করতে পারতেন কিন্তু তার সেনাদের অবস্থা মোটেও অগ্রসর হওয়ার মতো ছিল না।

"এটা আমার বিজয় নয়, এ বিজয় খ্রীস্টানদের।" কমান্ডারদের উদ্দেশ্যে বিজয়ের পর বলেছিলেন আইয়ূবী। খ্রীস্টানরা চাচ্ছিল আমরা পরস্পর যুদ্ধ করে দুর্বল হয়ে পড়ি; তাদের সে আশা পূরণ হয়েছে। ওরা আমার ফিলিস্তিন অভিযান বিলম্বিত করতে পেরেছে। এই সুযোগে ওরা ফিলিস্তিনের জবর দখল আরো মজবুত করতে পারবে। হায়! স্বজাতি ভাইয়েরা যদি বুঝতো যে, বেঈমানেরা আমাদের কখনও বন্ধু হতে পারে না, ওরা বন্ধুরূপী দুশমন। ওরা আমাদের ক্ষতি ছাড়া কল্যাণ ভাবতেই পারে না। জানিনা, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করে, কারণ আমরা ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে অপরিমেয় জীবন ও সম্পদ বিনষ্ট করে যাচ্ছি।"

আইয়ূবী ঘূর্ণাক্ষরেও জানতেন না, জ্ঞাতি শত্রু পরাজিত করে স্বস্তি লাভ করলেও তাকে হত্যা করে মুসলিম শক্তিকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার নীলনক্সা একই সময়ে চূড়ান্ত হয়ে গেছে ঈসিয়াত দুর্গে। সেখানে তার তৃতীয় শত্রু গোমশ্‌তগীন হাশিশীনের দলপতি শেখ সিনানের সাথে বসে চুক্তি করে ফেলেছিল। শেখ সিনান খ্রীস্টানদের দেয়া দুর্গে গড়ে তুলেছিল পেশাদার খুনীদের এক বিশাল শক্তি। তা ছাড়া তার নিজস্ব শক্তিশালী সেনা বাহিনীও ছিল দুর্গের অভ্যন্তরে। বিপুল ধন-সম্পদও মজবুত দুর্গের অভ্যন্তরে এই হাশীশ দলপতি গড়ে তুলেছিল স্বতন্ত্র এক মুসলিম বিদ্বেষী রাজত্ব।

ঈসিয়াত ও তুর্কমানের মধ্যবর্তী যে মরুভূমিতে আইয়ূবীর চার গোয়েন্দা সদস্য পথ হারিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল, ওরা দুই তরুণীর দেয়া খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেলা যখন প্রায় ডুবুডুবু তখন চোখ মেলল দলপতি নাসের। ঘুম থেকে জেগে উঠে বসল সে। তরুণী দু'জন তখনও জাগ্রত, বসে বসে ওদেরকেই পর্যবেক্ষণ করছে। তরুণীদের দেখে পুনরায় ভড়কে গেল নাসের। যদিও বড় তরুণীটি তাদের সাথে যে ব্যবহার করেছিল তাতে বিপদের তেমন আশংকা ছিল না কিন্তু ওদেরকে জিন ভেবে পুরোপুরি আশ্বস্থ হতে পারছিল না নাসের। তার মধ্যে পুনরায় জিনের শক্তিমত্তার কল্পিতরূপ ভেসে উঠল।

* * *

'ওদের জাগিয়ে দাও।' বলল বড় তরুণী। 'আমাদের অনেক পথ যেতে হবে।'

'আমাদেরকে কি পথে ফেলে চলে যাবে?' জিজ্ঞেস করল নাসের।

'তোমরা আমাদের সাথেই যাবে।' আমাদের ছাড়া তোমরা যেতে পারবে না।' বলল বড় তরুণী।

সাথীদের জাগাল নাসের। ছোট তরুণীকে কি যেন বলল বড় তরুণী। সে ঘোড়ার পিঠে বাঁধা পুটলী থেকে একটি পুটলীর মতো নিয়ে এলো। মশক খুলে সেখানে ঢেলে দিল পুটলীর বস্তু। কিছুক্ষণ নাড়িয়ে মশকটি বাড়িয়ে দিল বড় তরুণী নাসেরের দিকে। বলল, এই পানিটুকু সবাই মিলে পান করে নাও। পথে হয়তো আর পানি পাওয়া যাবে না।

নাসের ও সাথীরা সাগ্রহে পান করল পানিটুকু। ওদেরকে আবারো কিছু আহার দিল বড় তরুণী। সেই খাবারও খেয়ে নিল নাসের ও তার সাথীরা। কিছুক্ষণ পর মশক ও পুটলী ঘোড়ার পিঠে রাখল তরুণী। তখন সূর্য ডুবে গেছে প্রায়।

'হু, তোমরা এ জায়গাটিকে বলছো, জাহান্নাম। আমি তো এখানে সবুজ আর সবুজ দেখছি। এতো অল্প সময়ে এখানে আমাদের তোমরা কিভাবে নিয়ে এলে?' উচ্চকণ্ঠে বলল নাসের। নাসেরের সাথীরাও অবাক বিস্ময়ে দেখছিল চতুর্দিক।

'তোমরাও কি সবুজের সমারোহ দেখতে পাচ্ছো?' নাসেরের সহযোদ্ধাদের জিজ্ঞেস করল তরুণী।

'আরে! আমরা তো বসেই আছি সবুজ ঘাসের উপর।' বলল অপর একজন।

'আচ্ছা, তোমরা আমাদের হত্যা করবে না তো? জিজ্ঞেস করল অপর একজন। কারণ তোমরা তো জিন।'

'না, তোমাদের হত্যা করব কেন? এর চেয়েও আরো সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাবো তোমাদের।'

বড় তরুণী নাসের ও তার এক সাথীকে তার দু'পাশে বসিয়ে দু'জনের কাঁধে দু'হাত প্রসারিত করে বলল, আমার চোখের দিকে তাকাও। অপর তরুণীও বাকী দুইজনকে একই রূপে নিজের পাশে বসিয়ে দুহাত ওদের কাঁধে দিয়ে চোখে চোখ রাখতে বলল। দুর্ধর্ষ এই চার গোয়েন্দার কানে গুঞ্জরিত হল বড় তরুণীর কণ্ঠ––"এটাই তোমাদের বেহেশত। দেখো, সুন্দর ফুলের বাগান, সবুজের সমারোহ। তাজা ফুলের সুবাস নাও। দেখো, বাগানে কতো সুন্দর পাখি উড়ছে। এটা তোমাদের পুরস্কার। তোমাদের পায়ের নীচে মখমলের গালিচার মতো নরম কোমল তাজা ঘাস। দেখো! কতো সুন্দর ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে, স্ফটিক স্বচ্ছ ঝর্ণার পানি দারুণ মিষ্টি ।'

তরুণীর যাদুমাখা কথা চার যোদ্ধার দেহমনকে স্বপ্নিল জগতে ভাসিয়ে দিল। তারা বাস্তবতা ভুলে সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতে হারিয়ে দিল নিজেদের। হাসান বিন

আব্দুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের পর নাসের বলেছিল, "তরুণীদ্বয় যখন ওদের চোখে চোখ রাখতে বলল আমাদের, আমরা সবাই ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বড় তরুণী বলতে লাগল কাল্পনিক দৃশ্য। আর আমরা বাস্তবতা ভুলে তলিয়ে গেলাম স্বপ্নিল জগতে। ওদের রেশমী চুলগুলোকে মনে হচ্ছিল সদ্যফোটা ফুলভর্তি লতাগুল্ম। ওদের চোখ দুটোই ছিল প্রবাহিত ঝর্ণা। মনে হচ্ছিল আমরা বসে আছি কার্পেটের মতো ঘন ঘাসের উপর। চতুর্দিকে সবুজ আর সবুজ। সুদৃশ্য বাগান। বাগানে পাখ-পাখালীর উড়াউড়ি কিচির-মিচির, কল-কাকলী। সত্যিই সেই স্বপ্নিল দৃশ্য যে কতো সুন্দর ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

* * *

হাঁটছিল ওরা। হাঁটছিল যেন মখমলের মতো তাজা ঘাসের উপর দিয়ে। অথচ ওখানে ছিল না ঘাসের কোন চিহ্ন, সবুজের অস্তিত্ব। তবুও ওদের কাছে মনে হচ্ছিল; ওরা হেঁটে যাচ্ছে ঘন সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে দারুন সুন্দর বাগানের ভিতরে। অথচ বাস্তবে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল রুক্ষ কঠিন বালিয়াড়ী আর শুষ্ক যমীন পেরিয়ে। ওরা চারজন যাচ্ছিল আগে আগে হেঁটে, আর তরুণীদ্বয় ওদের পিছনে আসছিল অশ্বারোহণ করে। তাদের প্রত্যাশা ছিল সুলতান আইয়ূবীর ছাউনীতে তুর্কমানে পৌঁছা কিন্তু তারা অগ্রসর হচ্ছিল সম্পূর্ণ উল্টো দিকে, হাশীশ সম্রাট শেখ সিনানের দুর্গে। আসলে তাদের তখন কোন বোধ ছিল না, নেশাদ্রব্য খাইয়ে বোধশক্তি লোপ করে ফেলেছিল দুই তরুণী। তারা অবোধের মতো ওদের নির্দেশ মেনে অগ্রসর হচ্ছিল বন্দীশালার দিকে।

তাদের পিছনে দুই তরুণী ওদের মিশন ও সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে কথা বলছিল কিন্তু ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিল না এরা। এমতাবস্থায় সূর্য ডুবে সন্ধ্যা নেমে এলো।

'তুমি বললে রাত কোথাও থামবে না। এরা কি সারা রাত চলতে পারবে?' বড় তরুণীকে জিজ্ঞেস করল ওর সাথী।

'পানিতে যে পরিমাণ হাশীশ তুমি ওদের গিলিয়েছো, এর প্রভাব আগামীকাল সকাল পর্যন্ত থাকবে। আর আমি যা খাইয়েছি তা তো দেখলেই। ওদের ব্যাপারে নিঃশঙ্ক থাকতে পারো তুমি। আগামী দিনে বেলা উঠার আগেই আমরা ঈসিয়াত দুর্গে পৌঁছে যাব।'

'ওদের দেখে আমি তো ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। বলল ছোট তরুণী। সত্যিই যাদু জান তুমি। যেভাবে জিনের কথা বলে ওদের কাবু করলে, তা দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। মুসলমানরা কি জিনকে খুব বিশ্বাস করে?'

"জিন-ভূত কিছুই না। এসব বুদ্ধির খেলা। আমি ওদের বোধকে কব্জা করেছি। ওদের দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওরা আইয়ূবীর সৈনিক। ওদের চেহারা দেখে আন্দাজ করতেও আমার কষ্ট হয়নি, পথ হারিয়ে মরিয়া হয়ে পড়েছে ওরা। ওদের দৃষ্টিই আমাকে বলছিল, আমাদের চেয়ে ওরা বেশী ভয় পেয়েছে বিজন প্রান্তরে আমাদেরকে দেখে। ওদের দেখে যদি আমরা ভয়ে অবলা নারীদের মতো ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করতাম, তাহলে ওরা আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করতো; তা তুমি সারা জীবনেও ভুলতে পারতে না। এমন বিজন মরুতে আমাদের মতো তরুণী বাগে পেলে কোন পুরুষই কন্যা, ভগ্নির মতো সসম্মানে মাথায় রাখবে না। ওদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং জিন সম্পর্কে ওদের ভৌতিক বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েছি আমি। জিন সম্পর্কে ওদের ভৌতিক বিশ্বাস সম্পর্কে আমি জানতাম। সেই সুবাদে নিজেকে জিন বানিয়ে ফেললাম। এমন মরু বিয়াবানে আমাদের মতো সুন্দরী মেয়েদের অস্তিত্ব এরা বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমাদেরকে দেখে ওরা কল্পনা মনে করছিল অথবা ভাবছিল আমরা জিন-পরি। আমি ওদের সাথে এমনভাবেই কথা বলেছি যে, ওরা আমাদেরকে জিন মনে করেছে। ভাই! তুমি এখনও অনেক কাঁচা। আরো অনেক কিছু শেখার আছে এ পথে। দেখনি, সাইফুদ্দীনের মতো সিংহকে আমি আঙ্গুলের ইশারায় নাচিয়ে ছেড়েছি, আর ওরাতো সাধারণ সৈনিক।"

'বুঝতে পারছি না, এ বিদ্যায় আমি সফল হতে পারছি না কেন? বলল ছোট তরুণী। আমি চেষ্টা করি সবকিছু আত্মস্থ করতে, কিন্তু মন সায় দেয় না। মনে হয় এসব ধোঁকা-প্রতারণা। বিবেক এসবের প্রতি আমার মনে ঘৃণার উদ্রেক করে।'

"হু, বুঝেছি। পেশায় উন্নতি করতে ব্যর্থ হলে তোমাকে এসব পুরুষের হাতে খেলনা হয়েই থাকতে হবে। বলল বড় তরুণী। এবারই প্রথম তোমাকে বাইরে পাঠানো হয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি চালে ব্যর্থ হচ্ছো। তোমার দ্বারা ক্রুশের কোন কাজ হবে না। শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে অল্পতেই বুড়িয়ে যাবে তুমি। শরীরের আকর্ষণ শেষ হয়ে গেলে এসব পুরুষ তোমাকে পুরনো কাপড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিবে। মুসলমান কাপুরুষগুলোর মনোরঞ্জনের উপাদান হওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য হলো ওদের চিন্তা ও দেমাগের নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। এ চার যোদ্ধাকে তুমি দেখেছো, কিভাবে কথার মায়াজালে ওদের দুর্বলতার ফাঁক দিয়ে আমি কাবু করে ফেলেছি। এসব কৌশল আমাকে ইহুদী ও খৃস্টান প্রশিক্ষকরা শিখিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই আবেগপ্রবণ। আবেগের কাছে প্রত্যেক মানুষই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়; যদি না আবেগকে সে কঠিন সাধনার দ্বারা বাগে আনতে পারো। আমরা মুসলমানদের মধ্যে মানবিক আবেগ ও

কাম-রিপুকে উস্কে দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে ফেলি। কাম-রিপু মানুষকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করে। তোমার কি সেই রাতের কথা মনে নেই? সাইফুদ্দীন এক জেনারেলের সাথে বলছিল, 'আমাকে আইয়ূবীর সাথে সন্ধিচুক্তির ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে দাও।' আমি কিভাবে তাকে সন্ধিচুক্তি থেকে বিরত রেখেছি।"

"ঈসিয়াত দুর্গে পৌঁছে এই কৌশলগুলো আমাকে শিখিয়ে দিও। বলল ছোট তরুণী। আমার মনের মধ্যে এসব কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়ছেই বাড়ছে। আমি ওইসব মুসলমান উমারাদের খেলনার পুতুলে পরিণত হয়েছি অথচ তুমি নিজেকে ওদের আগ্রাসী ক্ষুধা থেকে মুক্ত রাখতে পারছো। মাঝে মধ্যে আমার ইচ্ছে হয় কোথাও পালিয়ে যাই, কিন্তু পালানোর কোন জায়গাই দেখি না।"

"সবকিছুই শিখতে পারবে। ধীরে ধীরে সবই রপ্ত হয়ে যাবে। চিন্তা করো না। আমার সাথে তোমাকে পাঠানো হয়েছে প্রশিক্ষণের জন্যই। কর্মক্ষেত্রে কতোটা তুমি পারদর্শিতা অর্জন করেছো তা দেখার জন্যে। এই মিশনে তোমার দুর্বলতাগুলো আমি দেখেছি, এসব দূর হয়ে যাবে।"

নাসের ও সাথীরা গুনগুনিয়ে একটি কোরাস গেয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। বালু, পাথুরে যমীন, শুষ্ক মরু সবই তাদের কাছে মনে হচ্ছিল সবুজ ঘাসের গালিচা। তরুণী দু'জন তাদের ঘোড়া এদের সামনে নিয়ে এলো যাতে এরা পথ ছেড়ে অন্যদিকে চলে না যায়।

"এদেরকে তো ভিন্ন পথে রওয়ানা করিয়ে দেয়া দরকার ছিল। ঈসিয়াত দুর্গে নিয়ে গিয়ে এদের কি করবে", জিজ্ঞেস করল ছোট তরুণী।

'আমার উস্তাদ শেখ সিনাদের জন্যে এদের চেয়ে উৎকৃষ্ট উপঢৌকন আর হতে পারে না।' বলল বড় তরুণী।

"এরা আইয়ূবীর ঝটিকা বাহিনীর সদস্য; সেই সাথে পরীক্ষিত দক্ষ গোয়েন্দা। আমাকে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল আইয়ূবীর কোন একজন গোয়েন্দাকে যদি বাগে আনতে পার তাহলে বুঝবো; তুমি অন্তত এক হাজার সৈনিককে বেকার করে দিয়েছো। আইয়ূবী তার গোয়েন্দা ও ঝটিকা বাহিনীকে এমন উঁচু মানের ট্রেনিং দিয়ে রেখেছে যে, প্রত্যেক গোয়েন্দা সদস্য একজন সাধারণ সৈনিকের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। শারিরীকভাবে প্রত্যেক গোয়েন্দা সাধারণ সৈনিকের চেয়েও অনেক বেশী কষ্ট সহিষ্ণু, শারিরীক শক্তির অধিকারী এবং স্বীয় কর্তব্য পালন ও লক্ষ্য অর্জনে মরিয়া হয়ে থাকে। এরা রাতের আঁধারে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে, মরুভূমিতে পথ হারিয়ে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি অবসাদের যে দুর্ভোগ সহ্য করেছে, আমাদের সৈন্যদের মধ্যে এ সহিষ্ণুতা নেই। এদেরকে আমি শেখ সিনানের হাতে

সোপর্দ করে দেবো। এদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাহস যদি আমাদের যোদ্ধারাও আত্মস্থ করতে পারে তবে খুবই উপকার হবে। তোমার মনে হয় জানা নেই, আইয়ূবীকে হত্যা করার জন্যে এ পর্যন্ত কয়েকটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যর্থ হয়েছে। এরা আইয়ূবীর বিশ্বস্ত কর্মী। এদের পক্ষে এনে আইয়ূবী পর্যন্ত পৌঁছা সহজ হবে।"

'সাইফুদ্দীন গোমশ্‌তগীন ও অন্যান্যদের হাত করতে যে কৌশল নেয়া হয়েছে, তা কি সালাউদ্দীন আইয়ূবীর বেলায় প্রয়োগ করা যায় না?' বলল ছোট তরুণী।

"না। ওদের বেলায় যে কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে তা দিয়ে আইয়ূবীকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়। বলল বড় তরুণী। যে ব্যক্তি কোন পবিত্র আদর্শের প্রতি নিজের মন-মস্তিষ্ক, দেহ-আত্মা সম্পূর্ণ নিবেদন করে, যার মধ্যে জাগতিক ও দৈহিক ভোগ-লিপ্সার চর্চা নেই, তাকে আমাদের মতো সুন্দরী আর দিনারের পাহাড় দিয়ে আদর্শচ্যুত করা যায় না। আইয়ূবী এক পত্নীতে বিশ্বাসী। নূর উদ্দীন জঙ্গীর মধ্যেও এই প্রবণতা ছিল। লোকটি এতো বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পরও মৃত্যু পর্যন্ত এক পত্নীতে জীবন কাটিয়েছে। বহু চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোন সুন্দরী তরুণীই আইয়ূবীকে বাগে আনতে পারেনি। ফিলিস্তিনে খৃস্টান নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার এখন একমাত্র পন্থাই হচ্ছে আইয়ূবীকে হত্যা করা।"

"যে পুরুষ এক পত্নীতে বিশ্বাসী এবং জীবনভর এক পত্নীর অনুগত থাকে, এসব মানুষ আমার খুব ভাল লাগে। খৃস্ট ধর্মের অনুসারী হওয়ার পরও আমার ইচ্ছে হয় যদি কোন মানুষকে প্রেমে আবদ্ধ করতে পারতাম, সে যদি আমার ভালবাসায় মুগ্ধ ও আমার অনুগত হতো তবে আমি তাকে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতাম।" বলল ছোট তরুণী।

"এসব আবেগ সিঁকেয় তুলে রাখ। ধমকের সুরে বলল বড় তরুণী। এসব ভুলে যে পবিত্র মিশনে এসেছো সেটি মাথায় রাখো। ভুলে যেয়ো না, তুমি ক্রুশ হাতে নিয়ে শপথ করেছো, যতো দিন জীবিত থাকবে ক্রুশের জন্যে নিজেকে উৎসর্গীত রাখবে। জানি, মানুষের মধ্যে আবেগ আছে, আমাদেরকে আদর্শের প্রয়োজনে আবেগ পরিহার করতে হবে। ক্রুশ আমাদের এতটুকু ত্যাগ দাবী করে।"

তরুণীদ্বয় কাফেলার আগে আগে যাচ্ছিল। নাসের ও সাথীরা একই কোরাস গুনগুনিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল নির্বিকার চিত্তে। যতোই রাত বাড়তে লাগল, ততই নিকটবর্তী হয়ে আসল তাদের নতুন ঠিকানা।

* * *

এই তরুণী দুটি কে? কি এদের পরিচয়। এ পর্যায়ে এদের পরিচয় জেনে নেয়া দরকার। খৃস্টান ও ইহুদী লোকেরা অতি শৈশবেই সুদর্শন মেয়ে শিশুদেরকে ধর্মের কাজে উৎসর্গ করাকে পুণ্যের কাজ মনে করে। ইহুদী-খৃস্টান পণ্ডিতেরা এদেরকে গীর্জার অধীনে নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বৃত্তি এবং শাসকদের আদর্শচ্যুত করতে ব্যবহার করে। এদেরকে শৈশব থেকেই শিক্ষা দেয়া হয়, কিভাবে পুরুষদেরকে হাত করে তার ভিতর থেকে পরিকল্পনাগুলো বের করে আনা যায়। দৈহিক ও মানসিকভাবে এরা যে কোন পুরুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। ইহুদীরাই মেয়ে-শিশুদের বেশী উৎসর্গ করতো একাজে। অনেক সময় মুসলিম কাফেলা আক্রমণ করে শিশুদের অপহরণ করে ওদেরকে কৌশলে প্রয়োগ করা হতো এসব কাজে। ইহুদী-খৃস্টানদের এ ধারা বহু পুরানো এবং আজো এর প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে।

এই দুটি মেয়ে খৃস্টানরা উপহার দিয়েছিল মৌসুলের গভর্নর সাইফুদ্দীনকে। মুসলিম মেয়েদের মধ্যে তখন এতোটা সৌন্দর্য চর্চা, ফিগার সচেতনতা ও যাদুকরী কথা বলার ঢং ও নাচ গানের চর্চা ছিল না। কিন্তু এই দুই তরুণী যেমন সুন্দরী, নাচে-গানে বাগ্মীতা ও রূপ ঢংয়ে যে কোন পুরুষের পৌরুষকে প্রথম দর্শনেই নাড়া দেয়ার মতো আকর্ষণীয়। এদেরকে পাঠানো হয়েছিল সুনির্দিষ্ট মিশনের দায়িত্ব দিয়ে। সাইফুদ্দীন যেমন ছিল ক্ষমতা লিপ্সু, তেমনই নারী লোভী। আইয়ূবীর সাথে তার ছিল চির বৈরিতা। নূর উদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুতে গভর্নর থেকে নিজেকে স্বাধীন আমীর ঘোষণা করে ক্ষমতার মোহে আইয়ূবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সে, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারে না। এই সুবাদে এগিয়ে এলো খৃস্টানরা। ওরা টোপ দিল 'আইয়ূবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তাহলে তোমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করব আমরা।' তবুও ওদের আশংকা ছিল; কোন এক বাঁকে সাইফুদ্দীন যদি আইয়ূবীর সাথে সন্ধি করে বসে তবে খৃস্টানদের অনেক চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে। কিছুতেই যাতে সাইফুদ্দীন আইয়ূবীর বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা থেকে ফিরে আসতে না পারে এজন্যই পাঠানো হয়েছে উপঢৌকনের মোড়কে তরুণী গোয়েন্দা।

সাইফুদ্দীন সম্মিলিত তিন বাহিনীর চীপ কমান্ডার হয়ে যখন তুর্কমান ময়দানে আইয়ূবীর মোকাবেলায় যুদ্ধ করতে গেল তখন তার হেরেমের সুন্দরী নর্তকী, গায়িকা ও বিউটিশিয়ানদের সাথে নিয়ে গেল। এই তরুণী দু'টি নিজের পরিচয় এভাবে আড়াল করে রেখেছিল যে, সাইফুদ্দীন এদেরকে ভেবে ছিল মুসলমান। এদেরও সাথে নিয়ে গেল সাইফুদ্দীন। এরা তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে নাচ, গান, শয্যাসঙ্গিনী হতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। বরং পুরুষের দুর্বলতম মুহূর্তগুলোতে ওদের গোপন পরিকল্পনা যেমন এরা বের করে আনতো অনুরূপ

নিজেদের মিশনের পক্ষে শাসকদের দেমাগকে এরা বদলে দিতে সক্ষম হতো। সবই এরা করতো বাকপটুতায় ও আকর্ষণীয়া রূপে নিজেদের উপস্থাপন করে, ভোগ্যরূপে নিজেরে মেলে ধরে।

বড় তরুণীটি কয়েক দিনের মধ্যেই সাইফুদ্দীনের মন জয় করতে সক্ষম হয়। সাইফুদ্দীন হেরেমের সবার উপরে ওকে গুরুত্ব দেয়। যে কোন জটিল ও গোপন বিষয়েও ওর উপস্থিতিকে সাইফুদ্দীন নিঃশঙ্ক মনে করে। ওর যাদুকরী কথা ও অঙ্গভঙ্গি সাইফুদ্দীনের দিল দেমাগে প্রাধান্য বিস্তার করে নেয়।

সাইফুদ্দীন যুদ্ধ ময়দানকেও তার প্রাসাদে রূপান্তরিত করেছিল। আরাম-আয়েশ আমোদ-স্ফূর্তির সব উপাদানই সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল সে। বিশাল সৈন্যবল ও রসদের প্রাচুর্যতার কারণে তার আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। তার বিপুল বাহিনী আইয়ূবীর সৈন্যদেরকে মেষ শাবকের মতো তাড়িয়ে মারবে এটাই ভেবেছিল সাইফুদ্দীন। কিন্তু বিধি বাম। মরু ঝড়ের মধ্য দিয়ে ফৌজি তার ভাবী ও ভাইকে নিয়ে গেল আইয়ূবীর শিবিরে। বলল, তিন বাহিনী আইয়ূবীর বিরুদ্ধে ধেয়ে আসছে। খবর পেয়েই প্রস্তুতি নিলেন আইয়ূবী। সাইফুদ্দীনের অজ্ঞাতে আক্রমণ করে ওদের দর্পচূর্ণ করে দিলেন।

এমতাবস্থায়ও এই দুই তরুণী সর্বক্ষণ থাকতো সাইফুদ্দীনের কাছে। তিন বাহিনীর মধ্যে বহু উঁচু অফিসার ছিল খৃস্টানদের এজেন্ট। তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতো এরা। তথ্য ও সংবাদ পাচার করলে ওরা ঠিক সময় মতো পৌঁছে দিতো খৃস্টান কর্তাদের কাছে।

সাইফুদ্দীনের পরাজয় যখন অবশ্যম্ভাবী তখন ওর রক্ষিতা মেয়েরা হয়ে উঠল বোঝার উপর শাকের আঁটি। সাইফুদ্দীন সব ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। খৃস্টানদের জন্যে এই প্রশিক্ষিত মেয়ে দুটি ছিল দামী অস্ত্র। ওরা এদের উদ্ধার করতে দু'টি ঘোড়া, খাবার পানি, আহার এবং তাদের সবচেয়ে সফল অস্ত্র হাশীশ ও গন্ধহীন নেশাদ্রব্য বেঁধে দিল ঘোড়ার পিঠে। দিয়ে বলল, তোমরা এ পথ ধরে ঈসিয়াত দুর্গে চলে যাবে। খঞ্জর দেয়া হল এদের হাতে। যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে আত্মরক্ষায় ব্যবহার করতে পারে। এসব গোয়েন্দা মেয়েকে অস্ত্র চালনা, অশ্বারোহণ এবং মাদকদ্রব্য খাইয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার কৌশল পুরো মাত্রায় শেখানো হতো। সাইফুদ্দীনের বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, সৈন্যদের মধ্যে আত্মরক্ষা ও পালিয়ে যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল তখন দু'জন শক্তিশালী যোদ্ধা এদেরকে তুর্কমানের যুদ্ধ এলাকা পার করে দিয়ে ঈসিয়াতের পথ ধরিয়ে দিল। বড় মেয়েটি ছিল দুর্দান্ত সাহসী ও অভিজ্ঞ। দিনের বেলায় সঙ্গীকে নিয়ে ঈসিয়াত দুর্গের

দিকে অগ্রসর হতে থাকল সে। কিন্তু পথ ছিল দুর্গম আর মরুভূমির প্রচণ্ড তাপদাহ। দুপুর পর্যন্ত চলার পর একটি টিলার গায়ে ছায়া দেখে ওখানে ঘোড়া থামিয়ে আহারাদি সেরে বিশ্রাম নিচ্ছিল এরা। এমন সময় তাদের সামনে এলো নাসেরের কাফেলা।

নাসেরও সাথীদের দেখেই বড় তরুণী বুঝে নিয়ে ছিল এরা কারা হতে পারে। তাই তাদেরকে পানি পান করিয়ে তারপর খাবারের সাথে হাশীশ খাইয়ে দিল। এরপর ওদের সাথে জিনের অভিনয় করে ভড়কে দিল এবং বিশ্বাস জন্মাল সত্যিই তারা জিন। নাসের ও সাথীরা ঘুম থেকে উঠার পর আবার ওদেরকে পানির সাথে গন্ধহীন নেশা ও হাশীশ খাওয়াল। সেই সাথে কৌশলী অভিনয় করে ওদের দেমাগকে এভাবে কব্জা করল যে ওরা তাদের জিন ভেবে আত্মসমর্পণ করে, পরিত্রাণের আবেদন করে বসল তরুণীদের কাছে। এই সুযোগে ওদেরকে নিরাপত্তা সহযোগী বানিয়ে তরণীদ্বয় নির্ভয়ে চলে গেল ঈসিয়াত দুর্গে।

তরুণীদের মাদক প্রয়োগ ও চার যোদ্ধাকে জিন ও বেহেশতের স্বপ্নচিত্রের মুগ্ধতায় বোধহীন করার কৌশল ছিল শেখ সিনানের শেখানো। শেখ সিনান মানুষদেরকে মাদকদ্রব্য খাইয়ে স্বপ্নময় ভুবনের কল্পনায় ভুলিয়ে দিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করতো। শেখ সিনানের কৌশলের উদ্ভাবক ছিল হাসান বিন সাবাহ। হাসান বিন সাবাহ ইহুদী পণ্ডিতদের শীর্ষ পর্যায়ের একজন। সেই প্রথমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমরাস্ত্রের চেয়ে মাদক, নারী ও স্বপ্নকৌশল প্রয়োগের পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। তারই স্থলাভিষিক্ত শেখ সিনান। শেখ সিনান ইহুদী ও খৃস্টানদের সহযোগিতায় ঈসিয়াত দুর্গে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরী করেছিল। এদেরকে বলা হতো ফিদাঈ। শেখ সিনানের কাছে হাশীশ, মাদক প্রয়োগ ও কল্পচিত্র দিয়ে মানুষকে বাগে আনার প্রশিক্ষণ নিয়েছিল বড় তরুণী।

তরুণীদ্বয় প্রথমে নাসের ও সাথীদের উপর মাদক ও কল্পকৌশল প্রয়োগ করে ওদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। যখন দেখল তার কৌশল শতভাগ সফল হচ্ছে; তখন এদেরকে শেখ সিনানের কাছে নিয়ে গেলে ওদের রণকৌশল ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে আইয়ূবী হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ হতে পারে বলে মনে করল। তরুণী জানতো, ইতোমধ্যে গোমশতগীন আইয়ূবীকে হত্যার জন্য শেখ সিনানের দারস্থ হয়েছে এবং তাকে মোটা মাপের সেলামী দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

* * *

তুর্কমানে মোজাফফর উদ্দীনের হামলা ব্যর্থ করে দিয়ে আইয়ূবী জেনারেলদের বললেন, এখন যুদ্ধ শেষ। তোমরা মালে গনীমত কুড়িয়ে জড় কর। মোজাফফর উদ্দীন ও সাইফুদ্দীনের যৌথ বাহিনীর ফেলে যাওয়া মালে গনীমত ছিল বিপুল। সাইফুদ্দীনের তাঁবু থেকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা, অলংকার ও মণিমুক্তো পাওয়া গেল। অনেক অলংকার যোদ্ধাদের সাথেও ছিল। এছাড়া যুদ্ধাস্ত্র, আসবাবপত্রের পরিমাণ অপরিমেয়। আইয়ূবী যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন আর নগদ অর্থ ও অলংকারাদি মিশর ও সিরিয়ার যেসব নতুন এলাকা তার অধীনে যুক্ত হয়েছিল সেসব এলাকার গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এক তৃতীয়াংশ পাঠিয়ে দিলেন বাগদাদের নেজামিয়া মাদরাসায়। যেটি তৎকালের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ ছিল। আইয়ূবী মাদরাসায়ে নেজামিয়া থেকেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লেনপোলের ভাষায়, "একথা প্রমাণিত যে, আইয়ূবী মালে গণীমত থেকে নিজে কিছুই রাখতেন না, সবই সেনাবাহিনী ও জনকল্যাণে খরচ করতেন।"

বড় সমস্যা ছিল বহু সংখ্যক বন্দী শত্রুসেনার সুরাহা করা। আইয়ূবী তাদেরকে একত্রিত করে বললেন, "তোমাদের শাসকরা ইসলামের চির শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে ওদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। তোমরা মুসলমান হয়েও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো। এজন্যই তোমাদের পরাজয় হয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাত সবই বরবাদ করে দিয়েছো তোমরা। তোমাদের অপরাধ ও গোনাহ ক্ষমা পাওয়ার একমাত্র পথ হলো, ইসলামের জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করা। এসো, আমরা সবাই মিলে বেঈমানদের কাছ থেকে প্রথম কিবলাকে উদ্ধার করি।" আইয়ূবীর এই ভাষণ ছিল আবেগময় ও ঈমানদীপ্ত। বন্দী যোদ্ধারা আইয়ূবীর ভাষণে উদ্দীপ্ত হলো, নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অধিকাংশই তাকবীর দিতে শুরু করল এবং নিজেদেরকে আইয়ূবীর বাহিনীতে ন্যস্ত করার আবেদন করল। আইয়ূবী তাদেরকে সেনাবাহিনীর সাথে একীভূত করে নিলেন। এতে তার বাহিনীতে প্রশিক্ষিত সৈন্য ও কমান্ডারের সংখ্যা বাড়ল। সৈন্য ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ হল। তদুপরি আইয়ূবী অগ্রাভিযান মুলতবি করে দিলেন। নতুনভাবে সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর জন্যে দামেশক ও মিশর থেকে রসদপত্র আসার অপেক্ষা করলেন। মোজাফফর উদ্দীনের আক্রমণ আইয়ূবীর বাহিনীর কাঠামো অনেকটাই নড়বড়ে করে ফেলেছিল।

* * *

ঈসিয়াত দুর্গ ছিল বর্তমান লেবানন সীমান্তে। হাসান বিন সাবাহর উত্তরসূরী শেখ সিনানের রাজত্ব ছিল সেই দুর্গে। এদেরকে দুর্গসহ সামগ্রিক সহযোগিতা দিয়েছিল খৃস্টান শাসকরা। এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করতো, কিন্তু

সত্যিকার ইসলামের অনুসারী ছিল না এরা। মূলত মাদক ও নেশার চর্চা করে এরা মানুষকে ধোঁকা দিত, হত্যা করত। শেষ পর্যায়ে ভাড়াটে খুনী গোষ্ঠীরূপেই পরিণত হয় সাবাহ গোষ্ঠী। অর্থের বিনিময়ে কয়েকজন খৃস্টান নেতাকেও হত্যা করিয়েছিল শেখ সিনান। মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করা ছিল এদের অন্যতম টার্গেট। এ টার্গেটের জন্য আরো কয়েকটি ছোট ছোট দুর্গও অস্ত্রশস্ত্র শেখ সিনানকে দিয়েছিল খৃস্টানরা। খৃস্টানদের অর্থের লোভে এরা নূর উদ্দীন জঙ্গী ও আইয়ূবী হত্যার চেষ্টায় মেতে উঠে। নূরউদ্দীন জঙ্গীকে শেখ সিনানের লোকেরাই হাশীশ খাইয়ে হত্যা করেছিল বলে মনে করেন কোন কোন ঐতিহাসিক। হাশীশ খাওয়ার কারণেই অসুস্থ হয়ে জঙ্গী কয়েক দিনের মধ্যে ইন্তেকাল করেন। এরপর শুরু হয় আইয়ূবীকে হত্যার নীলনক্সা। এ নীলনক্সা প্রণীত হয় হাশীশ ও ইহুদী-খৃস্ট গোষ্ঠীর যোগসাজসে। এদেরই ফসল দুই তরুণী যখন নাসের ও তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঈসিয়াত দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে পৌছাল তখনও ভোরের সূর্য উঠতে ঢের বাকী। বড় তরুণী ঘোড়া থেকে নেমে সাংকেতিক শব্দে কি যেন বলল দ্বাররক্ষীদের, একটু পরেই খুলে গেল ফটক, তরুণী সবাইকে নিয়ে প্রবেশ করল দুর্গে। নাসের ও সাথীদেরকে এক অফিসারের কাছে সোপর্দ করে শেখ সিনানের কাছে চলে গেল দুই তরুণী।

শেখ সিনান নিজেকে রাজা ভাবতো। রাজা ভাবার মতো সামগ্রিক অবস্থাও ছিল তার। কিন্তু বয়সের আধিক্যে চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ ও চুল দাড়ি সাদা হয়ে গেলেও নিজেকে বুড়ো ভাবতে পারতো না সিনান। বড় তরুণী যখন শেখ সিনানের কাছে তার দোস্ত সাইফুদ্দীনের পরাজয় এবং তাদের পলায়নের বর্ণনা দিচ্ছিল তখন ছোট তরুণীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সিনান।

'এদিকে এসো! বড় তরুণী থেকে মনোযোগ সরিয়ে ছোট তরুণীকে আহবান করল সিনান। তুমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সুন্দরী। আমার কাছে বসো। তরুণীকে বোগলদাবা করে তার রেশমী চুলে হাত বুলাতে বুলাতে সিনান বলল, তোমরা ক্লান্ত। আজ আমার এখানেই রাত যাপন করবে।'

শেখ সিনানকে ইতোপূর্বে দেখেনি ছোট তরুণী। সে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল সিনানের দিকে। এরপর ভেংচি দিয়ে দূরে সরে এলো। এই বুড়োর ন্যাকামী ভাল লাগল না তার।

হেচকা টান দিয়ে তরুণীকে কোলের উপর ফেলে দিল সিনান। ওর বক্র চাউনীতে অপমানিত বোধ করল বুড়ো। বড় তরণীকে বলল, "ওকে মনে হয় আমার সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। আমার প্রতি বিদ্রূপ কতটুকু অপরাধ তা বোধ হয় ও জানে না।"

'আমি আপনার কেনা বাদী নই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ছোট তরুণী। আমার কর্তব্যের মধ্যেও এটা পড়ে না যে, যেই আমাকে কোলে টেনে নিবে আমি ওর হাতে নিজেকে সঁপে দেবো। উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেল সে। বলল, আমি ক্রুশের দাসী বটে হাশীশদের কেনা বাদী নই।'

বড় তরুণী তাকে ধমক দিয়ে চুপ হতে বলল, কিন্তু তরুণী বলতে লাগল, 'মুসলমানদের হেরেমে এ লোক আমাকে দেখেনি। আমি কর্তব্য পালন ছাড়া ওখানে কোন অপরাধ করিনি। বুড়োর বিনোদনের পাত্রী হওয়া আমার কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়।'

'তুমি এতো সুন্দরী না হলে তোমার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য ছিল না। বড় তরুণীকে নির্দেশের সুরে বলল, ওকে নিয়ে যাও। ঈসিয়াত দুর্গের আদব ওকে শিখিয়ে দিও।'

ছোট তরুণীকে বাইরে রেখে এসে আবার শেখ সিনানের কামরায় ঢুকল বড় তরুণী। বলল—আপনার ক্ষোভ যথার্থ কিন্তু কর্তাদের হুকুম ছাড়া যে কারো আবদার আমরা রক্ষা করতে পারি না। আমি যেহেতু আপনাকে জানি এবং এ দুর্গে ইতোপূর্বেও এসেছি, এজন্য আপনার কাজের প্রয়োজনে চারজনকে ফাঁসিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি। এদিকে আপনার দৃষ্টি দেয়া দরকার। সে নাসের ও সাথীদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলল।

'ঠিক আছে, ওই চারজনকে ব্যবহার করব আমি। এটা একটা ভাল কাজ করেছ। কিন্তু এই মেয়েকে আমার কামরায় অবশ্যই রাখবো।'

'এ কাজ আমার উপর ছেড়ে দিন। ও তো আর এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি ওকে আপনার কাছে আসার জন্যে রাজী করাব। সে খুশী মনে আপনার কাছে চলে আসবে। আসবে, অবশ্যই আসবে.....।'

* * *

নাসের ও তার সাথীদেরকে শেখ সিনানের দুই লোক একটি কক্ষে নিয়ে গেল। নেশার ঘোরে সারারাত বিরামহীন পথ চলেছে এরা, নেশার ঘোর না কাটলেও তাদের দেহ অবসন্ন। কক্ষের মধ্যে সুসজ্জিত বিছানা। ওরা বিছানায় গা এলিয়ে দিলে মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল। অপর দিকে তরুণী দুজনও সারা রাত নির্ঘুম কাটিয়েছে। তাদের জন্যে বরাদ্দ কক্ষে গিয়ে তারাও ঘুমিয়ে পড়ল...।

দুপুরে চোখ খুলল নাসের। চোখ মেলেই তাকাল চারপাশে। সাথীরা তখনও ঘুমে অচেতন। চারদিক বুঝতে চেষ্টা করল নাসের। চারদিকে শ্যামল সবুজের সমারোহ নেই, নেই ফুলে ফুলে ভরা অনিন্দ বাগান। পাখ-পাখালীর কল-কাকলীও

নেই। নেই ভ্রমরের গুঞ্জন। পায়ের নীচে মখমলের মতো নরম ঘাসও নেই। তার মনে পড়ল সেই স্বপ্নময় চিত্র। স্মৃতিতে ভাসতে থাকল জান্নাতি দুই সুন্দরী, ফুল, পাখি ঝর্ণা। মনে পড়ল দীর্ঘ মরু সফর, কষ্ট, ক্ষুধা তৃষ্ণা, মনে পড়ল সবই। সবকিছু তার স্মৃতিতে পরিষ্কার। কিন্তু এখন সে কোথায়? এটাতো একটা সাজানো গোছানো কামরা। এখানে কয়েকটি বিছানা, সাথীরা বিছানায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে। স্বপ্নময় চিত্র, মরু কষ্ট ও দুই তরুণীর কথা মনে পড়ল। কিন্তু এখন কোথায় আমি? এ চিন্তা ভাবিয়ে তুলল নাসেরকে।

সাথীদের সে জাগাল না। উঠে দরজার কাছে দাঁড়াল নাসের। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল সৈন্যদের আনাগোনা। ভাবনায় পড়ে গেল, এই সৈন্যরা কারা? এই দুর্গ কাদের? কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক মনে করল না সে। কারণ দুর্গটি কোন শত্রু বাহিনীরও হতে পারে। তাহলে কি সাথীদের নিয়ে বন্দী হয়ে পড়েছে সে? কিন্তু ঘরটিকে দেখে কয়েদখানা মনে হয় না। সে একজন গোয়েন্দা এবং অভিজ্ঞ সৈনিক। কাউকে কিছু না বলে জিজ্ঞেস না করেই নিজে নিজে এই রহস্যের কিনারা করতে ভাবতে লাগল। হাশীশের নেশা এখন সম্পূর্ণ কেটে গেছে। সে নিজের প্রকৃত অবস্থায় ফিরে এসেছে। একটা গভীর সংকটের আঁচ করল নাসের। দরজার কাছ থেকে সরে এসে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। এমন সময় দু'জন লোক প্রবেশ করল কক্ষে। কৃত্রিম নাক ডাকার শব্দ শুরু করে দিল নাসের।

'মাত্র শুয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই।' বলল একজন।

'থাক। ওদের ঘুমিয়ে থাকতে দাও। বলল অপরজন। মনে হয় এদেরকে বেশী খাইয়ে ফেলেছে। এদের সম্পর্কে কিছু বলেছে কি?'

'দুই খৃস্টান তরুণী এদের ফাঁসিয়ে নিয়ে এসেছে। বলল প্রথম জন। এরা সালাউদ্দীন আইয়ূবীর ঝটিকা বাহিনীর চৌকস গোয়েন্দা। এদেরকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।'

চলে গেল তারা কক্ষ ছেড়ে। তাদের ভাষা বুঝল নাসের। অবস্থার ভয়াবহতায় শরীরের প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে গেল তার, কাঁটা দিয়ে উঠল শরীর। সে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, কোন দুর্গে বন্দী হয়ে পড়েছে তারা। ভয়ানক প্রতারণার শিকার হয়েছে সবাই। এখন তার জানা দরকার এই দুর্গ কাদের? এই এলাকাটি কোথায়? কোন উদ্দেশ্যে তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে? কোন উদ্দেশেই বা তাদের তৈরী করতে চায় এরা। সে জানে, কোন দুর্গ থেকে ফেরার হওয়া শুধু কঠিন নয় বরং অসম্ভব।

একটু ঘুমিয়েই জেগে উঠল ছোট তরুণী। জানালা খুলে বসে পড়ল সেখানে। সফরের সময় নিজের আবেগ ও মনের কথা প্রকাশ করে দিয়েছিল বড় তরুণীর

কাছে। সে সদ্য যুবতী। অন্যান্য গোয়েন্দা মেয়েদের মতো আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এখনও। এই প্রথম কোন মিশনে প্রশিক্ষণ শিবিরের বাইরে এসেছে। তার সাথী পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞ। সেও দেখল আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই এই তরুণীর। এজন্য মিশনে সফল হতে পারছে না। পুরুষকে আঙ্গুলের ঈশারায় নাচানোর কৌশল এখনও রপ্ত করতে পারেনি। আসলে নিজের সত্তা বিকিয়ে গোয়েন্দাগিরির এই নোংরা পেশাকে সে মেনে নিতেই পারছিল না। যদ্দরুন এসব কৌশল রপ্ত করতে পারছিল না। ক্ষমতালোভী, দুর্নীতিবাজ, চরিত্রহীন মুসলিম শাসক ও শেরিফদের বিনোদনের খেলনায় পরিণত হয়েছিল তরুণী। এমনিতেই দীর্ঘ বিরামহীন সফরে ক্লান্ত, তদুপরি পেশার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। ক্লান্তিকর সফরের ধকলে শরীরটা নিস্তেজ। এর মধ্যে শেখ সিনানের মতো একটা বুড়োর কুরুচিপূর্ণ প্রস্তাবে দেমাগ বিগড়ে গেল তরুণীর।

বিদ্রোহ করে বসল তরুণী। এখন কি করবে সে? বড় তরুণী যে কথা দিয়ে এসে সঙ্গিনীকে যে করেই হোক সিনানের কক্ষে পাঠাবে।

ছোট বেলায় গীর্জায় সুরক্ষিত ব্যবস্থায় এই তরুণীকেও দিয়ে ক্রুশের স্বার্থে সব ধরনের অপরাধ কর্ম সম্পাদনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যৌবন স্বভাবজাত তারুণ্যের নীতিবোধ ও অন্যায়ের প্রতি যে দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তা এই তরুণীকেও ভীষণভাবে নাড়া দেয়। অন্যায়ের প্রতি বিদ্রোহ করে বসে তরুণীর যুবা মানস। খৃস্টধর্মের প্রতি তার মনের কোণে জমতে থাকে ঘৃণা। এই ঘৃণা ধ্বসিয়ে দেয় পাদ্রীদের কুসংস্কার ও মিথ্যার ভিত। যে সব পুরুষকে বাগে আনার জন্যে তাকে তৈরী করা হয়েছিল সেইসব দুর্নীতিবাজ কাপুরুষদের প্রতি ঘৃণায় তার হৃদয়ে শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়। এসব অপকর্মের হোতাদের চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার আগুন জ্বলতে থাকে তার কোমল হৃদয়ে। কিন্তু করার কিছুই নেই তার। সে যে বাধা ক্রুশের অক্টোপাসে। মিথ্যার জাল ছিন্ন করে পাপাচার থেকে নিজেকে বাঁচানোর সামর্থ নেই তার, পাপ জগৎকে সে কিভাবে নির্মূল করবে? জানালার পাশে বসে উথাল-পাতাল চিন্তার কুল-কিনারা পাচ্ছিল না তরুণী। চোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। পাপ জগৎ থেকে বাঁচার অথবা পালিয়ে যাওয়ার কোন পথই দেখছিল না সে।

জেগে উঠল বড় তরুণী। সঙ্গিনীকে জানালার পাশে বসা দেখে কাছে গিয়ে বসল। চোখে অশ্রু দেখে বলল, 'ভাই! প্রাথমিক পর্যায়ে আবেগ-অনুভূতি এমনই হয়ে থাকে। ভেবে দেখো, আমরা যা কিছু করছি, তা আমাদের জীবন সুখের জন্যে নয়, সাধ মিটানোর প্রয়োজনেও নয়, যিশুখৃস্টের মর্যাদা রক্ষার জন্যে করছি। ইসলামকে ধ্বংস করে ক্রুশের আদর্শ প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রাখো, তাহলে আর দুঃখ থাকবে না। দেখো, আমাদের সৈনিক রণাঙ্গনে লড়ছে, আর আমরা

রণাঙ্গনের বাইরে প্রাসাদের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করছি, এখানে আমাদের ক্ষেত্র হচ্ছে, মুসলমান নেতাদের প্রাসাদ, আমাদের টার্গেট ওদের মাথা, আর আমাদের অস্ত্র আমাদের দেহ-রূপ। ভাই! দেহের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলো, এটা কিছু না, তুমি যে মিশন পালন করছো তাতে তোমার অন্তর সম্পূর্ণ পবিত্র।'

'আমরা ক্রুশের জন্যে আমাদের দেহমন পণ্যে পরিণত করি, কিন্তু মুসলমানরা একাজে তাদের নারীদের ব্যবহার করে না কেন? আমাদের শাসক ও সৈনিকেরা মুসলমান শাসক ও সৈনিকদের মতো রণাঙ্গনে বীরত্ব দেখাতে পারে না কেন? চোরের মতো মুসলিম নেতাদেরকে হত্যা করতে কেন গোপনে চক্রান্ত করে? আইয়ূবীর এই গোয়েন্দাদের মতো আমাদের গোয়েন্দা ও সৈন্যরা কেন সাহসী হতে পারে না? আমাদের শাসক ও সৈন্যরা সাহসী হতে পারে না আত্মদুর্বলতার কারণে। মিথ্যাবাদী ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বনকারীরা কখনও সাহসী হতে পারে না, এরা কাপুরুষ। কাপুরুষ বলেই আড়ালে আবডালে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনে।' বলল ছোট তরুণী।

'চুপ কর! ধমকে উঠল বড় তরুণী। এসব কথা আর কারো সামনে বললে মরতে হবে। শোন, এ মুহূর্তে আমরা শেখ সিনানের দুর্গে, এটাই রূঢ় বাস্তবতা। শেখ সিনানকে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ। তাকে কোন অবস্থাতেই নারাজ করা যাবে না, তাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে।'

'এই লোকটির প্রতি আমাদের ঘৃণা জন্মে গেছে। বলল ছোট তরুণী। এই লোকটি ভাড়াটে ঘাতক দলের নেতা। তাকে আমি আমার শরীরে হাত লাগানোর উপযুক্ত মনে করি না।'

বড় তরুণী দীর্ঘ সময় বুঝালো ছোট তরুণীকে। অনেক কথা বলার পর ছোট তরুণীকে সিনানের কক্ষে রাত যাপনে সম্মত করলো বড় তরুণী। তাকে বলল, 'তুমি আমার ক্ষমতা দেখোনি। শেখ সিনানতো নস্যি, বড় বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিদেরকে আঙ্গুলের ফাঁকে নাচাই আমি। সেই তুলনায় শেখ সিনান কিছুই না। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সামনে কঠিন সময়। এ মুহূর্তে শেখ সিনানকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। তাই তাকে ক্ষেপাতে চাই না আমরা। আমি তাকে তোমার লোভ দেখিয়েছি, সে কাতরভাবে অপেক্ষা করছে। লক্ষ্মী বোনটি, ওর সাথে তুমি একটু অভিনয় করে সহজেই পরাস্ত করতে পারবে।'

'তুমি কি এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো না।' বড় তরুণীকে বললো ছোট তরুণী।

'হ্যাঁ, যথাশীঘ্রই বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তবে আমরা যে এখানে আছি, সবার আগে সেই খবরটি কর্তাদের জানাতে হবে।'

ঠিক এমন সময় দু'জন লোক তাদের কক্ষে প্রবেশ করল। তারা চার কয়েদী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বড় তরুণী তাদের জানাল, এরা কারা, কিভাবে এদেরকে তারা এখানে নিয়ে এসেছে।

'ওরা এখন কি করছে?' জিজ্ঞেস করল বড় তরুণী।

'মাত্রই ঘুমিয়েছে।' উত্তর দিল একজন।

'এদেরকে কি কয়েদখানায় অন্তরীণ করা হবে?' জিজ্ঞেস করল ছোট তরুণী।

'কয়েদ খানায় বন্দী করার কোন দরকার নেই। জবাব দিল অপর এক আগন্তুক। এখান থেকে পালাবে কোথায়?'

'আমরা কি ওদের দেখতে পারি?'

'কেন পারবে না? তোমাদের শিকার তারা। তাদের কাছে তোমাদেরই তো যাওয়া দরকার। যাতে তোমাদের জালে তাদের আটকে রাখতে পার।'

একটু পরে বড় তরুণীর বাধা সত্ত্বেও ছোট তরুণী নাসের যে কক্ষে ঘুমুচ্ছে সেখানে চলে গেল। নাসের ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে ছিল, ছোট তরুণীকে দেখে সে উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় নিয়ে এসেছ আমাদের? বল না, তোমরা কে, কোত্থেকে এসেছো, আর আমাদের এখানে কেন নিয়ে এসেছো?

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে নাসেরকে দেখল ছোট তরুণী। আবেগের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জ্বলে উঠল তরুণীর মধ্যে, সে কানে কানে নাসেরকে বলল, ফেরার হতে চাও?

'আমি কি করব, সেকথা তোমাকে বলব না। যা করা দরকার তা আমি করেই দেখাবো।'

নাসেরের ঘনিষ্ট হয়ে গেল তরুণী। ক্ষীণ আওয়াজে বলল, আমি জিন নই, মানুষ। আমাকে ভুল বুঝবে না। আমার উপর বিশ্বাস রাখো।

নাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তরুণীর দিকে। তরুণী লেপ্টে গেল নাসেরের সাথে।

* * *

চোখে দেখা নিজের লাশ

নাসেরের মনের মধ্যে জিনের ভীতি ছিল প্রকট। অথচ টগবগে যৌবনের অধিকারী আইয়ূবীর স্পেশাল ফোর্সের এই কমান্ডার মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে অভ্যস্ত। খৃস্টানরা আইয়ূবীর ঝটিকা বাহিনী সম্পর্কে বলতো, "ওদের দেখে মৃত্যুও ভয় করে। মরুভূমির যাতনা, সাগরের কষ্ট এবং দীর্ঘ মরু যাত্রাকেও এরা পরওয়া করতো না। এরা অনায়াসে আগুনে ঝাপ দিতে পারতো। শত্রু বাহিনীর রসদে আগুন লাগিয়ে ওদের কেউ কেউ আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যেতেও পরোয়া করতো না কিন্তু জিন পরী সম্পর্কে এদের মধ্যে ছিল ভয়ানক ভীতি। ওরা সব সময় জিন-পরীর কাল্পনিক দানবীয় ত্রাসে-সন্ত্রস্থ থাকতো। অথচ কোন দিন তাদের কেউ জিন-পরী দেখেনি।

নাসের যদি জ্ঞাতসারে, স্বজ্ঞানে ঈসিয়াত দুর্গে নীত হতো তাহলে অতোটা ভয় পেতো না। বন্দী হয়ে এখানে নীত হলেও অতোটা ভয় হতো না তাদের। ফেরার হওয়ার বিষয় নিয়ে ভাবতো নির্ভিক চিত্তে। হাশীশ নেশা খাইয়ে অবচেতন করে, তাদের দেমাগে জিন-পরীর কল্পচিত্রের মায়াজাল সৃষ্টি করে ঈসিয়াত দুর্গ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে তাদের। নেশার প্রভাব মুক্ত হলে সে বুঝতে পারলো মাইলের পর মাইল পর্যন্ত একই ধরনের মনোরম দৃশ্য থাকতে পারে না।

তরুণী নাসেরের গায়ের সাথে মিশে বসে যখন তাকে বলল, 'আমি জিন নই, তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পার,' এতে আরো ভড়কে গেল নাসের। তরুণী তার কাছে কল্পনার চেয়েও বেশী সুন্দরী। নাসের তাকে মানুষ ভাবতে পারছে না। সে জানতো, জিনরা মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ছলনা করে থাকে। তার কাছে এই দুর্গটিকে মনে হলো জিন-পরীদের আবাস স্থল। তার সাথীরা তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে মনে সাহস সঞ্চয় করে বলল, তোমার উপরে কিসের ভিত্তিতে আস্থা রাখবো, আমাদের প্রতি কেন তুমি এতোটা দরদী হয়ে উঠলে? কোথায় আমাদের নিয়ে এসেছো তোমরা? কেন এখানে এনেছো, জায়গাটির নাম কি?

আমাকে বিশ্বাস না করলে তোমাদের ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হবে তোমাদের হাত, আপন সহকর্মীকে খুন করে আত্মতুষ্টি লাভ করবে তোমরা। হ্যাঁ। আমি

একথা বলতে পারবো না; কেন তোমাদের প্রতি এতোটা দয়াবান হয়ে উঠলাম আমি। এই জায়গার নাম ঈসিয়াত। আর এটা ফেদাঈদের দুর্গ। ফেদাঈ নেতা শেখ সিনান এই দুর্গের অধিপতি। ফেদাঈদের সম্পর্কে তোমার তো জানার কথা?

হ্যাঁ, ফেদাঈদের সম্পর্কে জানি আমি। এখন বুঝতে পারছি তোমরাও ফেদাঈ। একথাও জানতাম ফেদাঈদের কাছে সুন্দরী তরুণী রয়েছে, যাদেরকে দুষ্কৃতকর্মে ব্যবহার করা হয়।

'ওদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার নাম লিজা।'

'তোমার সাথে তো আরেকজন ছিল?'

'তার নাম তেরেসা। বলল লিজা। সেই তো তোমাদেরকে হাশীশে নেশাগ্রস্ত করে এখানে নিয়ে এসেছে।'

লিজা এর বেশী কিছু বলতে পারল না। হঠাৎ দরজার পাশে এসে দাঁড়াল তেরেসা। তেরেসা চোখের ইশারায় লিজাকে বেরিয়ে আসতে বললে, লিজা বাইরে গেল।

'এখানে কি করছ? লিজাকে জিজ্ঞেস করল তেরেসা। এই লোকটির সাথে মিশে বসতে তোমার এতটুকু ঘৃণা লাগেনি? তুমি কি জানো না মুসলমানরা ঘৃণিত? তুমি কি বেঈমানীর শাস্তি ভোগ করতে চাও?'

তেরেসার কথায় লিজা বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। কোন কথাই বেরুল না তার মুখ থেকে। আবেগের বশীভূত হয়ে মুসলমান কর্তাব্যক্তিদের ব্ল্যাকমেইল করার কাজের প্রতি তার অনীহা জন্মে ছিল। তার মনে নিজ পেশার প্রতি ঘৃণা এতো প্রকট হয়ে পড়েছিল যে, তার পক্ষে আর নিজ পেশা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

'আমিও তোমার মতই যুবতী। মুসলিম সৈনিক নাসেরকে আমারও ভাল লাগে। এমন সুদর্শন সুঠাম যুবককে কার না ভাল লাগবে। তুমি যদি বল যে, "আমি এই যুবকের প্রেমে পড়ে গেছি; তাতেও আশ্চর্য বোধ করব না আমি। আমি বুঝি, এইসব মুসলিম উমারা, আর বয়স্ক মুসলিম দুর্নীতিবাজ আমলাদের প্রতি তোমার মনে প্রচণ্ড ঘৃণা, এদের হাতের পুতুল হতে তোমার মোটেও ইচ্ছে করে না, সব ঠিক কিন্তু তোমার মিশন ক্রুশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা আর প্রত্যেক মুসলমান তোমার জাতশত্রু। এদিকটি তুমি সামনে রাখো; তাহলে আর অসুবিধা হবে না।' বলল তেরেসা।

'না, না, তেরেসা। ওর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই, তুমি ভুল বুঝছো', আতংকিত কণ্ঠে বলল লিজা।

'যদি আকর্ষণই না থাকবে তাহলে ওর কাছে এভাবে গা জড়িয়ে বসেছিলে কেন?'

কথা জড়িয়ে গেল লিজার। জড়ানো কণ্ঠে বলল, আমি ব্যাপারটি তোমাকে বুঝাতে পারব না, কি মনে করে যে ওর কাছে এভাবে বসলাম!

'কি কথা বলেছো ওর সাথে?'

'না! তেমন বিশেষ কোন কথা হয়নি।'

'কর্তব্য কাজে অবহেলা করছো তুমি। এটা পরিষ্কার বেঈমানী। যার অনিবার্য শাস্তি মৃত্যু।' বলল তেরেসা।

'তেরেসা শোন! ওই বুড়োটার কাছে আমি একাকী যেতে পারব না। ও যদি আমার সাথে জোড়াজুড়ি করে তবে ওকে মারব না হয় নিজেই আত্মহত্যা করব।'

তেরেসা একটি সুদৃশ্য পাথরের মতো। তার দেহ সৌন্দর্য আকর্ষণ করতো সবাইকে, সবাইকে কাছে টানতো সে; কিন্তু কাউকেই নিজের করে নিতো না। তার নিজের মধ্যে কারো প্রতি অনুরাগ-বিরাগ ছিল না। লিজা এখনও সেই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। তেরেসা মানসিক অনুভূতিতে আক্রান্ত হয় না। রাগ-অনুরাগ, আবেগ-বিরাগ তার নিয়ন্ত্রণে।

'আমি বুঝতেই পারিনি তুমি এতোটা আবেগ-প্রবণ হয়ে উঠবে। এমনটি জানলে তোমাকে নিয়ে আসতাম না। কিন্তু এখানে আসা ছাড়া আমার কোন উপায়ও ছিল না। এই দুরবস্থার মধ্যে ত্রিপলী পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ছিল না বলে সবচেয়ে নিকটবর্তী এই মিত্রদুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। লিজা! আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবো এবং শেখ সিনানের দ্বারা তুমি যাতে পীড়িত না হও সে চেষ্টায়ও ত্রুটি করবো না। আমার অনুরোধ, এই দুঃসময়ে তুমি নিজের মর্যাদার ব্যাপারে এতোটা আবেগ প্রবণ হয়ো না।'

'তেরেসা! তোমাকে আমি মনের কথাটা বলেই ফেলি। বলল লিজা। আমি চাচ্ছি এই গোয়েন্দাদেরকে ব্যবহার করে এখান থেকে তুমিসহ পালিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে। এদের যা সাহস এবং এদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আমি যা শুনেছি, তাতে আমার বিশ্বাস জন্মেছে, এদেরকে একটু সুযোগ করে দিলে ওরা আমাদের নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। এপথ ছাড়া এখান থেকে মুক্তির আর কোন পথ দেখছি না।'

"এদের যোগ্যতা ও সাহসকে আমি সম্মান করি। বলল তেরেসা। কিন্তু তুমি কি একথা ভেবেছো, আমরা উভয়েই বা তুমি একা যদি এদের সাথে চলে যাও তবে এরা আমাদেরকে গন্তব্যে যেতে না দিয়ে ওদের সাথে নিয়ে যাবে। লিজা! মিথ্যা আশায় বুক বেঁধো না......। শোন! এখন তুমি গোসল করে কাপড় বদলে

নাও। আমাদেরকে নৈশভোজে দাওয়াত করেছেন শেখ সিনান। তার সাথে তোমাকে কি করতে হবে তা আমি বলে দেবো। দৃশ্যতঃ হাবভাবে বুঝাবে, তুমি তার প্রতি বিরাগ নও এবং এখান থেকে পালানোর চিন্তাও তুমি করছো না। এই মাত্র আমি জানতে পেরেছি, হিরনের শাসক গোমশতগীন এখানে এসেছেন। গোমশতগীন কে তা তুমি জানো, এটাও জানো, আইয়ূবীর সবচেয়ে বড় স্বজাত শত্রু গোমশতগীন। এসব মুসলিম নেতাকে বহু কষ্টে আমরা হাত করেছি, তাকে তুমি নিজেদের লোক মনে করো।"

* * *

লিজাকে তেরেসা এসে নিয়ে যাওয়ায় গভীর চিন্তায় পড়ে গেল নাসের। নিশ্চিত হলো সে, তরুণী দুজন জিন নয়, মানুষ। কিন্তু এটা বুঝে উঠতে পারছিল না, লিজা তাদের প্রতি এতোটা দয়ার্দ্র হয়ে উঠলো কেন? লিজা যখন তাকে বলল, হাশীশ খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে তারা, তখন সে বুঝল, ফিদাঈ সম্পর্কে ট্রেনিংকালেই অবগত করা হয়েছে তাদেরকে। তারা জানে ফেদাঈনরা সুন্দরী মেয়েদেরকে ব্যবহার করে। এই মেয়ে দুটোকে ব্যবহার করে হয়তো এরা চাচ্ছে তাদেরকে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগাতে।

সাথীদের জাগিয়ে দিল নাসের। ঘুম থেকে জেগে ওরা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখতে লাগল চারপাশ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সবাই নাসেরের দিকে তাকাল।

'বন্ধুগণ! আমরা ফেদাঈদের জালে আটকা পড়েছি। এটি ফেদাঈদের দুর্গ। এখানে ফেদাঈ নেতা শেখ সিনান ও তার বাহিনী থাকে। যে দুই তরুণীকে আমরা জিন মনে করেছিলাম এরা জিন নয় ফেদাঈন তরুণী। আমি এখনও জানি না, আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে। তোমরা জানো ফিদাঈ গোষ্ঠী খুবই ভয়ানক। ওদের কাছে যথাসম্ভব কম কথা বলতে চেষ্টা করবে। যদি বাইরে বের হওয়ার সুযোগ পাই তবে ফেরার হওয়ার কথা ভাববো।'

'এরা কি আমাদেরকে জেলখানায় বন্দী করে ফেলবে?' জানতে চাইল এক সাথী।

'জেলখানায় বন্দী করে রাখলে তা আমাদের জন্যে সৌভাগ্যের কারণ হতো, কিন্তু ফেদাঈনরা হাশীশ ও নারী ব্যবহার করে আমাদের দেমাগ বিগড়ে ফেলবে, তখন আমরা আমাদের ধর্ম, কর্ম ও কর্তব্য সব ভুলে যাবো।'

'ফেরার হওয়া ছাড়া মনে হয় আর কোন পথ নেই।' বলল নাসেরের অপর এক সাথী।

'ঈমান হারা হওয়ার চেয়ে আমাদের মৃত্যুবরণ করাও ভাল।' বলল অপর একজন।

'নিজেরা সচেতন থেকো, আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখো, বলল নাসের। এতো সহজে আমাদেরকে এরা কাবু করতে পারবে না।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এক লোক দু'টি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গেল ঘরের মেঝেতে। তারা আগন্তুকের সাথে কোন কথা বললো না। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে সবার। কক্ষ থেকে অদূরে অন্য একটি ঘরে শেখ সিনানের নৈশভোজ চলছে। সেখানে জমজমাট আসর। বাহারী ভোজ আয়োজন, সুরা ও নারীর সম্মিলন। খাবারের ঘ্রাণ ও শরীরে ব্যবহৃত খুশবুতে গোটা দুর্গ মোহিত। শেখ সিনান খাবার মজলিসে রাজকীয় আসনে উপবিষ্ট, তার একপাশে লিজা অপর পাশে তেরেসা আর মুখোমুখি সামনে গোমশতগীন বসে আহার করছে।

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর সময়ে গোমশতগীন ছিল হিরনের গভর্নর। জঙ্গীর মৃত্যুর পর সে নিজেকে হিরন এলাকার স্বাধীন খলিফা ঘোষণা করে। এভাবে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাইফুদ্দীন ও মালিক আস সালেহ। এই তিন বিদ্রোহী একত্রিত হয়ে জোট বাঁধে কেন্দ্রীয় শাসক আইয়ূবীর বিরুদ্ধে। খৃস্টানদের সাথে গড়ে তোলে সখ্যতা। খৃস্টানরা গোমশতগীনকে সরাসরি সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করেনি বটে, কিন্তু গুপ্ত ঘাতক, সন্ত্রাসী এবং মদ-নারী ও প্রচুর নগদ অর্থ সাহায্য করে।

গোমশতগীন ছিল কুচক্রী। ময়দানের ভূমিকার চেয়ে ওর কূটবুদ্ধির জোর ছিল বেশী। শত্রুকে সে মাটির নীচ দিয়ে আঘাত হানতো, মিত্রদেরকেও সুযোগ মতো শায়েস্তা করতে ক্রটি করতো না। মিত্রদের ঘাড়ে চড়ে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এবং রাজ্য বিস্তারের স্বপ্নে বিভোর থাকতো। মিত্রদেরকে কখনই সুনজরে দেখতো না গোমশতগীন। বন্ধুদের প্রতিও সে থাকতো সন্দিহান। যৌথ বাহিনীর কমান্ড সাইফুদ্দীনের কব্জায় চলে যাওয়ার পর তুর্কমানে যাওয়ার পথে শেখ সিনানের দুর্গে চলে এলো। সে বুঝতে পেরেছিল সম্মুখ যুদ্ধে আইয়ূবীকে পরাস্ত করা কঠিন। সাইফুদ্দীন যতোই শক্তি নিয়ে যাক না কেন তাকে নিরাশ হয়েই ফিরে আসতে হতে পারে। গোমশতগীন জানতো ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিদের কর্তৃত্বের হুমকি সেনাবাহিনী। তার সামনে আইয়ূবী ছাড়া আর কোন প্রতিপক্ষ ছিল না। কয়েকবার গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা আইয়ূবীকে হত্যার চেষ্টাও সে করেছে কিন্তু সবগুলো চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে, তাই শেখ সিনানের দুর্গে এসেছে আইয়ূবীকে যাতে নিশ্চিত অব্যর্থ আঘাত হানার ব্যবস্থা করা যায়। ভবিষ্যৎ চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্যে গোমশতগীন ঈসিয়াত দুর্গে পৌঁছে লিজা-তেরেসা আসার একদিন আগে। সাইফুদ্দীনের নেতৃত্বে জোট বাহিনীর পরিণতি সংবাদ জানতো না সে।

* * *

'গোমশতগীন ভাই! তোমার বন্ধু তো তুর্কমান থেকে পালিয়েছে।' আহার চলাকালীন সময়ে গোমশতগীনের উদ্দেশ্যে বলল শেখ সিনান। তেরেসার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, তাকে খবরটি শুনিয়ে দাও না! যৌথ বাহিনীর পরাজয় ও সাইফুদ্দীনের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদে গোমশতগীন এতোই হতাশ হলো যে, তার মুখে কোন কথাই ফুটল না। করুণ দৃষ্টিতে তাকাল তেরেসার দিকে। তেরেসা তাকে জানাল, মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কী নাটকীয়ভাবে আইয়ূবী সাইফুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছে। সাইফুদ্দীন সম্পর্কে তেরেসা বলল, আমরা সেখান থেকে আসার আগেই সাইফুদ্দীন পালিয়ে গিয়েছে।

'বন্ধুরা আমাকে বিপদে ফেলেছে, বলল গোমশতগীন। যৌথবাহিনীর কমান্ড সাইফুদ্দীনের হাতে দিতে আমি রাজি ছিলাম না। কিন্তু সহযোগিরা আমার কথা শুনলো না। জানি না এখন আমার বাহিনী কোন অবস্থায় আছে!'

'ভাল নেই। বলল তেরেসা। আইয়ূবীর ঝটিকা বাহিনী আপনার সৈন্যদেরকে নিরাপদে পালিয়ে আসার সুযোগও দেয়নি।'

'সিনান ভাই! তুমি তো জান, কি জন্যে আসলাম।'

'হ্যাঁ। জানি, আইয়ূবীকে হত্যার ব্যবস্থা করতে এসেছো।'

'যা চাও; দেবো। কিন্তু আইয়ূবীকে হত্যা করে দাও।'

'শোন! বলল শেখ সিনান। খৃস্টান নেতৃবর্গ ও সাইফুদ্দীনের কথায় আমি চার ফেদাঈ আইয়ূবীকে হত্যা করতে পাঠিয়েছি। কিন্তু মনে হয় না তারা সফল হবে।'

'যৌথ নয়, আমি তোমাকে এককভাবে দায়িত্ব দিলাম। সম্পূর্ণ খরচ আমি একা বহন করব। তুমি আমার কাছে ক'জন লোক দাও। আমি নিজে তাদের কাজ তদারকি করব।'

'যে চারজন পাঠিয়েছি, এরা আমার শেষ পুঁজি। আমার কাছে খুনীর অভাব নেই। কিন্তু আইয়ূবীকে হত্যার বেলায় আমি ব্যর্থ। তাকে আমি ভয় করি।'

'কেন? জানতে চাইলো গোমশতগীন। আইয়ূবী কি তোমাকে কোন দুর্গ দিয়ে দিয়েছে না-কি?'

'না, জবাব দিল সিনান। আইয়ূবীকে খুন করতে গিয়ে আমি ক'জন অভিজ্ঞ ফেদাঈ হারিয়েছি, আমার ফেদাঈ ঘুমের মধ্যে তাকে হামলা করেও নিজেরাই খুন হয়ে গেছে। একবার তীর চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। আমার এখন মনে হয় আইয়ূবীর উপরে আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে। তার কাছে এমন কোন শক্তি আছে, খঞ্জর, তীর কিছুই তাতে কাজ করে না। আমার গোয়েন্দারা বলেছে, যে কয়বার তার উপর আক্রমণ করা হয়েছে, আক্রমণ ভণ্ডুল করে সে ক্লান্ত হয় না, ক্ষুব্ধ হয় না বরং মুচকী হাসে। জীবন হরণকারী ঘটনাকে সে বেমালুম ভুলে যায়।'

'কত লাগবে বল সিনান? জিজ্ঞেস করল গোমশতগীন। মনে হয় তুমি আনাড়ী খুনী পাঠিয়েছিলে।'

'না, যাদের পাঠিয়েছিলাম, এরা ছিল এখানকার সেরা। এদের কোন টার্গেট কখনও ব্যর্থ হয়নি। এদের টার্গেট থেকে এ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায়নি। অবশ্য আমার কাছে উস্তাদেরও উস্তাদ আছে। কিন্তু গোমশতগীন ভাই! তোমরা বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে আইয়ূবীর কিছু করতে পারনি; আর আমি মাত্র তিন চারজন লোক পাঠিয়ে ঝুঁকি নিতে চাই না।'

'আমার মনে হয় আইয়ূবী হত্যার ব্যাপারে তোমার অনাগ্রহী হওয়ার অন্য কোন কারণ আছে!' সংশয় প্রকাশ করল গোমশতগীন।

'কারণ একটাই, আইয়ূবীর সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন বিরোধ নেই। হাসান বিন সাবাহ্ নবী হতে চেয়েছিল, আমি এসবে বিশ্বাস করি না। খুন ও হাশীশ আমার পেশা ও নেশা। আইয়ূবী আমাকে বেশী পারিশ্রমিক দিলে তোমাকেও হত্যা করতে আমার আপত্তি থাকবে না।'

'আইয়ূবী কাপুরুষের মতো কাউকে হত্যা করে না, এজন্য কোন কাপুরুষ তাকে হত্যা করতে পারবে না।' বলল লিজা।

'ওহ্! সুন্দরী, অট্টহাসিতে উল্লাসে ফেটে পড়ল সিনান। লিজাকে বোগলদাবা করে বলল, দারুণ কথা বলেছো। কাপুরুষ কখনও সুপুরুষের ক্ষতি করতে পারে না। গোমশতগীন ভাই! মালিক, সাইফুদ্দীন, তুমি আর খৃস্টানরা মিলে আইয়ূবীর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছো আইয়ূবী তোমাদের সবার প্রতিপক্ষ বলে। আসলে তোমাদের মধ্যেওতো বিশ্বাস নেই। আইয়ূবী মারা গেলেতো তোমরাই শুরু করবে পারস্পরিক সংঘাত। একথা জেনে রেখো, আইয়ূবী মরে গেলেও তার রাজত্বের এক হাতও পাবে না তোমরা। তার অনুসারী ও ভাইয়েরা বিশ্বস্ত ও নীতিবান, ওরা তার রাজত্ব আগলে রাখবে। তুমি যদি কাউকে শেষ করে ফায়দা নিতে চাও, তবে সাইফুদ্দীনকে সাফাই করে আলেপ্পো কব্জা করে ফেল। একাজটা তুমি নিজেই করতে পারবে, কারণ সাইফুদ্দীন এখন তোমার মিত্র।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল গোমশতগীন। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে বলল গোমশতগীন—ঠিক আছে সাইফুদ্দীনকেই খুন করিয়ে দাও, বল-কত লাগবে?'

'সাইফুদ্দীন হত্যার মূল্য হিরন দুর্গ', বলল সিনান।

'হু, তোমার দেমাগ ঠিক নেই সিনান! মুদ্রার হিসেবে পারিশ্রমিক চাও।'

'পারিশ্রমিক হিসেবে মুদ্রা দিতে চাইলে তোমাকে চারজন লোক দিচ্ছি, এরা আমার ফেদাঈ নয় আইয়ূবীর ঝটিকা বাহিনীর সদস্য। এই তরুণীরা এদেরকে

হাশীশ খাইয়ে পথ ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। এদের আমি কাউকে দিতে চাচ্ছিলাম না। এমন অভিজ্ঞ লোক পাওয়া কঠিন। গোমশতগীন ভাই! তুমি জানো, হাশীশ আর আমার এই পরীরা যে কোন মানুষকে এভাবে বদলে ফেলে যে নিজের মা-বাপকে সে অবলীলায় হত্যা করতে পারে। তোমাকে আমি হতাশ করতে পারি না। এদেরকে নিয়ে প্রাসাদের রাজকীয় পরিবেশে রাখো, হারেমের আরাম-আয়েশ দেখাও, আমার পরীরা এদেরকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলবে। হাশীশ, শরাব আর সুন্দরীভোগে অভ্যস্ত করে ফেলো, দেখবে, তোমার কথায় জীবন দিয়ে দেবে।'

'আইয়ূবীর সৈনিকরা তোমার কথা মতো অতো কাঁচা লোক নয়, সিনান!'

'গোমশতগীন ভাই! সে কথা আমি জানি। কিন্তু তুমি তো জানো, আমরা ফেদাঈ, মানুষের দেমাগ নিয়েই আমাদের খেলা। আমরা মানুষের মনে এমন কল্পনা ঢুকিয়ে দেই যে, কল্পনাকেই সে বাস্তব মনে করতে থাকে। কোন পুরুষের সামনে সুন্দরীদের অনুভূতি দিতে থাক, আর মদ, নেশা ও নারী সহজলভ্য করে দাও, সে কল্পনা ও অনুভূতির দাসে পরিণত হবে, মদ নারী ও ভোগ বিলাসে অভ্যস্ত করে কট্টর লোকের ঈমানও তুমি সহজে কিনে নিতে পারবে ।

এদের নিয়ে যাও তুমি। এদের ব্যবহার নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। একটু বক্র হাসি দিয়ে শেখ সিনান বলল, ভাই! ভেবে দেখ, মদ নারী ভোগবিলাস তোমাকেই কোথা থেকে কোথায় নামিয়েছে! মুসলিম খেলাফতের রক্ষক হয়েও তুমি এখন খেলাফতের সবচেয়ে বড় শত্রু।'

শেখ সিনান গোমশতগীনকে জানাল, কত মূল্য দিতে হবে তাকে.......। কথা পাকা হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত হলো, গোমশতগীন চার যোদ্ধাকে নিয়ে যাবে। সিনান বলল, এদের বন্দী না রেখে হারেমে শাহজাদাদের মতো আযাদ করে দেবে। তাতেই রাজী হল। অবশেষে দু'দিন পর এসে এদের নিয়ে যাওয়ার কথা বলে সিনানের দুর্গ ত্যাগ করল গোমশতগীন।

শেখ সিনানের কক্ষ থেকে গোমশতগীন বেরিয়ে যাওয়ার পর এক শান্ত্রী কক্ষে প্রবেশ করল। শান্ত্রী জানতে চাইল, "আজ যে চারজন লোককে আনা হয়েছে এদের ব্যাপারে হুকুম কি?"

"হিরনের গভর্নর গোমশতগীন এসেছেন। তিনি এদের নিয়ে যাবেন। এদের খাওয়া-দাওয়া, আরাম আয়েশের ব্যবস্থা কর। তাদেরকে কোথায় পাঠানো হচ্ছে, এটা যেন তারা জানতে না পারে।"

শান্ত্রী কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সে নাসের ও তার সাথীদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করল। খেতে অস্বীকার করল নাসের। ভাবল, খাবারে হয়ত আবারো হাশীশ দেয়া

হয়েছে। তাকে খুব কষ্টে বুঝানো হল যে, এই খাবারে কোন নেশাদ্রব্য দেয়া হয়নি। নাসের ও তার সাথীরা ছিল খুবই ক্ষুধার্ত। লোভনীয় খাবার সামনে দেখে তাদের পেটের ক্ষুধাটা আরো তীব্র হয়ে উঠল। পেটের জ্বালা মেটাতে খাবারে নেশা মেশানোর আশঙ্কা মেনে নিয়েই আহারে প্রবৃত্ত হল তারা।

শেখ সিনান তেরেসাকে বলল, "তুমি চলে যাও, লিজাকে আমার কাছে রেখে যাও।"

তেরেসা বলল, তিন চার দিন আমরা বিরামহীনভাবে সফর করেছি। উভয়েই খুব ক্লান্ত। এখন আমাদের বিশ্রাম দরকার। আগে বিশ্রাম করতে দিন। তারপর লিজা খুশী হয়েই আপনার কাছে চলে আসবে।

কিন্তু সিনান মানুষ নামের একটা পাষণ্ড। মানবিক মূল্যবোধ সিনানের মধ্যে ছিল না। লিজার ক্লান্তি শ্রান্তি ও দেহ মনের প্রফুল্লতার দিকে নজর দেয়ার মেজাজ সিনানের থাকবে কেন। সে প্রথমে লিজাকে উত্যক্ত করতে শুরু করল। সিনানের মানসিক অত্যাচার সে মুখ বুজে সহ্য করল তেরেসার কথায়। সিনানের কব্জা মুক্ত হওয়ার চিন্তাও করতে লাগল লিজা। কিন্তু সিনান আরো ভয়ংকর হয়ে উঠল। উন্মত্ত পশুর মতো লিজাকে খুবলে খেয়ে ফেলার মতো শুরু করল উন্মাদনা। এমন সময় হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল খাস প্রহরী। বলল, "আপনার সাথে এক লোক দেখা করতে চায়।" গর্জে উঠল সিনান। বলল, এখন কারো দেখা করার অনুমতি নেই। বল, এখন দেখা করা যাবে না।

কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আর অনুমতির তোয়াক্কা না করে খাস প্রহরীকে ঠেলে কক্ষে ঢুকে পড়ল আগন্তুক।

লোকটি এক উঁচু পদের খৃস্টান। তাকে দেখে স্মীত হেসে নাম ধরে ডাকল সিনান। বলল, বেশ বেশ, তুমি এসেছ, ভালই হলো। তবে আজ রাতে আর কথা নয়, সকালে কথা বলব। এখন মেহমান খানায় গিয়ে আরাম কর।

"হ্যাঁ, আগামী সকালেই আপনার সাথে আমি দেখা করতাম। কিন্তু এখানে এসেই শুনেছি, লিজা ও তেরেসা আপনার এখানে। এদের সাথে এক্ষুণি কথা বলা দরকার। আমি এদের নিয়ে গেলাম।"

তেরেসার কাঁধে হাত রেখে বলল সিনান, "ওকে নিয়ে যাও, আর লিজাকে নিজের কোলের দিকে টেনে বলল, ওকে আমি এখানেই রেখে দিচ্ছি।"

চোখ লাল হয়ে উঠল খৃস্টান কর্মকর্তার। বলল, "শেখ সিনান! আপনি জানেন, আমি কেন এসেছি। এই তরুণীদের কাজ সম্পর্কেও আপনি অবগত। আপনার বাহুবন্দী হয়ে থাকা এদের কাজ নয়, উভয়কেই আমি নিয়ে যাচ্ছি।" খৃস্টান কর্মকর্তা লিজা ও তেরেসার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, আমার সাথে চল।

"লাফিয়ে উঠল দুই তরুণী। উভয়েই গিয়ে দাঁড়াল খৃস্টান কর্মকর্তার পাশে।"

"তুমি কি আমার শত্রু সেজে মোকাবেলায় নামতে চাও? ক্ষোভে অপমানে চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল সিনানের। জান, মেহমানের মর্যাদা থেকে তোমাকে আমি কয়েদী বানাতে পারি। ভুলে গেছো, এখন তুমি আমার দুর্গে অবস্থান করছো? আমি তোমাকে বলছি—এই মেয়েটিকে রেখে কক্ষত্যাগ করতে পার।"

শেখ সিনান তখন নেশাগ্রস্ত। তাছাড়া সে ফেদাঈ সম্রাট। এ অঞ্চলের যে কোন রাজা বাদশাহকে সে যে কোন মুহূর্তে খুন করাতে পারে। কেউ জানতে পারবে না যে, এ হত্যাকাণ্ড শেখ সিনানের লোকেরা ঘটিয়েছে। ইতিমধ্যে সে বহু খৃস্টান অফিসার হত্যা করিয়েছে। খৃস্টানরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট শত্রুতার কারণে প্রতিপক্ষকে হত্যা করাতে শেখ সিনানের স্মরণাপন্ন হতো।

ঈসিয়াত দুর্গে থাকতো মানুষরূপী দৈত্য। দুর্গের অভ্যন্তরে মানুষ প্রবেশ করে হারিয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ফেদাঈরা উন্মাদের মতো মানুষ হত্যা করে উল্লাস করে। মানুষ খুন করা ওদের কাছে মুখের থুথু ফেলার মতো। শেখ সিনানের বালাখানাটি ছিল রঙ-বেরঙের বাহারী ফানুস দ্বারা সাজানো। মহলের ছাদ ও দেয়ালে সীসা, তামা ইত্যাদি দিয়ে কারুকার্য করা। মহলের সৌন্দর্য দেখে কেউ মনে করতে পারবে না যে, এই দুর্গের চারপাশ দুর্ধর্ষ পাশবিকতার জালে ঘেরা। দুর্গের অভ্যন্তরভাগ দেখে কারো পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয় এর বাইরে প্রাণঘাতি রুক্ষ মরু আর পাথুরে পাহাড়, পর্বত, টিলার সমাহার।

নিজের এই দুর্গে শেখ সিনান ছিল রাজা। দুর্গ রাজ্যে সে ছিল ইচ্ছাপতি। তার বিরুদ্ধাচরণ করার মতো চারপাশে কেউ ছিল না। এ কারণে দুর্গরাজ্যে শেখ সিনান নিজের সাধ-আহ্লাদ মিটাতে হেন কোন অমানবিকতা নেই যা সে অপহরণকৃত তরুণীদের উপর প্রয়োগ করতো না। তার শিষ্যরা প্রভুকে খুশী রাখার জন্যে সুকৌশলে সুন্দরী মেয়েদেরকে অপহরণ করতো। এছাড়া খৃস্টানরা ইচ্ছে করেও সুন্দরী মেয়েদেরকে পাঠাতো শেখ সিনানের মনোরঞ্জন করে তাকে বাগে রাখার জন্যে। লিজার মতো অপরূপা সুন্দরী তরুণী দেখে সিনানের ভোগবাদী পাশবিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সিনানের মতো পাকা শিকারী লিজাকে বাগে পেয়েও হাতছাড়া করার কথা ভাবতে পারে না। তার প্রমোদে বাধ সাধায় সে খৃস্টান কর্মকর্তার উপর ভীষণ ক্ষেপে গেল। খৃস্টানের উদ্দেশে বলল, "তোমাকে আমি ভেবে দেখার অবকাশ দিচ্ছি। তুমি আমার সাথে বিরোধে যেতে চাওয়ার আগে ভেবে দেখো, আমার এই দুর্গে জিনও যদি গায়েব করে ফেলা হয় তবে শয়তানও এর পাত্তা পাবে না। এই তরণীকে কিছুতেই দুর্গের বাইরে যেতে দেবো না আমি। ইচ্ছে করলে তোমাকেও দুর্গের ভিতরে লাপাত্তা করে দিতে পারি।"

"শেখ সিনান! আপনি চালে ভুল করছেন। আমার এক সাথী আগে চলে গেছে, সে জানে আমি লিজা ও তেরেসার খোঁজে এখানে এসেছি। দুই/তিন দিন এখানে থেকে পরে চলে যাবো। আপনি জানেন, আপনার সাথে সহযোগিতামূলক চুক্তির অধীনে আমরা এই দুর্ভেদ্য দুর্গ আপনাকে উপহার দিয়েছি। এটি আমাদের বিশ্রামাগার এবং বিকল্প আশ্রয় স্থল। আপনি আমার হাড়গোড় নিশ্চিহ্ন করে দিলেও আপনার কাছে জিজ্ঞেস করা হবে আমাদের দু'টি মেয়ে ও কর্মকর্তা কোথায়?

আপনি যদি আইয়ূবীকে হত্যা করাতে পারেন, তবে এমন এক ডজন মেয়ে আপনাকে দেয়া হবে। আপনি তো দীর্ঘ দিন যাবত আমাদের টাকা হজম করছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করতে পারছেন না। আমরা জানি, আপনি আইয়ূবীকে হত্যা করতে চার ফেদাঈ পাঠিয়েছেন কিন্তু আমাদের কাছে সবই ধোঁকাবাজী মনে হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আইয়ূবী এখনও জীবিত এবং সে একের পর এক বিজয় অর্জন করছে।"

"ধোঁকা নয়, আমি ঠিকই চার ফেদাঈ পাঠিয়ে দিয়েছি, দেখবে অল্প দিনের মধ্যেই আইয়ূবী খুন হয়ে যাবে। রাগে ক্ষোভে জড়ানো গলায় বলল সিনান।"

"তাই যদি হয়, তবে শুনে রাখুন, আমি নিজ থেকে আপনাকে এই লিজার চেয়েও বেশী সুন্দরী দুই তরুণী উপহার দেবো। তা ছাড়া আমাদের কর্তাদের কাছ থেকে তো আপনি বেহিসাব উপহার উপঢৌকন পাবেনই।"

"সেটা পরে দেখা যাবে। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, এই মেয়েটিকে তুমি এখন আমার কক্ষ থেকে নিয়ে যেতে পারো কিন্তু দুর্গের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। এখন তুমি একে তোমাদের জন্যে সংরক্ষিত অতিথিশালায় নিয়ে যাও। সেখানে খাও দাও, আরাম-আয়েশ কর এবং চিন্তা কর এই মেয়েকে আমার কাছে আবার ফিরিয়ে দেবে কি-না?"

কর্মকর্তা উভয় তরুণীকে নিয়ে বাইরে চলে এল। লোকটি ছিল খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের শীর্ষ অফিসার। আইয়ূবী শাসিত অঞ্চলের খোঁজ খবর নিয়ে দফতরে পৌঁছার পথে সে শেখ সিনানের দুর্গে এসেছিল। দুর্গে পৌঁছার সাথে সাথেই এক প্রহরী তাকে বলে দিয়েছিল এখানে দুই খৃস্টান তরুণী কয়েকজন শত্রু পক্ষের যোদ্ধাকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে। তারা এখন শেখ সিনানের কক্ষে রয়েছে। গোয়েন্দা কর্মকর্তা খৃস্টান মেয়েদের কথা শুনে তাদের সাথে দেখা করার জন্যে সিনানের কক্ষে ঢুকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরূপতার মুখোমুখি হয়ে পড়ে। অতঃপর পরিস্থিতি তাকে সিনানের কব্জা থেকে তরুণীদের উদ্ধারে বৈরী আচরণে বাধ্য করে। যার ফলে তরুণীদের নিয়ে সে সিনানের কক্ষ ত্যাগ করে অতিথিশালায় চলে আসে।

খৃস্টান কর্মকর্তা তরুণীদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর শেখ সিনান তার বিশ্বস্ত প্রহরীকে ডেকে নির্দেশ দিল, এই দুই তরুণী ও খৃস্টান পুরুষ আমাদের বন্দী নয়, তবে তাদের ইচ্ছে মতো যখন তখন দুর্গের বাইরে যেতে দেবে না। ওদের প্রতি এখন থেকে কড়া নজর রাখবে। আর গোমশতগীন পুনর্বার ফিরে এলে বন্দী চারজনকে নিয়ে যেতে দিবে। গোমশতগীন যখন ইচ্ছা আসতে পারবে যেতে পারবে, তার উপর কোন বিধি-নিষেধ নেই।

তরুণীদ্বয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে জানাল, শেখ সিনানের কাছে হিরনের গভর্নর গোমশতগীন এসেছিল। সে এখন বাইরে গেছে। গোমশতগীন সাইফুদ্দীনকে হত্যা করানোর পরিকল্পনা করেছে।

* * *

সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী মোজাফফর উদ্দীনের আক্রমণ প্রতিরোধে সফল ও প্রতিআক্রমণে অব্যর্থ হওয়ায় মোজাফফর উদ্দীন ময়দান ত্যাগ করে চলে গেল। কিন্তু বহু সংখ্যক শত্রুসেনার সাথে ধরা পড়ল সাইফুদ্দীনের ডান হাত ও প্রধান উজীর ফখরুদ্দীন। সুলতান অন্যান্য বন্দীদের থেকে ফখরুদ্দীনকে আলাদা করে নিজের কক্ষে এনে পরিপূর্ণ সম্মান ও মর্যাদায় রাখলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গনীমতের সম্পদ বণ্টন করার আগেই তিনি ঘোষণা করলেন, শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্বাবন করার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ ঐতিহাসিক, আইয়ূবীর এই সিদ্ধান্তকে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু গভীরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, আইয়ূবী যদি সেদিন শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্বাবনের নির্দেশ দিতেন তবে তার গোটা বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হতো, শত্রুবাহিনী তার অস্তিত্বে চরম আঘাত হানতো, হতে পারতো তার ইতিহাস সেখানেই থেমে যেতো।

মোজাফফর উদ্দীনের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সুলতানের সৈন্য বাহিনীর ব্যাপক শক্তি ক্ষয় হয়। মোজাফফর উদ্দীনের মোকাবেলায় বিজয়ের জন্যে সুলতানকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শত্রুবাহিনীকে তাড়া করতে হলে তাকে একান্ত নিরাপত্তা ইউনিটকে ব্যবহার করতে হতো। বলার অপেক্ষা রাখে না, একান্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে পাঠালে শত্রুবাহিনী এই সুযোগে তার অস্তিত্ব বিনাশে মরণ আঘাত হানতো। তা ছাড়া মুসলমানদের ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে সব সময়ই তিনি চাইতেন যাতে লোকক্ষয় কম হয়। যেহেতু বিজয় তার হয়েছে; পিছু তাড়া করে বিভ্রান্ত মুসলিম সৈন্যদের হত্যা করে খুনাখুনির সংখ্যা বৃদ্ধি করা থেকে বিরত থেকেছেন তিনি।

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী নিজের তাঁবুতে দাঁড়িয়ে সাইফুদ্দীনের আপন ভাতিজা সেনাপতি আযুদ্দীন ফররাখ শাহকে ডেকে পাঠালেন। আযুদ্দীন ছিলেন

সুলতানের সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি। সে সময়ের পরিস্থিতি ছিল ভয়ানক। আপন ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, চাচা ভাতিজার বিরুদ্ধে, মামা ভাগ্নের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আযুদ্দীনকে ডেকে সুলতান মুচকি হেসে বললেন, "এই তাঁবু তোমার চাচার। সব কিছুতো বণ্টন হয়ে গেল, চাচার উত্তরাধিকারী হিসেবে তুমি এই তাঁবু ও সমুদয় সম্পদের অধিকারী। তুমি এসব নিয়ে যেতে পার। এটি তোমারই প্রাপ্য।" সুলতানের কথায় সেনাপতি আযুদ্দীনের চোখে পানি এসে গেল।

ঐতিহাসিক কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর স্মৃতিচারণ গ্রন্থে লিখেছেন, সেনাপতি আযুদ্দীনের চোখে পানি দেখে সুলতান বললেন, আযুদ্দীন! জানি আমার প্রস্তাব ও তোমার চাচার করুণ পরিস্থিতিতে তুমি দুঃখ পেয়েছো। চাচার জন্যে তোমার দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভুলে যেয়ো না, আমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করছি মাত্র। আজ যদি আমার বিপক্ষে আমার ছেলেও দাঁড়াতো আমি তাকে রেহাই দিতাম না। জিহাদের পথে আমার আপন সন্তান বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমার তরবারী তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। জেনে রেখো, চাচার করুণ পরিণতি দেখে তোমার চোখে পানি এসে গেছে, কিন্তু এমনটা হলে আমার পুত্রের মাথা দ্বিখণ্ডিত করেও আমার চোখে পানি আসবে না।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটু সরে গিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্যে শিবির স্থাপন করলেন সুলতান। সুলতান যেখানে শিবির স্থাপন করলেন সেখান থেকে মাত্র পনের মাইল দুরে আলেপ্পোর অবস্থান। আলেপ্পো তখন মালিক আস্-সালেহ্-এর দখলে। মালিক সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করে সাইফুদ্দীন ও গোমশতগীনের সাথে জোট বেঁধেছে। জোট বাহিনীর হেড কোয়ার্টার আলেপ্পো। আলেপ্পো শহর রক্ষা প্রাচীর খুবই মজবুত। আর অধিবাসীরা লড়াকু। ইতিপূর্বে দীর্ঘ সময় অবরোধ করেও সুলতান আলেপ্পাকে দখলে নিতে পারেননি। আর এখন আলেপ্পো দখলের আগে তার নিজের বাহিনীকে মজবুত করার প্রয়োজনীয়তা বেশী। এদিকেই নজর দিলেন সুলতান।

শিবিরে থাকাকালীন সময়ে 'বোজা' ও 'নবজ' এর শাসকদের নামে সুলতান দু'টি চিঠি পাঠালেন। বোজায় পাঠালেন সেনাপতি আযুদ্দীনকে। আর ফখরুদ্দীনকে সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে 'নবজ' পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। এ কয়দিনের ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও উন্নত মানবিকতা দিয়ে সুলতান ফখরুদ্দীনকে জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি ফখরুদ্দীনকে 'নবজ'-এ বিশেষ দূত হিসেবে পাঠানোর প্রস্তাব করলেন। ফখরুদ্দীন একথা শুনে চোখ বড় বড় করে সুলতানের দিকে তাকিয়ে রইল। সুলতান ফখরুদ্দীনের বিস্ময়ভরা চাহনী দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার,

আপনি এমন করে তাকাচ্ছেন কেন? আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না? নিজেকে কি আপনি মুসলমান মনে করেন না? না নিজের ঈমানের প্রতি বিশ্বাস নেই আপনার। শুনুন, নবজ দুর্গের নিয়ন্ত্রণ আমার দরকার। এজন্য আপনাকে আমার বিশেষ দূত হিসেবে পাঠানোর চিন্তা করেছি, আমি খুনোখুনি চাই না। আপনি গিয়ে 'নবজ' এর গভর্নরকে বলবেন, খুনখারাবী না করে দুর্গ আমাদের হাতে হস্তান্তর করুক এবং তার সেনাবাহিনীকে আমাদের বাহিনীতে লীন করে দিক।

আযুদ্দীন ও ফখরুদ্দীন বিশেষ দূত হিসেবে নবজ ও বোজায় চলে গেলেন।

বোজার শাসক আযুদ্দীনকে তোপধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাল। সে সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ূবীর পয়গাম পড়ল। আইয়ূবী লিখেছেন, প্রিয় ভাই! আমরা সবাই এক আল্লাহ্, এক রাসূল ও এক কুরআনের পূজারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সবাই ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছি। বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি কখনও কিছু করতে পারে? বিচ্ছিন্ন কোন অঙ্গ কি কোন উপকারে আসতে পারে? অথচ রাসূলের ভাষায় 'আমরা সবাই একই দেহের অভিন্ন অংশ ছিলাম।' অভিন্নতা আমরা রক্ষা না করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আমাদেরকে খৃস্টানরা শকুনের মতো টুকরো টুকরো করে চিরে খাচ্ছে। উম্মতে মুসলিমা হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই একত্রিত হতে হবে। অন্যথায় শত্রুরা কাউকেই অক্ষত থাকতে দিবে না। আমি আপনাকে উম্মতে মুসলিমার অংশ হিসেবে ঐক্য স্থাপনের জন্যে দাওয়াত দিচ্ছি। কুরআনে কারীমের আহ্বান আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। আমার আহ্বান বুঝার চেষ্টা করুন এবং তদনুযায়ী কাজ করার প্রস্তুতি নিন।

আপনার প্রথম কাজ হবে ইসলামী সালতানাতের কাছে আপনার দুর্গের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করে আমার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়া। তা করলে আপনার সেনা বাহিনী আমার বাহিনীতে একীভূত করা হবে এবং আপনাকে দুর্গের অধিপতি করে দুর্গে আমাদের পতাকা উড়িয়ে দেয়া হবে। এই প্রস্তাব মানতে অস্বীকৃতি জানালে আমার সেনাদের অবরোধ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিন। আলেপ্পো, হিরন ও মৌসুলের গভর্নর ও যৌথ বাহিনীর করুণ পরিণতি গভীরভাবে দেখলে আপনার সিদ্ধান্তে পৌঁছা সহজ হবে। আমি আশা করি, আমার প্রস্তাব আপনি সাগ্রহে গ্রহণ করবেন এবং আপনার সাথে সদ্ব্যবহারের সুযোগ দিবেন। মনে রাখবেন, আপনার সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন বিরোধ নেই, আমি যা করছি সবই আল্লাহ্র হুকুম ও শরীয়তের নির্দেশ পালনার্থে করছি।

বোজার শাসক সুলতানের পত্র পাঠান্তে আযুদ্দীনের দিকে তাকালে আযুদ্দীন বললেন, 'সম্মানীত আমীর! আপনার দুর্গ অতোটা মজবুত নয়, তাছাড়া আপনার

সেনাবাহিনীও ছোট, আমি আশা করি আমাদের মোকাবেলায় যুদ্ধে নেমে আপনি আমাদের সৈন্যদের হাতে আপনার সৈন্যদের হতাহতের দিকে ঠেলে দিবেন না।'

বোজার শাসক সুলতানের প্রস্তাব মেনে নিয়ে সুলতানকে লিখিত আমন্ত্রণে দুর্গের অধিকার নেয়ার আহ্বান জানালেন।

নবজ এর শাসকও সুলতানের প্রস্তাব কবুল করে নিল। ফখরুদ্দীন তাকে দিয়ে জবাবী পয়গাম লিখিয়ে নিয়ে সুলতানের কাছে ফিরে এলেন।

সুলতান নিজে উভয় দুর্গে গিয়ে দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে দুর্গাভ্যন্তরের সৈন্যদেরকে তার সেনা শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন আর নিজস্ব সৈন্যদের একটি দলকে দুর্গাভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিলেন। সুলতান সৈন্যদেরকে দুর্গবন্দী করলেন না। আলেপ্পোর কাছেই ছিল ইজাজ নামে অপর একটি দুর্গ। ইজাজ দুর্গের অধিপতি ছিল আলেপ্পো শাসক মালিক আস-সালেহ্-এর অনুগত। সুলতান আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়ার আগে ইজাজ দুর্গের কর্তৃত্ব নিজ হাতে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আল হামীরী নামের এক সেনাপতিকে পয়গাম দিয়ে ইজাজ দুর্গপতির কাছে পাঠালেন।

বোজা ও নবজ দুর্গপতির কাছে যে ভাষায় পয়গাম লিখা হয়েছিল, সে ভাষায়ই পয়গাম পাঠানো হয়েছিল ইজাজ দুর্গপতির কাছে। ইজাজ দুর্গপতি সুলতানের পয়গাম পাঠ করে দূত আল-হামীরীর দিকে ছুঁড়ে মারল এবং বলল, "তোমার সুলতান আলেপ্পো অবরোধ করে একবার মজা দেখেছে, এবার গিয়ে বল, সাধ থাকলে ইজাজ অবরোধ করে মজা দেখুক।"

"আপনি কি মুসলমানদের খুনোখুনি পছন্দ করবেন? আমরা পরস্পর ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে হতাহত হই আর খৃস্টানরা তা দেখে মজা করুক, আপনি কি তাই পছন্দ করেন?"

"তোমার সুলতানকে গিয়ে বল খৃস্টানদের সাথে যুদ্ধ করতে, আমাদের পক্ষে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।"

"দূত আল হামীরী বললেন, আপনি কি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান না? আপনি কি খৃস্টানদের শত্রু মনে করেন না?"

"এ মুহূর্তে আমরা আইয়ূবীকেই শত্রু মনে করি। সে আমাদের হুমকি দিচ্ছে এবং তরবারীর জোরে আমাদের দুর্গ ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে" বলল দুর্গপতি। আল আমীরী বহু যুক্তিপূর্ণ কথা বলেও ইজাজ দুর্গপতিকে দুর্গ হস্তান্তরে সম্মত করাতে পারেননি। দুর্গপতি তাকে অসম্মান করে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিল।

* * *

ঈসিয়াত দুর্গে খৃস্টান কর্মকর্তা গোমশতগীনের মুখোমুখি উপবিষ্ট। তেরেসা ও লিজাও পাশে বসা। কর্মকর্তা ও গোমশতগীন পূর্ব পরিচিত। খৃস্টান কর্মকর্তা বলল, "শুনলাম, আপনি আইয়ূবীকে হত্যা করতে করতে এখন সাইফুদ্দীনকে খুন করার কথা ভাবছেন?"

"আপনি কি শুনেননি, সাইফুদ্দীন কেমন কাপুরুষের পরিচয় দিয়েছে? বলল গোমশতগীন। এই মেয়েরাই তো বলেছে, সাইফুদ্দীন আমাদের যৌথ বাহিনীকে এমন বিপর্যয়ে ঠেলে দিয়েছে যে, আমাদের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য পুনর্বার তৈরী করতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। আমি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে একত্রিত করে আলেপ্পোর বাইরেই আইয়ূবীকে রুখে দিতে চাই, কিন্তু সাইফুদ্দীন পরাজয়ের গ্লানি দূর করতে আবারো সেনাকমান্ড নিজের হাতে নিতে মরিয়া হয়ে উঠবে আর আমাদেরকে আরেকটি বিপর্যয়কর পরাজয় বরণ করতে হবে। এর চেয়ে কি তাকে ঠিকানায় পৌঁছে দেয়া দুষণীয় হবে?"

আপনি যেভাবে দেখছেন সাইফুদ্দীন আসলে অতোটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয়। বলল খৃস্টান কর্মকর্তা। আমরা যা জানি, আপনি ততোটা জানেন না। আমরা আপনার প্রত্যেকটি বন্ধু ও শত্রুকে আপনার চেয়ে বেশী জানি। এজন্যই আমরা আপনাকে উপদেষ্টা দিয়ে রেখেছি। আইয়ূবীর এলাকায় বেশভূষা বদল করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি আপনার সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি ও আপনার শাসন সংহত করার জন্যে। আমি নিজে প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে যা দেখে এসেছি, তার মর্ম কথা হলো—আপনার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি আইয়ূবী। পারলে আইয়ূবীকে আপনি খুন করিয়ে ফেলুন। নুরুদ্দীন জঙ্গী নিহত হওয়ার ফলে আপনি দুর্গপতি থেকে স্বাধীন আমীর হয়েছেন, আইয়ূবী মারা গেলে আপনার রাজ্যের সীমানা আরো বহুগুণে বেড়ে যাবে, তখন আর আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ থাকবে না। আমি শীঘ্রই ত্রিপলী যাচ্ছি। সৈন্য ও রসদের ঘাটতি যথা শীঘ্রই আমি মিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্ত্রের ব্যবস্থাও আমি করব, আপনি সাহস হারাবেন না। আইয়ূবী মরে গেলে আমরা আপনাকে অতটুকু সহযোগিতা করব যে, মালিক, সাইফুদ্দীন আপনার ধারে কাছেও ঘেষতে পারবে না। বর্তমানে আইয়ূবী যে অবস্থানে রয়েছে আপনি সেই অবস্থানে পৌঁছে যাবেন।"

ক্ষমতার মোহ আর বিলাসী জীবনের হাতছানী গোমশতগীনকে এতোটাই বিগড়ে দিয়েছিল যে, খৃস্টান কর্মকর্তা যে খৃস্টানদের স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে এই মোটা বিষয়টি অনুধাবন করার ক্ষমতাও তার ছিল না। এই কর্মকর্তা ছিল খৃস্টান গোয়েন্দা সংস্থার অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তি। সে অবস্থা সরেযমিনে প্রত্যক্ষ করে আইয়ূবীকে কিভাবে পরাস্ত ও ধ্বংস করা যায় এর কৌশল বের করার জন্যে

পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছিল। প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে আইয়ূবীর বিরুদ্ধে পরাজিত হয়ে অবশেষে খৃস্টানরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিল যে, আইয়ূবীকে খুন করানো ছাড়া তার অগ্রাভিযান রোধ করা অসম্ভব। এ জন্য মুসলিম নের্তৃবর্গের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধ তৈরী করা ছিল খৃস্টানদের অন্যতম কৌশল। খৃস্টানরা চাচ্ছিল, মুসলিম ক্ষমতালোভী নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ। আত্মকলহে লিপ্ত করে ওদের মৌল শক্তি ক্ষয়ে দিতে। এভাবে এরা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে উঠলে আইয়ূবীর মৃত্যুর পর গোটা আরব জাহানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা খৃস্টানদের জন্যে সহজ হবে।

"আইয়ূবীকে হত্যার ব্যাপারে শেখ সিনানও তো নিরাশ হয়ে পড়েছে। সে বলেছে, আরো চারজন ফেদাঈ সে আইয়ূবীকে খুন করার জন্য নিয়োগ করেছে। কিন্তু তাকে আশাবাদী মনে হলো না।" বলল গোমশতগীন।

"এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর শেখ সিনানের তো হতাশ হওয়ারই কথা। বলল খৃস্টান কর্মকর্তা। ফেদাঈরা হাশীশে নেশাগ্রস্ত হয়ে আইয়ূবী হত্যা মিশনে বের হয়। এজন্য তাদের ব্যর্থ হতে হয়। তাদেরকে বুঝতে হবে, আইয়ূবীকে হত্যা করা কোন মাতাল কিংবা অসচেতন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। আইয়ূবীকে হত্যা করতে হলে তার মতো বিচক্ষণ দূরদর্শী ও ধর্মানুরাগের লেবাস ধারণ করতে হবে। আপনি হয়তো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে বেশী বুঝেন না। আইয়ূবীকে নেশাগ্রস্ত হয়ে যারা হত্যা করতে যায় তারা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে, যখন তাদের সামনে কোন অঘটন ঘটতে শুরু করে তখন তাদের নেশা উবে যায়, আক্রমণকারীরা নিজের জীবন বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠে। এর বিপরীতে আইয়ূবীর বিরুদ্ধে যৌক্তিকভাবে উত্তেজিত ও আবেগপ্রবণ করে নেশাছাড়া কাউকে পাঠান, সে অবশ্যই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে সফল হবে।"

"শেখ সিনান আমাকে আইয়ূবীর চার যোদ্ধা দিয়েছে। বলেছে, এদেরকে তৈরী করে সাইফুদ্দীনকে হত্যা করিয়ে ফেল। কারণ এরা সাইফুদ্দীনকে শত্রু মনে করে, এজন্য এরা সাইফুদ্দীনের হত্যা মিশনে সফল হবে।"

"সাইফুদ্দীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে এদেরকে আইয়ূবীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে তৈরী করা যায় না কি? বলল খৃস্টান কর্মকর্তা। এদের উপর হাশীশ বা এ জাতীয় মাদক প্রয়োগ না করে আবেগের নেশা দিয়ে তৈরী করতে হবে।"

"এ ধরনের নেশা আপনিই তৈরী করতে পারবেন"। বলল গোমশতগীন।

খৃস্টান কর্মকর্তা তেরেসা ও লিজার দিকে তাকিয়ে মুচকী হাসল।

লিজা বলল, আমি আইয়ূবীর গোয়েন্দা দলের কমান্ডারকে তৈরী করতে পারব, আপনি অন্যদের দায়িত্ব নিন।

"ঠিক আছে, তুমি কমান্ডারকেই সামলাও। আর অন্যদেরকে তাদের অবস্থার উপরেই ছেড়ে দাও।" বলল খৃস্টান কর্মকর্তা। মানুষের স্বভাব সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, নাসের নিজেই অন্যদেরকে সামলাবে।

কর্মকর্তা বলল, 'ওরা কোথায়? এদেরকে এখানে নিয়ে এসো। নাসেরকে এবং অন্যদের কক্ষ ভিন্ন করে দাও। আর তোমরাও একটু সচেতন থেকো। সিনান লিজার উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখছে, লিজাকে সিনানের এতোই ভাল লেগেছে যে, ওকে কাছে পেতে লোকটি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছে, লিজাকে তার কাছে ছেড়ে না দিলে সে আমাকে বন্দী করে ফেলবে। লিজাকে তার কাছে ছেড়ে দেব কি দেবো না এজন্য ভাবতে আমাকে একরাত অবকাশ দিয়েছে সিনান।'

'এ ব্যাপারে আপনি চিন্তা করবেন না। শেখ সিনানের সম্মতি নিয়েই চার গোয়েন্দাকে আমি সাথে নিয়ে যাচ্ছি, আপনি এবং এই তরুণীও আমার সাথে যাবেন।' বলল গোমশতগীন।

* * *

নাসেরকে খৃস্টান কর্মকর্তার জন্যে সংরক্ষিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। নাসের সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অস্বীকৃতি জানাল। খৃস্টান কর্মকর্তা চাচ্ছিল, নাসেরকে আলাদা করে তেরেসা ও লিজাকে দিয়ে তার ব্রেইনওয়াশ করে ফেলবে।

'তুমি তো এদের কমান্ডার। তোমার তো এদের থেকে ভিন্ন থাকা দরকার।' বলল খৃস্টান কর্মকর্তা।

'আমাদের মধ্যে উঁচু নীচুর বিভেদ নেই। আমাদের সুলতান আমাদের সাথেই থাকেন। আমি তো সামান্য একজন কমান্ডার মাত্র। আমি সাথীদের থেকে আলাদা হয়ে অহংকারের অপরাধী হতে পারব না।' বলল নাসের।

'আমরা তোমাদের সম্মান করতে চাই। তোমাদের ওখানে গিয়ে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, কিন্তু এখানে আমাদেরকে আমাদের রীতি পালন করতে দাও।' বলল খৃস্টান কর্মকর্তা।

"আমাদের গোয়েন্দা ও গুপ্তবাহিনীর কমান্ডারগণ জীবিত মৃত সর্বাবস্থায়ই সহকর্মীদের সাথে থাকে। আমরা আপনাদের এখানে বন্দী এবং মৃত্যুপথযাত্রী না হলে আপনার কথা মানা যেতো। মৃত্যুমুখে আমরা সকল কষ্ট যাতনায় একে অন্যের অংশীদার হয়ে মরতে চাই। আমরা ইচ্ছা করলে একজনের জীবন বাঁচাতে তিনজনের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি।" বলল নাসের।

'তোমরা কি বন্দী দশা থেকে ফেরার হওয়ার চেষ্টা করবে?' মুচকী হেসে বলল গোমশতগীন।

'মুক্ত হওয়ার চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব। কারণ এটা আমাদের কর্তব্য। হয়তো আমরা মৃত্যুবরণ করে মুক্ত হবো, নয়তো তোমাদের হত্যা করে। আমাদেরকে যদি বন্দী করেই রাখতে চাও তবে পায়ে বেড়ী পরিয়ে দাও। দোহাই! আমাদের সাথে প্রতারণা করো না। আমরা যুদ্ধের সৈনিক, সাইফুদ্দীন ও গোমশতগীনের মতো ঈমান বিক্রেতা নই।'

'আমিই গোমশতগীন, হিরনের স্বাধীন শাসক। তোমরা আমাকে ঈমান বিক্রেতা বললে!'

'হ্যাঁ! আপনাকে আবারো আমি ঈমান বিক্রেতা বলছি। শুধু ঈমান বিক্রেতা নন, আপনি একজন বেঈমান, গাদ্দারও বটে!'

'এখন আমি ঈমান বিক্রেতাও নই, বিশ্বাসঘাতকও নই। দেখো, যুদ্ধ হচ্ছে তুর্কমানে। সেখানে সাইফুদ্দীন যুদ্ধ করছে, আর আমি এখানে তোমাদেরকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে এসেছি। আমি এখন ওদের সাথে নেই। থাকলে তোমাদেরকে এভাবে মুক্ত রাখা হতো না। আমি তোমাদেরকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তোমাদের ঠিকানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করব।'

নাসেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য অপমান হজম করে কৌশলের আশ্রয় নিল গোমশতগীন।

'বেশ, তুমি সাধারণ কমান্ডার হলেও আইয়ূবীর মতো বুকের পাটা তোমার।'

'সব ঠিক আছে। কিন্তু আমি সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। দয়া করে আমাকে এই অপরাধ করতে বাধ্য করবেন না।'

'না দোস্ত! তুমি সাথীদের সাথেই থাকো। তোমাকে আলাদা করা হবে না।' বলল খৃস্টান কর্মকর্তা।

নাসেরের সাথে গোমশতগীন ও খৃস্টান অফিসার যখন কথা বলছিল, তখন নাসেরের সাথীরা একটি বৃহদাকার কক্ষের আরামদায়ক বিছানায় বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। সেখানকার এক সেবকের কাছ থেকে নাসেরের সাথীরা জেনে নিয়েছিল দুর্গের ভিতরে এই কক্ষটির অবস্থান কোথায় এবং দুর্গের কোথায় কি রয়েছে। সেবক তাদের বলল, 'এটি একটি অতিথিশালা। বিশেষ মেহমানরা এখানে থাকে। তিন গুপ্তসৈনিক অনুভব করছিল, তাদের সাথে প্রকৃতপক্ষে বন্দীদের ব্যবহার নয় সম্মানিত অতিথিসুলভ ব্যবহারই করা হচ্ছে।'

খৃস্টান কর্মকর্তা ও গোমশতগীন দীর্ঘসময় নাসেরকে বসিয়ে রেখে নানা কথার অবতারণা করল। নাসেরকে তারা যথোপযুক্ত সমীহ ও সম্মান দেখাচ্ছিল। ফলে এদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ক্ষোভ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল নাসেরের মনে।

অপরদিকে লিজা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। দীর্ঘ আলাপচারিতার পর নাসের যখন খৃস্টান কর্মকর্তা ও গোমশতগীনের কক্ষ ত্যাগ করে তার জন্যে বরাদ্দকৃত কক্ষের দিকে এগুচ্ছে তখনও কক্ষে প্রবেশ করেনি। একটি করিডোর পেরিয়ে যাওয়ার পথে ক্ষীণ আওয়াজের একটি নারী কণ্ঠের আহ্বান ভেসে এলো তার কানে। জায়গাটি ছিল আবছা অন্ধকার। সুনির্দিষ্ট আহ্বানে ঠায় দাঁড়িয়ে গেল নাসের। একটি ছায়ামূর্তির মতো এগিয়ে এলো নাসেরের দিকে। তার বাজু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এখন তো বিশ্বাস হলো, আমি জিন নই মানুষ।" ছায়ামূর্তিটি আর কেউ নয় লিজা।

"আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না আসলে কি সব ঘটছে।"

"তোমার উদ্বেগ যথার্থ। বলল লিজা। তুমি ব্যাপারটিকে গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা কর। গোমশতগীন তোমাকে বলেই দিয়েছে, সে আইয়ূবীর বিরোধিতা ত্যাগ করেছে। এখন সে আইয়ূবীর কোন সৈনিককে বাগে পেলেও বন্দী করবে না। তুমি ও তোমার বন্ধুদের সৌভাগ্য যে, তোমরা এখানে এসে গোমশতগীনকে পেয়ে গেছো। তোমার জন্যে দ্বিতীয় সৌভাগ্য আমি। তুমি হয়তো আমাকে চরিত্রহীনা মেয়ে ভাবছো, মনে করছো আমি জাগতিক মোহে আমীর শেরিফদের মনোরঞ্জনে শরীর বৃত্তে জড়িত। আসলে তোমার এ ধারণা ভিত্তিহীন। লিজা নাসেরের হাত ধরে বলল, এসো, একটু নিরিবিলি বসে কথা বলি। এসো না...., আমি তোমার ভ্রান্ত ধারণা দূর করার চেষ্টা করব। আগে আমার কথা শোন। এরপর তোমার যা ইচ্ছা তা ভেবো। সে ব্যাপারে তুমি স্বাধীন।"

দুর্গের এ অংশটি ছিল জনশূন্য এবং নিরিবিলি। নানা গাছ-গাছালী ও ফুল-পুষ্পে সজ্জিত ছিল এ পাশটি। লিজা নানা কথাচ্ছলে নাসেরকে নিয়ে যখন আড়ালে যাচ্ছিল, খৃস্টান কর্মকর্তা ও তেরেসা তখন একটি দেয়ালের আড়াল থেকে লিজার ও নাসেরের গোপন অভিসার প্রত্যক্ষ করছিল।

"লিজা ওকে কব্জা করে ফেলেছে।" বলল কর্মকর্তা।

"মেয়েটি অতি মাত্রায় আবেগ প্রবণ। নিজের কর্তব্য ভুলে গিয়ে ওই যোদ্ধার সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করছিল সে। আমি তাকে সতর্ক করে দিয়েছি। অবশ্য সে এতোটা কাঁচাও নয়।"

"আসলে এতো অল্প বয়সে ওকে কঠিন মিশনে পাঠানো উচিৎ হয়নি। আমাদের উপস্থিতিতে সে কোন উল্টা-পাল্টা করবে না এই বিশ্বাস আমার আছে।" বলল কর্মকর্তা।

"লিজা নাসেরকে বলল, "তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, কেন আমি তোমার প্রতি এতোটা দয়ার্দ্র হয়ে উঠেছি। অবশ্য আমি তোমাকে একথা বুঝাতে

পারিনি যে, তোমার আমার মধ্যে বিরোধের দেয়াল আমাদের শাসকদের সৃষ্ট এবং জাতিগত, মূলতঃ তোমার আর আমার মধ্যে কোন শত্রুতা নেই।"

"শত্রুতা নেই বটে তবে বন্ধুত্বেরই বা কি ভিত্তি আছে?" বলল নাসের।

"লিজা একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নাসেরের কাঁধে হাত রেখে বলল, তুমি একটা পাথর। আমি জানতাম, মুসলমানের হৃদয় নাকি খুব নরম হয় কিন্তু তুমি এর ব্যতিক্রম। একটু সময়ের জন্যে এসব ধর্মানুরাগ রেখে দাও, ভুলে যাও, তুমি আর আমি ভিন্ন দু'টি গোত্রের নারী ও পুরুষ। একটু ভেবে দেখো, তুমি আর আমি মানুষ। তুমি পুরুষ আর আমি নারী। আচ্ছা, তোমার মধ্যে কি দয়ামায়া, প্রেমপ্রীতি, কোন কিছুর প্রতি আগ্রহ, কারো প্রতি অনুরাগ নেই? অবশ্যই আছে। কেননা, তুমি একজন সুঠাম পুরুষ। তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার, কিন্তু আমি নিজেকে এতোটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমি অনিয়ন্ত্রিত। তোমার মহব্বত আমার হৃদয়ে শিকড় গেড়ে বসেছে।

তোমাদেরকে হাশিশ খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে যেদিন সিনানের দুর্গে নিয়ে এসেছিলাম, সেদিন সিনান তোমাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল, এই বদমাশ বুড়োটার সাথে তেরেসা ও আমাকে অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করতে হয়েছে, তোমাদেরকে কয়েদখানার লৌহ প্রাচীরের বাইরে রাখতে। তোমাদেরকে জেলখানায় বন্দী করে ফেললে আর জীবন্ত বের হওয়া সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় তোমার মতো সুন্দর যুবকের সান্নিধ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে হতো। তুমি জেলখানায় ধুকে ধুকে মৃত্যুবরণ করো এটা আমি কিছুতেই বরদাশত করতে পারছিলাম না। বুড়োটা আমাকে প্রস্তাব করল, তুমি যদি এদেরকে জেলখানায় বন্দী করা থেকে বাঁচাতে চাও; তবে আমার শয্যাসঙ্গী হতে হবে। একথায় বুড়োটার প্রতি আমার মনে প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে গেল। আমি ওকে মুখের উপর কিছু শুনিয়ে দিলাম। এতে সে আরো ক্ষেপে গেল। বলল, হয় এরা জেলখানায় থাকবে নয়তো তুমি আমার সয্যাসঙ্গী হবে এর অন্যথা হবে না।

আমার তখন মনে হতে লাগল, যুগ যুগ ধরে তোমাকে ভালোবাসি আমি। তোমার জন্যে আমার জীবন, ইজ্জত-আব্রু সব কুরবান করে দিতেও আমার কুণ্ঠা নেই।"

"সত্যই কি আব্রু কুরবান করে দিয়েছো?" উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল নাসের।

"না, তাকে আমি নানা বাহানায় ভুলিয়ে রেখেছি। তবে সে বলেছে, তোমরা সবাই আমার দুর্গে আজাদ থাকবে বটে তবে নজরবন্দী, কখনও ইচ্ছে মতো বেরিয়ে যেতে পারবে না।"

"আমি তোমার ইজ্জত রক্ষা করবো লিজা!"

"তুমি আমার ভালোবাসা গ্রহণ করেছো?"

একথায় নাসের কোন জবাব দিল না। নাসেরকে ট্রেনিংকালে বলা হয়েছিল, ইহুদী-খৃস্টানরা মুসলিম সেনা ও উমারাদের কব্জা করতে রূপসী তরুণীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলতে লেলিয়ে দেয়। বস্তুতঃ নাসেরের কাছে ট্রেনিংকালের সেই কথা এখন তিক্ত উপদেশবাণীর মতোই রূঢ় বলে মনে হতে লাগল। কারণ, এই ধরনের নারীর ফাঁদ থেকে বাঁচার কোন বাস্তব ট্রেনিং তো আর তাকে দেয়া হয়নি এবং তা দেয়া সম্ভবও ছিল না। এখন খৃস্টান তরুণীর পাতা ফাঁদে সে ধীরে ধীরে আটকে যেতে লাগল। তার মধ্যে জেগে উঠতে শুরু করল পৌরুষিক সত্তা। তরুণীর প্রতি তার মোহ সৃষ্টি হতে লাগল। লিজার তপ্ত নিঃশ্বাস, শরীরের গন্ধ আর রেশমী চুল ও ত্বকের মোহনীয় স্পর্শ ওকে ভুলিয়ে দিতে শুরু করল সে যে একজন তেজস্বী কমান্ডার। রুক্ষ মরু, কঠিন রণক্ষেত্রে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে অভ্যস্ত সে। কিন্তু লিজার কোমল স্পর্শ, বিগলিত নিবেদন আর ডাগর চোখের কাতর চাহনী লৌহ মানব নাসেরের মধ্যেও জন্ম দিতে শুরু করল আদিম উন্মাদনা। সে অনুভব করল, শরীরের মধ্যে পৌরুষিক শিহরণ। অন্য রকম এক অনুভূতি।

বহুবার এমন হয়েছে যে, শত্রুবাহিনীর তীর ওর গা ঘেঁষে চলে গেছে। শত্রুদের বর্শার আঘাতে আহত হয়েছে অসংখ্য বার। শত্রু বাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীর বৃষ্টি, বর্শার শত আঘাতে কখনও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভয়ের উদ্রেক করেনি। কিন্তু বিধর্মী তরণীর স্পর্শ, কমনীয়তা ও যাদুমাখা কণ্ঠের মায়াবী আবেদন নাসেরের হৃদয় রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিল।

পেশাগত বহু অপারেশনে জ্বলন্ত আগুন থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে নাসের, এতটুকু দ্বিধা ও ভয় করেনি। হৃদয়ে জাগেনি সামান্যতম উৎকণ্ঠা। কিন্তু এই তরুণীর কোমল স্পর্শ তার মধ্যে যে কম্পন সৃষ্টি করেছে, তাতে তার পৌরুষিক সত্তা উতলে উঠেছে। এই কম্পন ও শিহরণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে না নাসের। অথচ যে কোন বিপদাশংকায় তার চেতনা বিদ্যুতের চেয়ে আরো দ্রুতগতিতে কাজ করে। লিজা যতোই নাসেরের ঘনিষ্ঠ হতে লাগল, নাসের ততই অনুভব করতে লাগল লিজার দূরত্ব তার মন বলছে ও যদি আরো ঘনিষ্ঠ হতো।

লিজা ছিল প্রশিক্ষিত। প্রতিপক্ষকে কিভাবে জব্দ করতে হবে দীর্ঘদিন ধরে তাকে সেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।

মরুর তৃষ্ণা নাসেরকে যতোটুকু না দুর্বল ও অবচেতন করেছিল, তরুণীর সন্নিধ্য ও স্পর্শ তার চেয়ে অনেক বেশী অবচেতন করে দিল নাসেরকে। রাত যতই বেড়ে যাচ্ছিল লিজাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে তীব্র

হয়ে উঠছিল, নাসেরের যোদ্ধাসত্তা বিলীন হয়ে সেখানে স্থান করে নিচ্ছিল এক আদিমতা। শুরুতে নাসেরের অন্তরাত্মা লিজার স্পর্শে কেঁপে উঠেছিল, নিষিদ্ধ নারীর স্পর্শে তার মধ্যে জেগে উঠেছিল ঈমানী চেতনা। কিন্তু এক্ষণে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে অন্য এক অনুভূতি, ভিন্নতর এক শিহরণ।

"হ্যাঁ, আমি তোমার ভালবাসাকে গ্রহণ করে নিয়েছি, আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল নাসের। কিন্তু এই ভালবাসার পরিণতি কি হবে? তুমি কি আমাকে একথা বলবে যে, আমি তোমার সাথে চলে যাবো? আমাকে কি একথাও বলবে যে, তুমি ধর্ম ত্যাগ করে আমাকে বিয়ে করে আমার দেশে চল?"

"এমন কোন কথা আমি এখনও ভাবিনি।" বলল লিজা। তবে তুমি যদি আমাকে জীবনের জন্য বরণ কর তাহলে আমি ধর্ম ত্যাগ করে তোমার সাথে চলে যেতে দ্বিধা করব না। তুমি আমার কাছে যতো ইচ্ছা কঠিন ত্যাগ প্রত্যাশা করতে পারো কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে নিখাদ ভালোবাসা দিবে সে কথা দাও। কৃত্রিম ভালোবাসা আমি যে কারো কাছ থেকে পেতে পারি কিন্তু তোমাকে আমার মনের মতো করে পেতে চাই।"

ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে গেল নাসের। এদিকে তখন রাত অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। তবুও নাসের লিজার সান্নিধ্য থেকে উঠার কথা ভাবতে পারছে না। লিজা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, "তুমি কক্ষে চলে যাও, এ অবস্থায় ধরা পড়লে পরিণতি ভাল হবে না।"

* * *

নাসের যখন কক্ষে প্রবেশ করল তখন তার সাথীরা ঘুমে অচেতন। শুয়ে পড়ল নাসের। কিন্তু তার চোখে ঘুম নেই। লিজা যখন শোয়ার কক্ষে প্রবেশ করল তখন তেরেসার চোখ খুলে গেল।

"এতো দেরী!" লিজাকে প্রশ্ন করল তেরেসা।

"কি বল, পাথর কি এক ফুৎকারেই মোম বানানো যায়?" বলল লিজা।

"পাথর বটে, কিন্তু তেমন শক্ত তো নয়।" বলল তেরেসা।

"ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আমারও ছিল না, তবে শেষ অস্ত্রটাও আমাকে ব্যবহার করতে হয়েছে, অবশ্য এখন সে আমার গোলাম।" বলল লিজা।

"এটা বলার দরকার নেই। তবে নিজেই মোম হয়ে গলে যেয়ো না কিন্তু।" লিজার উদ্দেশে বলল তেরেসা।

"লোক খুব সুন্দর। হাসতে হাসতে বলল লিজা। খুবই সাদামাটা লোক। আমার এমন লোককে খুব ভালো লাগে। তাই বলে আমাকে এতোটা বোকা মনে

করো না তুমি। সাদাসিধে মানুষদের আমার ভাল লাগে। হতে পারে আমার এই ভাললাগা ধুরন্ধর, প্রতারক ও বিলাসী সাইফুদ্দীনের মতো কপট লোকদের সংস্পর্শে থেকে জন্ম নিয়েছে। বিলাসীদের প্রতি আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি।"

"শেষ পর্যন্ত ওর প্রতিও বীতশ্রদ্ধই থাকা উচিত।" বলল তেরেসা। "ভালবাসার যাদুটিকে আরো মোহনীয় ও ধারালো করে নিও। মনে রাখবে, ওকে দিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু আইয়ূবীকে খুন করাতে হবে। এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।"

লিজাকে আরো অনেক পরামর্শ দিল তেরেসা। দু' চারটি অভিনব কৌশল প্রয়োগের কথাও বলল। এরপর উভয়েই শুয়ে পড়ল।

নাসেরও শুয়ে পড়েছিল কিন্তু তার চোখে ঘুম আসছিল না। একাকী লিজার প্রেম নিবেদনের ব্যাপারটিকে বিস্ময়াভিভূত হয়ে ভাবছিল, এ নিয়ে তার মনে জন্ম নিল দু'টি ধারা। ট্রেনিংকালের সতর্কবাণী মনে পড়ল তার, সাথে সাথে মনে হলো লিজা একটি আলেয়া। খৃস্টান মেয়েরা শত্রুর যাদুর কাঠি। এভাবে মায়াবী আচরণ ও প্রেমের ফাঁদ তৈরী করেই এরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে। পাশাপাশি তার মনে একথা আরো প্রবল হতে থাকল, প্রেমের ফাঁদের আশংকা যথার্থ হলেও লিজা সেই ফাঁদ নয়। লিজার প্রেম ও ভালোবাসা নিখাদ। সুন্দর সুঠাম দেহের যুবক নাসের। চেহারা অবয়বে হাজার যুবকের চেয়ে সে আকর্ষণীয়। নিজের এই সৌন্দর্যের অনুভূতি বুঝতো নাসের। নিজের সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা আর লিজার মতো রূপসী তরুণীর যাদুকরী সান্নিধ্য ও অকৃত্রিম প্রেম নিবেদন নাসেরের হৃদয়কে দুভাগ করে ফেলল। সে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না, লিজাকে প্রত্যাখ্যান করবে, না জীবনের মতো করে ভালবাসবে। এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল নাসের।

ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে এক লোক জাগিয়ে দিল নাসেরকে। লোকটি বলল, তেরেসা তোমাকে ডাকছে।

নাসের উঠে লোকটির সাথে তেরেসার কক্ষে গিয়ে তার সামনে বসল। তেরেসা বলল, "গতরাত তুমি লিজাকে নিয়ে গিয়েছিলে, না লিজা তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল, আমি সেকথা জিজ্ঞেস করব না। আমি শুধু বলতে চাই, মেয়েটি খুবই সরল সহজ। সে তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। কিন্তু আমি চাই না, তুমি লিজাকে নিয়ে রাতের পর রাত বাইরে কাটিয়ে দাও, আমি চাই লিজাকে তুমি প্রেমের অভিনয় করে বিভ্রান্ত করবে না।"

"আমি এমনটি কখনও করিনি।" জবাব দিল নাসের। "কথা বলতে বলতে অবশ্য একটু দূরে চলে গিয়ে ছিলাম।"

"আমি লিজাকে একথা বলতে পারছি না যে, তোমার প্রেমে যেন সে ডুবে ডুবে পানি না খায়। তোমাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, মেয়েটির সারল্যপনার সুযোগ নিয়ে তুমি কোন অপচেষ্টা করো না।"

"লিজাও তোমার মতই রাজকন্যা। আর আমি তোমাদের বন্দী। রাজকন্যা যদি কোন বন্দীকে মন দিয়ে বসে, তাহলে বন্দীকেই শাহজাদা মনে করে নিজেকে বন্দীর কয়েদী ভাবতে থাকে। আমি তোমাদের বন্দী। বন্দী আর শাহজাদীর মধ্যে কি প্রেম হতে পারে?"

"নারীর চরিত্র সম্পর্কে হয়তো তুমি এতোটা জানো না। শাহজাদী প্রেমের টানে গোলামের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে সকল খান্দানী সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। লিজার সাথে কথা বলেছি আমি। সে বলেছে, আমার জীবন-মরণ সবকিছু নাসেরের জন্যে। সে যদি আমাকে ধর্ম ত্যাগ করতে বলে তবে গলা থেকে ক্রুশ ছুড়ে ফেলে দেবো আমি। তুমি জানো না নাসের! তোমার প্রেমে পড়ে লিজা দুর্গপতি শেখ সিনানকে পাত্তা দেয়নি। তাকে অপমান করে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। শেখ সিনান, তোমাকে ও তোমাদের সাথীদেরকে কয়েদখানায় বন্দী করতে চেয়েছিল, কিন্তু লিজা সিনানের প্রতিপক্ষ সেজে তোমাদেরকে জেলখানায় পাঠাতে দেয়নি। শেখ সিনান লিজাকে এমন কঠিন শর্ত দিয়েছে যা একজন প্রেমিকের জন্যে খুবই অবমাননাকর। ঘটনাক্রমে আমরা যদি এই দুর্গ থেকে বের না হতে পারি তবে মহা বিপদে পড়তে হবে। আমার মনে হয় তোমাকে বাঁচাতে লিজা শেখ সিনানের শর্ত মানতেও রাজী হবে।"

"না। এমনটি হতে দেবো না আমি। প্রয়োজনে লিজার ইজ্জতের জন্যে আমি জীবন দিয়ে দেবো।"

"লিজা তোমাকে যেভাবে ভালোবাসে, তুমিও কি তাকে ততটাই ভালোবাসো?"

"মেয়ে হয়ে সে যদি তার ভালোলাগার কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ না করে তবে আমি অস্বীকার করবো কেন। আমি পুরুষ, লিজাকে আমি সত্যিই ভালোবাসি।"

"আমি শুধু এতটুকুই প্রত্যাশা করি যে তুমি মেয়েটিকে ধোঁকা দিবে না। বলল তেরেসা। আর মনে রেখো, এখন তোমরা এখানে বন্দী নও, তোমরা স্বাধীন। এছাড়া হিরনের দুর্গপতি গোমশতগীন তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে তার মেহমান মনে করেন।"

নাসেরের মনের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তেরেসার কথায় দূরে সরে গেল। তাতে লিজার প্রতি আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল। উদগ্রীব হয়ে উঠলো সে লিজার জন্যে,

লিজাকে দেখতে। তেরেসার কাছেই সে জিজ্ঞেস করে বসল, লিজা কোথায়? তেরেসা জানাল, সারারাত জেগে ছিল এখন পাশের কক্ষে ঘুমাচ্ছে। তেরেসার নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভেদী প্রমাণিত হলো। সে কৌশল করে নাসেরের মনে লিজার প্রেমকে আরো তীব্র করে দিল। তেরেসা দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞ শিকারী। পুরুষের দুর্বল মানবিক ব্যাপারগুলো তার কাছে পানির মতো পরিষ্কার, সে মানুষের মানবিক দুর্বল জায়গাগুলোকে নিয়ে খেলতে অভ্যস্ত। নাসের যখন তেরেসার কক্ষ ত্যাগ করে নিজ কক্ষের দিকে যাচ্ছিল, তখন প্রেমের হাওয়াই রথে সে ঊর্ধ্বগামী। নিজেদের কক্ষে গেলে সাথীরা তাকে জিজ্ঞেস করল, এতোক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, সব ঠিকই আছে, শীঘ্রই মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। প্রকৃতপক্ষে কমান্ডার নাসের তার কর্তব্য ভুলে লিজার প্রেমে ডুবে যেতে শুরু করল।

* * *

গোমশতগীন আর খৃস্টান কর্মকর্তা মুখোমুখি উপবিষ্ট। গোমশতগীন বলল, আমি এই তরুণীদ্বয় ও যোদ্ধাদের দু' এক দিনের মধ্যেই হিরন নিয়ে যেতে চাই। ইতোমধ্যে তাদের কক্ষে প্রবেশ করল তেরেসা। তেরেসা জানাল, এবার কমান্ডার আমাদের জালে ধরা দিয়েছে। লিজা কিভাবে এই কমান্ডারকে জয় করে নিয়েছে সবিস্তারে সব জানাল তেরেসা। তেরেসা আরো বলল, এদেরকে আইয়ূবী হত্যায় ব্যবহার করতে হবে। এখন দেখার ব্যাপার হলো আইয়ূবীর প্রশিক্ষণ বিস্মৃত হতে কত সময় লাগে।

"আমি দু'এক দিনের মধ্যেই চারজনকে হিরন নিয়ে যেতে চাই, তোমরা দু'জন কিংবা লিজা একাকী কি আমার সাথে যাবে? তেরেসার উদ্দেশ্যে বলল গোমশতগীন। আইয়ূবীকে হত্যা করতে এদের তৈরী করতে লিজার প্রয়োজন।"

"মেয়েদেরকে আমি সাথে নিয়ে যাচ্ছি।" বলল কর্মকর্তা। আমি এখানে বেশীদিন থাকতে পারছি না। শীঘ্রই কর্তাদের কাছে আমার সংবাদ পৌঁছাতে হবে যে, আলেপ্পো, হিরন ও মৌসুলের যৌথ বাহিনী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যৌথ বাহিনীর কমান্ডার সাইফুদ্দীন পালানো ছাড়া আর কিছুই করতে জানে না। আমি কর্তাদেরকে বর্তমান কৌশল পাল্টিয়ে আইয়ূবী হত্যায় নতুন কৌশলের প্রস্তাব করব। এতে এমনও হতে পারে যে, আমাদের পক্ষ থেকে আপনারা যেসব সহযোগিতা পাচ্ছেন, এখন থেকে সব বন্ধ হয়ে যাবে।"

"না, এমনটি বলবেন না।" অনুরোধের স্বরে গোমশতগীন বলল—"আমাকে আরেকটু সময় দিন। আমি অল্পদিনের মধ্যেই আইয়ূবীকে খতম করে দিব। এরপর দেখবেন, কেমন বিজয়ীবেশে দামেস্কে প্রবেশ করি আমি। এই দুই তরুণী

না হয় অন্ততঃ লিজাকে আমার কাছে রেখে যান। কারণ লিজাই পারবে এদেরকে আইয়ূবী হত্যায় প্ররোচিত করতে। কেননা, নাসের আইয়ূবীর প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। সে অনায়াসে আইয়ূবীর কাছে যেতে সক্ষম হবে। তারপক্ষেই আইয়ূবীকে হত্যা করা সম্ভব। এ ব্যাপারটিও বুঝতে হবে, লিজা ছাড়া এরা আমার কোন কাজে আসবে না।"

অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর খৃস্টান কর্মকর্তা বলল, হিরন যাওয়ার পরিবর্তে আমরা ক'দিন এখানেই অপেক্ষা করব, এখানে থেকেই মেয়েরা ওদের তৈরী করে ফেলতে পারবে। এমনও হতে পারে যে, এর মধ্যে এরা তার তিন সাথীকেও তৈরী করে ফেলবে এবং এদের মনে আইয়ূবীর ঘৃণা জন্ম দেবে।

"নাসেরকে আমার কাছে খুব আনাড়ীই মনে হলো। লিজা তাকে এমনই কব্জা করে ফেলেছে যে, আর হয়তো দুই তিনবার সাক্ষাৎ করলে সে লিজার ইশারায় নাচতে শুরু করবে।"

"আজ এদেরকে একসাথে বসিয়ে ভোজের ব্যবস্থা করো।"

খাবারের সময় হলে নাসেরও সাথীদেরকেও খাবার কক্ষে নিয়ে আসা হলো।

সাদর অভ্যর্থনা জানাল এরা নাসের ও তার সাথীদের। খাবার তাদের সামনে রাখা হয়েছে মাত্র ঠিক সেই সময়ে সিনানের বিশেষ শান্ত্রী এসে খৃস্টান কর্মকর্তাকে খবর দিল, শেখ সিনান আপনাকে জরুরী তলব করেছে। খবর পেয়ে কর্মকর্তা চলে গেল।

"সেই মেয়েটি সম্পর্কে তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো?"

"আমি চলে যাওয়ার সময় ওদেরকে সাথে নিয়ে যাবো।"

"তুমি যাওয়া পর্যন্ত মেয়ে আমার কাছে থাকবে।" বলল সিনান।

"আজই চলে যাচ্ছি আমি।"

"যাও! তবে মেয়েটিকে এখানে রেখে যেতে হবে, ওকে তুমি বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"শেখ সিনান। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো। তুমি কি জানো, আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করার কারণে এই দুর্গের প্রতিটি ইট খুলে ফেলা হতে পারে। আমাকে শাসানোর ধৃষ্টতা দেখানোর জন্যে তোমার ভয়ংকর পরিণতি বরণ করতে হবে।"

"হু! মনে হয় তোমার দেমাগ ঠিক নেই। আজ রাতে তুমি নিজে মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, তুমি চলে যাও বা থাকো, তাতে আমার নির্দেশের অন্যথা হতে পারবে না। শোন, আমার কথার ব্যতিক্রম কিছু ঘটলে তোমার ঠিকানা হবে জিন্দান খানায় আর মেয়ে থাকবে আমার কাছে। যাও! কি করবে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কর।" বলল সিনান।

* * *

খৃস্টান কর্মকর্তা খাবার ঘরে প্রবেশ করল। সবাই তার অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন। কর্মকর্তা রাগে ক্ষোভে ফুঁসছিল। ঘরে ঢুকেই সে বলল, বন্ধুরা শোন! সিনান আমাকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, আজ রাতে লিজা যে কোন মূল্যে তার কাছে থাকবে। সে আমাকে একথাও বলে দিয়েছে, আমি নিজে যাতে লিজাকে তার ঘরে পৌঁছে দিই। যদি আমি এর ব্যতিক্রম করি তবে আমাদেরকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়ে লিজাকে কব্জা করবে সে।

"আপনি জেলখানায় বন্দী হলেও আমরা তো আর মরে যাইনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে লিজাকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"কিন্তু এই মেয়ের সাথে তোমার কি সম্পর্ক নাসের? একে রক্ষার জন্যে তুমি ফ্যাসাদে জড়িয়ে যাচ্ছ কেন?" নাসেরকে জিজ্ঞেস করল তার এক সাথী।

"তোমরা নিজেদেরকে আমাদের বন্দী মনে করো না। এই বিপদ আমাদের সবার জন্যে।" বলল গোমশতগীন।

"তোমরা আমাদের নও শেখ সিনানের কয়েদী। তোমরা আমাদের সঙ্গ দাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তা কর। বেরিয়ে যেতে পারলে আমরা তোমাদের মুক্ত করে দেবো।"

"আমাকে শেখ সিনান এই চারজনকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, আমি আজই রওয়ানা হয়ে যাবো, তোমরা তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নাও। সন্ধ্যার আগেই আমি রওয়ানা হয়ে যাবো।" বলল গোমশতগীন।

গোমশতগীনের মাথা ছিল কূটচালের ভাণ্ডার। আহার পর্বেই সে সবাইকে বলে দিলো এখান থেকে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার কি পরিকল্পনা এঁটেছে সে। আহার শেষ করে তার দেহরক্ষীদের তলব করল গোমশতগীন। ওদের জানাল, সন্ধ্যার আগেই আমরা রওয়ানা হয়ে যাবো। তোমরা মালপত্র সবই বেঁধে তৈরী হয়ে নাও। গোমশতগীনের নিজের ঘোড়া ছাড়াও দীর্ঘ সফরের সামান পত্র, পানি, আহার সামগ্রী ও তাঁবু বহনের জন্যে চারটি উটও সাথে এনেছিল গোমশতগীন। ওইসব সামানপত্রের সাথে দুই তরুণী ও খৃস্টান কর্মকর্তাকেও কাপড়ে মুড়িয়ে উটের পিঠে তুলে দিল।

সবকিছু গুছিয়ে গোমশতগীন শেখ সিনানের কাছে গেল বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে। বলল, 'আমি আজ সন্ধ্যায় চলে যাচ্ছি। ওই চারবন্দীকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি। সিনানের সাথে বন্দীদের ব্যাপারে মণি-মুক্তা ও সোনা-দানার বিনিময় আগেই সুরাহা করে রেখেছিল গোমশতগীন।'

সিনান বলল, "আমি যে চার ফেদাঈকে আইয়ূবী হত্যার জন্যে পাঠিয়েছি, মনে হয় তারা কাজ সেরে তবেই ফিরবে। তুমি এই চারজনকে দিয়ে সাইফুদ্দীনকে খতম করিয়ে দিও। তোমরা মুখোমুখি যুদ্ধে পেরে উঠতে পারবে না। যতটুকু

পারো গুপ্ত হত্যার আশ্রয় নিয়ে কার্য উদ্ধার কর। আচ্ছা, তোমার খৃস্টান বন্ধু, আর ওই মেয়ে দুটো কোথায়?"

"ওরা তাদের কক্ষে আছে।" জবাব দিল গোমশতগীন।

"ওই মেয়ে দুটি সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলেনি তো?"

"হ্যাঁ, ওই অফিসার মেয়ে দুটিকে বলছিল, আজ রাত সিনানের কক্ষে যেতে হবে। ওরা আপনাকে খুব ভয় করছে মনে হলো।"

"হু, বড় বড় বীর বাহাদুরও এখানে এসে কেঁপে উঠে। হতভাগা মেয়েটিকে নিয়ে এমন করছে যে এটি যেন তার নিজের সন্তান।" বলল সিনান।

সিনানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে পড়ল গোমশতগীন। পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েই ছিল তার কাফেলা। সে অশ্বারোহণ করার সাথে সাথেই তার অগ্র-পশ্চাতে দু'জন করে দেহরক্ষী অশ্বারোহণ করল। তাদের হাতে উদ্যত বর্শা। নাসের ও তার সাথীরা দেহরক্ষীদের পিছনে, তাদের পিছনে মালপত্র বোঝাই করা উট। দুর্গের প্রধান ফটক খুলে গেল। গোমশতগীনের কাফেলা বেরিয়ে এলো দুর্গ থেকে।

ঈসিয়াত দুর্গ থেকে বেরিয়ে গোমশতগীনের কাফেলা এগিয়ে চলল আর এদিকে দিবাকর দিনের শেষ আলো বিকিরণ করে অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অল্প সময়ের মধ্যে সূর্য ডুবে গিয়ে কাফেলা ও ঈসিয়াত দুর্গের মধ্যে আঁধারের প্রাচীর টেনে দিল, এখন আর কারো চোখে ঈসিয়াত দুর্গের উঁচু খিলানগুলো নজরে পড়ছে না। বেলা ডোবার সাথে সাথেই দুর্গে সব ঝাড়বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হল। সীমানা প্রাচীরের ভিতরেও জায়গায় জায়গায় জ্বলে উঠল ফানুস। আঁধার ঘনিয়ে আসার পর শেখ সিনান একান্ত শান্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, "ঐ খ্রিস্টান বেটা মেয়েটিকে নিয়ে এখনো আসেনি?"

শান্ত্রী বলল, না আসেনি। কয়েকবার শান্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল সিনান, প্রত্যেকবারই নেতিবাচক উত্তর পেল সে। অবশেষে একান্ত সেবককে ডেকে বলল, "যাও, খ্রিস্টান বেটাকে গিয়ে বল, মেয়েটিকে নিয়ে এখনই আমার ঘরে আসতে।"

সিনানের একান্ত প্রহরী খৃস্টান কর্মকর্তা যে ঘরে থাকতো সেই ঘরে প্রবেশ করে দেখল কেউ নেই। সেখানে খৃস্টান কর্মকর্তা, দুই তরুণী কারো চিহ্ন নেই, পুরো ঘর ফাঁকা। ঘর জনশূন্য দেখে ঘরের আশে-পাশে আনাচে-কানাচে, বাগানের ঝোপঝাড় পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু খ্রিস্টান কর্মকর্তা ও তরুণী কাউকেই খুঁজে পেল না। খ্রিস্টান কর্মকর্তা ও মেয়ে দু'টোর গায়েব হওয়ার সংবাদ শুনে সিনান রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। প্রধান সেনাপতিকে ডেকে সিনান বলল, দুর্গের প্রতিটি

কোণায় কোণায় খুঁজে দেখ, যে করেই হোক মেয়ে দু'টো ও খ্রিস্টান বেটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

খ্রিস্টান কর্মকর্তা ও দুই তরুণী লাপাত্তা হওয়ার সংবাদে গোটা দুর্গে হৈ চৈ পড়ে গেল। সবাই উদ্বিগ্ন। বেটা মেয়ে দু'টো নিয়ে গেল কোথায়? রাতের অন্ধকারে শত শত মশাল দুর্গের দালান কোঠা, গলি ঘুপছি, ঝোপ-ঝাড় সব জায়গা তন্ন তন্ন করে তালাশ করল, কিন্তু তরুণী ও খ্রিস্টান কর্মকর্তার কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না। শেখ সিনান দুর্গের প্রধান গেটের দ্বাররক্ষীদের ডেকে পাঠালো, ওদের কাছে জিজ্ঞেস করল, গোমশতগীনের কাফেলা ছাড়া আর কেউ কি গত দু'একদিনের মধ্যে দুর্গ থেকে বেরিয়েছে? দ্বাররক্ষীরা জানাল-গোমশতগীনের কাফেলা ছাড়া আর কেউ এ সময়ের মধ্যে দুর্গ থেকে বের হয়নি। দ্বাররক্ষীরা গোমশতগীনের কাফেলার লোক ও বহরের বিস্তারিত বর্ণনাও জানাল।

শেখ সিনান নিজের কক্ষে রাগে ক্ষোভে ফুঁসছিল। তখন প্রায় রাতের এক প্রহর পেরিয়ে গেছে, এদিকে গোমশতগীনের কাফেলাও এগিয়ে চলছে। গোমশতগীন উট চালকদের উট থামাতে নির্দেশ দিলেন। বললেন, উটগুলো বসিয়ে ওদের বের করে ফেল, দেখো আবার মরে গেছে কি-না। উটগুলো বসিয়ে পিঠে বোঝাই করা তাঁবু খুলে বের করে আনা হলো খ্রিস্টান কর্মকর্তা, লিজা ও তেরেসাকে। ঘামে নেয়ে গেছে সবাই। ওদেরকে তাঁবু দিয়ে পেঁচিয়ে গোমশতগীন অন্যান্য মালপত্রের সাথে বেঁধে ঈসিয়াত দুর্গ থেকে লুকিয়ে নিয়ে এলো। এ মুহূর্তে ওরা ঈসিয়াত দুর্গ থেকে অনেক দূরে। তাদের ধারণা, ফেদাঈদের এ পর্যন্ত পশ্চাদ্বাবন করার আশংকা নেই। কারণ ফেদাঈরা মুখোমুখি সংঘর্ষে অনুৎসাহী। তবুও ঝুঁকি এড়াতে গোমশতগীন কাফেলার যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। তরুণীদ্বয়কে উটের উপরে চড়িয়ে দিয়ে কর্মকর্তাকে ঝটিকা বাহিনীর যোদ্ধাদের সাথে পায়দল চলতে বলা হল। দুই তরুণী ও খ্রিস্টান কর্মকর্তার ঘোড়া ঈসিয়াত দুর্গেই ছেড়ে আসতে হয়েছে। খ্রিস্টান কর্মকর্তা ছিল মুসলিম এলাকার ভাষায় দক্ষ। সে মাতৃভাষাভাষীর মতোই নাসের ও অন্যান্যদের সাথে গল্প জুড়ে দিল। এতে নাসেরের মন থেকে শঙ্কা আরো দূরে সরে গেল, সেই সাথে লিজার প্রতি টান আরো তীব্রতা পেল। নাসের চাচ্ছিল লিজার কাছাকাছি থাকতে, কিন্তু রাতের দ্বি-প্রহরের আগে আর লিজার পাশ ঘেঁষতে পারল না নাসের।

রাতের দ্বি-প্রহরে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন গোমশতগীন। থেমে গেল কাফেলা। গোমশতগীনের জন্যে স্পেশাল তাঁবু টানানো হল। আর অন্যান্যদের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন তাঁবু টানানো হল। ঝটিকা বাহিনীর যোদ্ধা ও গোমশতগীনের দেহরক্ষীরা খোলা আকাশের নীচেই শুয়ে পড়ল। সবাই ছিল ক্লান্ত। শোয়ার সাথে

সাথেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু নাসেরের চোখে ঘুম নেই। লিজাকে সে তাঁবু থেকে জাগিয়ে আনবে, না লিজা নিজেই তার কাছে চলে আসবে, এটা চিন্তা করছিল নাসের।

নাসের ভুলে গেল যে, সে আইয়ূবীর ঝটিকা বাহিনীর একজন কমান্ডার। এ মুহূর্তে হয়ত তার সহযোদ্ধারা কোন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে, তাকেও নিজ সেনাবাহিনীতে ফিরে যেতে এ মুহূর্তটি পালানোর জন্যে সুবর্ণ সুযোগ। তার সাথীরা ছিল কমান্ডারের অনুগত। তারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে, যখন প্রয়োজন বোধ করবে কমান্ডারই বলবে আমাদের কি করণীয়। পালানোর জন্যে এখানে ছিল পর্যাপ্ত আহার, পানীয়, সওয়ারীর জন্যে ঘোড়া এবং অন্যান্য আসবাব। খুব সহজেই এগুলো হাতিয়ে সাথীদের নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে নাসের কিন্তু সেদিকে নাসেরের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তার সাথীরা জানে না তাদের দলনেতা খ্রিস্টান এক তরুণীর প্রেমে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে পড়েছে সে। তারুণ্য, নারীর রূপ-জৌলুস, মোহমায়া ও প্রতারণা-প্রবঞ্চনার সর্বময় দোষণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই তরুণী নাসেরের হৃদয় দখল করে নিয়েছে।

হঠাৎ নাসেরের কাছে একটি ছায়ামূর্তির আবির্ভাব মনে হলো। ছায়ামূর্তি সন্দেহাতীতভাবে নারীর। নাসের ছায়ামূর্তির আগমন অনুভব করে শয়ন থেকে উঠে বসল এবং ধীরে ধীরে তার সাথীদের থেকে একটু দূরে সরে গেল। ছায়াটি নাসেরের কাছে এসে থেমে গেল। কাঙ্ক্ষিত শিকারকে হাত করে ছায়ামূর্তি একটু দূরে একটি টিলার আড়ালে চলে গেল। ছায়ামূর্তি আর কেউ নয়, লিজা। দু'জন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে বসে আবেগময় কথা বলতে শুরু করল। লিজাকে কাছে পেয়ে নাসের ভাবাবেগে উত্তাল। তার মুখে কথার ফুলঝুড়ি। কিন্তু লিজার মুখে কথা কম সে আবেগ প্রকাশ করছিল তার অঙ্গভঙ্গি দিয়ে। তার মুখের চেয়ে শরীরের অঙ্গই বেশী ব্যাকুলতা প্রকাশ করছিল। এক পর্যায়ে লিজা নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে নাসেরকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলতো! তোমার জীবনে কি কখনও কোন নারী আসেনি?"

"আমার মা ও বোন ছাড়া জীবনে কখনও আমি কোন নারীকে স্পর্শ করিনি।" বলল নাসের। তুমি যদি আমার জীবনের খোঁজ নাও, তবে দেখতে পাবে, যৌবনের প্রথম দিকেই আমি নূরুদ্দীন জঙ্গীর সেনাবাহিনীতে ভর্তি হই, যতটুকু আমার অতীত মনে পড়ে, যৌবনের উচ্ছল দিনগুলোতে আমি যুদ্ধ, মরুভূমি, ঝটিকা আক্রমণ আর চিতাবাঘের মতো শত্রু শিকারের খোঁজে বন-বাদার, মাঠ-ঘাট চষে বেড়িয়েছি। যখন যেখানে থেকেছি কখনও স্বীয় কর্তব্য কাজে সামান্যতম অবহেলা করিনি। কর্তব্য পালনই আমার ঈমান। একথা বলে নাসের হঠাৎ কেঁপে উঠল,

কিছুক্ষণ আনমনে কি ভেবে বলল, লিজা! সত্যি করে বলো তো, তোমরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? আমার মনে হয় তুমি আমার ঈমানকে নষ্ট করে দিচ্ছ।"

নাসেরের কথার জবাব না দিয়ে লিজা জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমাকে বলো! আমার প্রতি কি তোমার হৃদয়ে সামান্যতম ভালোবাসা আছে? না আমার রূপ দেখে তোমার মধ্যে পাশবিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে?" লিজার কণ্ঠ ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তার কণ্ঠে প্রেমভালোবাসা কিংবা ছেলেমীর কোন আভাস ছিল না। তার খুবই ভারী কণ্ঠ যেন নাসেরের কলিজা চিরে ভিতরের কথাটিও বের করে আনতে চায়।

"তুমি আমাকে বলেছিলে, তোমার ভালোবাসাকে যেন আমি অপবিত্র না করি। এজন্য আমি তোমার কাছে এটা প্রমাণ করে দেখাব, নারীসঙ্গ জীবনে না পেলেও তোমাকে পেয়ে আমি উন্মত্ত পশু হয়ে যাইনি, আমি যথার্থই তোমাকে ভালোবাসি, এ ভালোবাসায় কোন খাদ নেই। লিজা! তুমি আমাকে বলো, তোমাদের সমাজে কত শত দীপ্তপৌরুষ, বড় বড় ক্ষমতাবান, দাপটি অফিসার রয়েছে, আমার তো মনে হয় তোমার যে রূপ-জৌলুস, যে কোন বাদশার সামনে গেলেও তখ্‌ত থেকে নেমে তোমাকে স্বাগত জানাবে, এরপরও তুমি আমার মধ্যে এমন কি গুণ দেখলে যে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করছো?"

নাসেরের কথায় নিরুত্তর লিজা। নাসের লিজার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "বল লিজা! আমার কথার জবাব দাও?"

দু' হাঁটুর মাঝে মাথা লুকিয়ে ফেলল লিজা। নাসের ওকে বারবার বললেও কোন উত্তর দিচ্ছিল না। একটু পরেই কানে ভেসে এলো হেঁচকি। কাঁদছে লিজা। কেন কাঁদছে লিজা। পেরেশান হয়ে পড়ল নাসের। লিজাকে অনুনয় ভরে জিজ্ঞেস করল, লিজা! আমার কথার জবাব দাও, বল, কাঁদছো কেন? নাসের বুঝতে পারছিল না, মানবিক দুর্বলতায় তাকে যেমন কর্তব্য কর্ম থেকে বিচ্যুত করে একটি বিধর্মী তরুণীর প্রেম অন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি ভিন্নধর্মী লিজাকে তার নারীত্ব, প্রেম ও স্বচ্ছ ভালোবাসা নিজেকে নাসেরের বুকে লীন করে দিতে বাধ্য করেছে। এই দুর্বলতা এমন এক কঠিন জিনিস যে, এতে আক্রান্ত হলে রাজরানীও গোলামের পায়ে নিজেকে সঁপে দেয়, সম্পদ ও বিত্তের পাহাড়কেও ছাইভস্মের বাগাড় মনে করে ফকিরের পর্ণ কুটিরকেই রাজপ্রাসাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে রাজকন্যা।

লিজার বাহু ধরে নিজের দিকে টানল নাসের। লিজাকে কোলে তুলে নিল। লিজাও নাসেরের বুকে মাথা রেখে নিজেকে সঁপে দিল। লিজা ছিল উদ্ভিন্ন যৌবনা এক সুন্দরী তরুণী। জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতায় সে বিত্ত-বিলাসের জন্যে মোটেও লালায়িত ছিল না। লিজার জীবনে যেটির অভাব ছিল সেটি হলো, নির্ভরযোগ্য এক

সুপুরুষের নিখাদ ভালোবাসা। লিজা ছিল ভালোবাসার ভিখারীনি। ভালোবাসার নামে সে পেয়েছিল কতগুলো নারীলোভী পাষণ্ডের পাশবিকতা, যেখানে হৃদয় বলতে কিছু নেই, সাময়িক ভোগ ও স্ফূর্তিই ছিল ওইসব ক্ষমতাবান বিত্তশালীদের নেশা।

নাসেরকে দেখে ঈসিয়াত দুর্গে পৌঁছার পথিমধ্যেই লিজার হৃদয়ের শূন্যতাটুকু তীব্র হয়ে উঠল। দৈহিক সৌন্দর্য, পৌরুষ, সততা ও অকপট মানসিকতা লিজাকে এতোটাই মুগ্ধ করে ফেলেছিল যে, ঈসিয়াত দুর্গে পৌঁছানোর পর তেরেসাকে না বলেই সে আবেগতাড়িত হয়ে চলে গিয়েছিল নাসেরের কক্ষে এবং বলেছিল, "আমার উপর বিশ্বাস রাখো নাসের।" লিজার মনে তখন কোন গোয়েন্দাগিরি কাজ করেনি, একান্তই সেটি ছিল তার হৃদয়ের সুপ্ত আকুতি, মনের একান্ত চাওয়া। সেদিন যদি তেরেসা লিজাকে ডেকে না নিয়ে যেতো; তাহলে সে কতক্ষণ নাসেরের কাছে কাটাতো এবং কি বলতো বলা মুশকিল।

তেরেসা এক পর্যায়ে লিজাকে দিয়ে নাসেরকে ফাঁসানোর চিন্তা করল। কিন্তু মনে-প্রাণে লিজা মোটেও নাসেরকে গোয়েন্দা জালে ফাঁসানোর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কর্তব্যের কারণে নাসেরকে অবশ্যই সে নিজের যাদুমন্ত্রে কব্জা করতে চাইল। কর্তব্য ও হৃদয়ের টানা-পোড়েনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল লিজা। শেষ পর্যন্ত সে হৃদয়ের প্রশান্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে নাসেরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

নাসেরের জানা ছিল না, কাফেলা যখন বিশ্রামের জন্যে যাত্রা বিরতি করে তাঁবু তৈরীতে ব্যস্ত তখন গোমশতগীন লিজার কানে কানে বলেছিল, "সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন চুপি চুপি তুমি আমার তাঁবুতে এসে পড়ো। কঠিন ফন্দি করে শেখ সিনানের গ্রাস থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে এনেছি। এসো, তোমাদের নেতাদের পাঠানো স্পেশাল সরাব আছে, খুব মজা হবে।"

গোমশতগীনের প্রস্তাব শেষ হতেই খ্রিস্টান কর্মকর্তা লিজাকে ডেকে বলল, "তেরেসা ঘুমিয়ে পড়লে আমার তাঁবুতে এসে পড়বে। প্রভুর মেহেরবানীতে তুমি বুড়োটার খপ্পর থেকে বাঁচতে পেরেছো, আমার তাঁবুতে এসো, খুব সুখ দেবো।"

এসব প্রস্তাবে নিজের শরীর ও সৌন্দর্যের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল লিজার। সে কারো কথারই কোন জবাব না দিয়ে তাঁবুতে চলে গেল। তেরেসা সহসাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু লিজার চোখে ঘুম নেই। সে বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে নাসেরের দিকে রওয়ানা হল। ওদিকে নাসের তার জন্যে তৃষ্ণার্থ চাতকের মতো অধীর অপেক্ষায় নির্ঘুম প্রহর গুণছিল।

লিজা নাসেরকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় তাকে থামিয়ে দিয়ে নাসের বলল, "এই শোন! তুমি কি কোন অশ্বখুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো? মনে হয় কোন ঘোড়া ছুটানোর আওয়াজ?"

"হ্যাঁ। আওয়াজতো পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে। মনে হয় শেখ সিনান আমাদের ধাওয়া করতে সৈন্য পাঠিয়েছে, সবাইকে জাগিয়ে দেয়া দরকার।"

নাসের দৌড়ে একটি টিলার উপরে উঠে গেল। সে দূরে দেখতে পেল অনেকগুলো মশাল ঘোড়ার দৌড়ের সাথে সাথে একবার উপরে একবার নীচে নামছে। নাসের বুঝতে পারল অশ্বারোহী অনেক। দেখতে দেখতে অশ্বখুরের আওয়াজ বাড়তে লাগল। নাসের দৌড়ে টিলার উপর থেকে নীচে নেমে এল। তাঁবুর কাছে এসে সবাইকে জাগিয়ে দিল। সে তার সহযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে টিলার কাছে চলে গেল। লিজাকে নিজের কাছে রাখল নাসের। বিপদের আশংকায় সবাই বর্শা ও তরবারী হাতে নিয়ে মোকাবেলার জন্যে তৈরী হয়ে গেল।

* * *

সিনানের প্রেরিত ফেদাঈ ছিল পনেরো ষোল জন। তন্মধ্যে সাতজনের হাতে মশাল। এরা এসেই সবাইকে ঘিরে ফেলল। ওদের একজন হুংকার ছেড়ে বলল, "উভয় মেয়েকে আমাদের হাতে দিয়ে দাও, শেখ সিনানের নির্দেশ—মেয়েদের দিয়ে দিলে সবাইকে নির্বিঘ্নে ছেড়ে দেয়া হবে।"

নাসের ছিল অভিজ্ঞ লড়াকু। সহযোদ্ধাদেরকে আগেই টিলার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল সে। ইশারা করল সাথীদের। অমনি সবাই এক সাথে ফেদাঈদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাসেরের সাথীরা বর্শার আঘাতে কয়েক ফেদাঈকে ধরাশায়ী করে ফেলল। নাসের সাথীদের উদ্দেশে চীৎকার দিয়ে বলল, "ওদের ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যাও।" নাসের নিজেও ওদের একটি ঘোড়া ধরে তাতে সওয়ার হয়ে লিজাকে তার পিছনে তুলে নিল। বলল, খুব শক্ত করে আমার কোমড়ে ধরে রাখো, খেয়াল করো পা যাতে আটকে না যায়। সিনানের ফেদাঈরা মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা হাতের মশালগুলো ফেলে দিয়েছিল। নাসের ও তার সহযোদ্ধারা মরণপণ মোকাবেলা করল। একটি ঘোড়া দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। পালিয়ে যাওয়া অশ্বারোহী ছিল গোমশতগীন। সে ছিল খুবই ধূর্ত ও চালাক। অবস্থা বেগতিক দেখেই পালিয়ে গেল। ফেদাঈরা নাসেরের ঘোড়ার উপরে লিজাকে দেখে ফেলেছিল। তারা চাচ্ছিল মেয়েটিকে জীবিত কব্জা করতে। তিন-চারজন অশ্বারোহী নাসেরকে ঘিরে বর্শা দিয়ে তার ঘোড়াকে আহত করার জন্যে আঘাত হানছিল। নাসের রণাঙ্গনের চিতা। সে বেষ্টনীর মধ্যেও নিজের

ঘোড়ার দেহ অক্ষত রেখে দুই ফেদাঈকে ধরাশায়ী করল। তাকে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া দৌড়াতে হলো; সেই সাথে চকিতে মোড় নিতে হলো। লিজা এমতাবস্থায় নিজেকে সামলাতে পারছিল না। তার পা পাদানী থেকে খসে পড়েছিল, এক পর্যায়ে দ্রুতবেগে ঘোড়ার মোড় নেয়ায় লিজা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।

লিজাকে পড়ে যেতে দেখে ফেদাইরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ওকে ধরে ফেলল। নাসের খুব দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে ওদের আঘাত করতে চাইলে ওরা নাসেরের আঘাতের মুখে লিজাকে সামনে ধরে দিল। এতে হতোদ্যম হয়ে গেল নাসের। এক পর্যায়ে নাসেরও নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। ঘোড়া থেকে নেমে নাসের দেখল তার আশেপাশে নিজেদের কেউ নেই। ঘেরাও এর মধ্যে নিজের ঘোড়া ও লিজাকে সামলাতে গিয়ে সাথীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার সুযোগ পায়নি সে। নাসের কয়েকবার ফেদাঈদের আঘাত হানল কিন্তু প্রতিবারই তার আঘাত রোধ করতে ফেদাঈরা লিজাকে সামনে ধরে দিল। অবশেষে জীবন বাজী রেখে শুরু করল ওদের সাথে বর্শাযুদ্ধ। একাকী চারজনের সাথে মোকাবেলা করতে গিয়ে নিজেও জখম হল কিন্তু ততক্ষণে আরো দুই ফেদাঈ কপোকাত। নাসেরকে আহত হতে দেখে লিজা চীৎকার শুরু করে দিল, "নাসের! তুমি চলে যাও, ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে, আমার জন্যে তোমার জীবনটা নষ্ট করো না নাসের, প্রভুর দোহাই! তুমি চলে যাও নাসের! তুমি একাকী এদের সাথে পারবে না, চলে যাও।" কিন্তু নাসের মরিয়া হয়ে উঠল লিজাকে বাঁচাতে। এদিকে লিজাও সমানতালে চিৎকার করতে থাকল। এক পর্যায়ে নাসের চিৎকার করে বলল, "চুপ কর লিজা! ওরা তোমাকে কখনও নিয়ে যেতে পারবে না।"

হ্যাঁ। নিজের সংকল্প বাস্তবে প্রমাণ করে দেখাল নাসের। সব ফেদাঈকে মারাত্মকভাবে আহত করে দূরে সরিয়ে দিল নাসের। শেষ পর্যায়ে ওর সামনে দাঁড়ানোর মতো আর কেউ রইল না। ময়দান ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর একটি ঘোড়াকে ধরে সেটিতে লিজাকে বসিয়ে নাসের চড়ে বসল তার পিছনে। খুব দ্রুত ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। যেখানটায় তাদের তাঁবু ছিল সেখানে এসে দেখে ময়দান একেবারেই ফাঁকা। কেউ নেই, সবই লাশ। কয়েকজন ফেদাঈ মারাত্মক আহত হয়ে মরণযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, আর তার সাথীরা লড়াই করে সবাই মৃত্যুবরণ করেছে। খ্রিস্টান কর্মকর্তাও নিহত হয়েছে কিন্তু তেরেসাকে কোথাও দেখা গেল না। সেখানে বেশীক্ষণ না দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল নাসের। রাতের শেষ প্রহরের শুকতারা মিটিমিটি জ্বলছে। দিক ঠিক করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল নাসের। অনেক দূর এসে ঘোড়া থামাল সে।

"লিজা! এখন বল, কোথায় যেতে চাও তুমি? তোমাকে একাকী পেয়ে তোমার অসহায়ত্বের সুযোগে আমি তোমার উপর নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাই না। তুমি যদি বল, তোমার এলাকায় পৌঁছে দিতে, আমি মোটেও কুণ্ঠাবোধ করব না। কারণ তুমি এখন আমার কাছে পবিত্র আমানত। এটা করতে গিয়ে আমি কারাবরণ করতেও দ্বিধা করব না।"

"তোমার সাথে আমাকে নিয়ে চল নাসের! তোমার আশ্রয়ে আমাকে নিয়ে নাও।" বলল লিজা। বাকী রাত একটানা ঘোড়া হাঁকাল নাসের। ভোরের আলো পূর্বাকাশে উঁকি দিলে অন্ধকার কেটে যেতেই এলাকা পরিচিত মনে হলো। এ এলাকাতেই নাসের একবার তার দল নিয়ে ঝটিকা অভিযানে এসেছিল। এখানে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ী টিলা আর গিরিখাদ রয়েছে। যেতে যেতে নাসের একটি পাহাড়ী ঝর্ণার কাছে চলে এল। ঝর্ণাটি ছিল পাহাড়ের ঢালে। উভয়েই ঘোড়া থেকে নেমে প্রাণ ভরে ঝর্ণার পানি পান করল এবং ঘোড়াকেও পানি পান করাল। নাসেরের পরিধেয় কাপড় রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরে অসংখ্য জখম। কিন্তু ততক্ষণে জখম থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। নাসের ক্ষতস্থানগুলো ধুয়ে দেখল জখমগুলো বেশী গভীর নয়। আবার রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে এই আশংকায় ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করল না। লিজা পানি পান করে টলতে টলতে একটু দূরে টিলার পিছন দিকে চলে গেল। ঝর্ণা থেকে উঠে নাসের ওকে খুঁজে বের করল। দূরে গিয়ে একটি বড় পাথরের উপরে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল লিজা। নাসেরের দিকে তার পিঠ। লিজার সামনে অনেকগুলো মৃত মানুষের হাড়গোড়। মাথা, খুলি, বুকের পাঁজর, হাত পায়ের হাড় যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত। গোটা শরীরের কঙ্কালও রয়েছে কয়েকটি। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি তরবারী, বর্শাও পড়ে রয়েছে।

মাথার একটি খুলি লিজার সামনে। সম্ভবত কোন মেয়ে মানুষের মাথার খুলি হবে সেটি। মুখের হাড়ের সাথে একটু একটু চামড়াও শুকিয়ে রয়েছে। মাথার খুলির সাথে দীর্ঘ কয়েক গাছি চুল। এটি নিঃসন্দেহে নারীর কঙ্কাল। উরুতে বর্শা বিদ্ধ। গলার সোনার হাড়টি এখনও আটকে রয়েছে। কঙ্কালের চারপাশে রেশমী কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো। নাসের পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে লিজার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। লিজা একমনে নারী কঙ্কালে মগ্ন। হঠাৎ দু'হাত কানে চেপে বিকট চিৎকার মারল লিজা এবং চকিতে মুখ ঘুরিয়ে উঠে পড়ল। খপ করে ওকে ধরে ফেলল নাসের। জড়িয়ে নিল বুকে। কাঁপতে শুরু করল লিজার শরীর। নাসের ওকে পাঁজাকোলা করে ঝর্ণার ধারে নিয়ে এল।

* * *

মাথায় পানি দিয়ে দীর্ঘ সময় শুইয়ে রাখার পর লিজা যখন স্বাভাবিক হলো তখন নাসের জিজ্ঞেস করল, "তুমি চিৎকার করেছিলে কেন?"

"হায়! আমি আমার জীবনের করুণ পরিণতি দেখতে পাচ্ছিলাম।" খুবই বিষণ্ন কণ্ঠে বলল লিজা। সম্ভবত তুমি কঙ্কালটি দেখে থাকবে। সেটি আমার মতোই কোন নারীর। সম্ভবত সেও আমার মতো রূপ সৌন্দর্যের যাদু ব্যবহার করতো, হয়তো যে কোন পুরুষকে সে রূপের ফাঁদে ফেলে নাকানী চুবানী দিতে পারতো, হয়তো সেই নারী ভাবতো, তার রূপ জৌলুস কখনও নিঃশেষ হবার নয়, সে চির সজীব হয়ে চিরদিন একইভাবে থাকবে। তুমি কঙ্কালটির উরুতে বিদ্ধ খঞ্জর দেখেছ? গলায় সোনার হার দেখেছো? এই খঞ্জর আর এই সোনার হার যে উপাখ্যানের কথা বলে; সেটি আমারই জীবনালেখ্য। অন্য যে সব কঙ্কাল ও বর্শা তরবারী পড়ে রয়েছে তা শত সহস্রবার শোনা গল্পেরই প্রতিবিম্ব। এসব গল্প কখনও আমি গভীরভাবে অনুধাবন করিনি। কিন্তু আজ এই নারী কঙ্কাল দেখে আমার মনে হয়েছে; এ যেন আমারই মাথার খুলি, আমারই কঙ্কাল। এই শুকনো কঙ্কালে আমার শরীরের রক্ত মাংস সংযোজন করা হলে আমারই রূপ প্রতিফলিত হবে। আমি যেন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একদল বুনো শকুন খুবলে খুবলে খাওয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি করছে। একটি শকুন যেন আমার অক্ষি কোঠর থেকে চোখের মণি ঠোকর দিয়ে বের করে নিচ্ছে। একটি হায়েনাকে দেখলাম আমার তুলতুলে গোলাপী গণ্ডদ্বয়ের মসৃণ গোশ্‌ত খুবলে নিচ্ছে, চিবুচ্ছে। জঙ্গলী জীব-জন্তুরা আমার শরীরের সবকিছু লুটে নেয়ার পর কঙ্কালটি পড়ে রয়েছে। আমার মনে হলো, কঙ্কালের বিকশিত ভয়ানক দাঁতগুলো আমাকে ভর্ৎসনা করে বলছে, "দেখো, দেখো, এই হবে তোমার পরিণতি। মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন কোন ভয়ঙ্কর জন্তু মুখ গহ্বরে নিয়ে আয়েশে চিবুতে শুরু করেছে।"

"লিজা! আর ক'দিন পর ওখানে গিয়ে দেখবে ফিদাঈ, তোমার সাথী ও অন্যান্যদেরও একই অবস্থা। হ্যাঁ, ওখানেও একই দৃশ্যের জন্ম হবে। মরদেহের কঙ্কাল, মাথার খুপরি, বর্শা, তরবারী, সবই ওখানে পাওয়া যাবে। ওখানেও হয়তো তুমি তেরেসার কঙ্কালে খঞ্জর বিদ্ধ দেখতে পারো, এরা যেমন নারীর জন্যে মরেছে, ওরাও নারীর জন্যই ধ্বংস হয়েছে।" বলল নাসের।

"হ্যাঁ, তাই ঠিক নাসের। বলল লিজা। আমি যদি আমার পেশা ত্যাগ না করি তাহলে আমাকেও এদের মতো করুণ পরিণতির শিকার হতে হবে। এমন মরু প্রান্তরে একদিন আমার এই সোনার দেহ নিয়ে শিয়াল শকুনে কাড়াকাড়ি করবে। আজ আমার দেহ পাওয়ার জন্যে যারা আমাকে আদর-সোহাগ ও মাল-দৌলত পেশ

করে ওরাই এক সময় আমাকে হত্যায় প্রবৃত্ত হবে। নাসের! দুঃখের বিষয় মানুষ নিজ চোখে এসব করুণ পরিণতি দেখেও শিক্ষা নেয় না। মানুষ দেখে না, কত লোক বিত্ত, দৌলত, ক্ষমতা আর রূপ-যশের অহংকার অহমিকায় ধ্বংস হয়েছে। নাসের! আমি আত্মপরিচয় জেনে গেছি, আমি দেখে ফেলেছি আমার পরিণতি। নাসের! তুমিও শুনে রাখো, খোদা তোমাকে দিয়েছে সুপৌরুষ ও সুন্দর চেহারা। আমার বিশ্বাস; যে কোন বোদ্ধা নারী তোমাকে দেখলে একান্তে পাওয়ার লোভ করবে। এমতাবস্থায় তোমারও একই পরিণতি বরণ করতে হবে। ওই বর্শা, তরবারী আর নরকঙ্কালগুলো দেখে নাও। ওগুলোতে দেখতে পাবে তোমার মতো পুরুষেরও করুণ পরিণতি।"

লিজা এভাবে কথা বলছিল যেন জিনে ধরেছে তাকে। সে দুনিয়াত্যাগী দরবেশের মতো গুরু-গম্ভীরভাবে এসব কথা বলছিল, যেন জীবনের যাবতীয় চাকচিক্য ধোঁকা প্রতারণার পরিণতি দিব্য চোখে দেখছে সে, আসলে নিজের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির স্বরূপ তার চোখে উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল।

"নাসের! আমার আসল পরিচয় আজ আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি।" বলল লিজা। আমি তোমাকে দেখাব আমার রূপ ও জৌলুসের বৈশিষ্ট্য। সে তার বুকে একটা থাপ্পর মেরে নীরব হয়ে গেল। সে তার গলার সোনার হারটি একটানে ছিঁড়ে হাতের মুঠোয় নিল এবং ঝর্ণার স্রোতে ছুঁড়ে দিল। হাতের আঙুল থেকে হীরার আংটি খুলে পানিতে নিক্ষেপ করল। বলতে লাগল, "আমিও এক মহা ধোঁকা, মায়াবিনী মোহমায়া নাসের। আমিও তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছিলাম।

তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের টান থাকলেও আমার কর্তব্যের ভূত আমার ঘাড় থেকে কখনও নামেনি। ফেদাঈদের হামলা আমার চোখ খুলে দিয়েছে এবং এসব নরকঙ্কাল আমার চোখের সামনে কঠোর বাস্তবকে উন্মোচন করে দিয়েছে, আমি নিজের চোখেই আমার মৃত্যু আর লাশ দেখতে পাচ্ছি। এই দৃশ্যের মুখোমুখি না হলে আমি জানতাম না, যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে তোমার ভাগ্যে কি জুটতো। আর আমার ভালোবাসা, আমার প্রেমেরই বা কি পরিণতি ঘটতো। নাসের, কঠিন ধোঁকার শিকার হয়ে পড়েছিলে তুমি। এখন তোমাকে সব সত্য ঘটনা বলে দিচ্ছি, আমি এই আশায় তোমার সাথে প্রেমের ভান করছিলাম যে, তোমাকে আমার প্রেমের ফাঁদে ফেলে তোমাকে দিয়েই আইয়ূবীকে হত্যা করাব। গোমশতগীন আইয়ূবীকে খুন করানোর জন্যে ভাড়াটে খুনী আনার জন্যে শেখ সিনানের দুর্গে গিয়েছিল। সিনান বলেছিল, আইয়ূবীকে হত্যা করার জন্যে খ্রিস্টানদের সাথে কৃত চুক্তি মতো সে চার ফেদাঈ পাঠিয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত সে চারজন আইয়ূবী হত্যা মিশনে কাজ করছে। এরা যদি আবারও ব্যর্থ হয় তবে সে

আর কোন ফেদাঈকে আইয়ূবী হত্যার জন্য পাঠাবে না। কারণ সে নাকি আইয়ূবী হত্যা মিশনে অনেক ফেদাঈ হারিয়েছে। এক পর্যায়ে আমাদের কর্মকর্তা সেই দুর্গে এসে পড়ল। গোমশতগীন আইয়ূবী হত্যার জন্যে সহযোগিতা চাইলে সিনান বলল, আইয়ূবীকে হত্যা করতে তোমরা পারবে না, আমরা আইয়ূবীর ঝটিকা বাহিনীর চার যোদ্ধা তোমাকে দিচ্ছি, এদের তৈরী করে সাইফুদ্দীনকে খুন করিয়ে ফেল, তাহলে তোমার একচ্ছত্র আধিপত্য আরো সম্প্রসারিত হবে। কিন্তু আমাদের অফিসার গোমশতগীনকে বলল, সাইফুদ্দীন কোন জরুরী ব্যাপার নয়, আপনার জন্যে জরুরী হলো আইয়ূবীকে হত্যা করা। এজন্যে আইয়ূবীর চার যোদ্ধাকে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত হলো, আমি যাতে তোমাকে আমার প্রেমের ফাঁদে ফেলে আইয়ূবী হত্যায় তৈরী করে নিই।"

"আমি বেঁচে থাকতে আইয়ূবীর দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাব তাও আমার পক্ষে অসম্ভব লিজা।" বলল নাসের। দুনিয়ার এমন যাদু, এমন কোন শক্তি নেই যে, আমাকে এতোটা বিভ্রান্ত করে ফেলবে।"

হাসল লিজা। বলল, "আমি মনেপ্রাণে কখনও এ মিশনকে গ্রহণ করিনি। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই, আমরা কঠিন পাথরকেও পানি বানাতে পারি।" এরপর লিজা তার অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত সব জানাল। বলল, "সাইফুদ্দীনের কাছে কতদিন কিভাবে কাটিয়েছে সে। সব শেষে নাসেরের কাছে জানতে চাইল, এতো পাপ-পঙ্কিলতা জানার পরও কি তুমি আমাকে গ্রহণ করবে? আমি... আমি এখন খাঁটি মনে ইসলামে দীক্ষিত হতে চাই নাসের!"

"তুমি যদি খাঁটি মনে ইসলাম গ্রহণ করে অতীত জীবনের জন্যে তওবা কর তাহলে তোমাকে গ্রহণ না করা হবে আমার জন্যে পাপ। তবে সুলতান আইয়ূবীর অনুমতি ছাড়া এ ব্যাপারে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। বলল নাসের। আরও বলল, অতীতের সব গ্লানি সব দুশ্চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দাও। তুমি যদি ভবিষ্যতে সুন্দর জীবনের আগ্রহী হও, তাহলে আমাদের ধর্মই একমাত্র তোমাকে কাঙ্ক্ষিত সুন্দর পুতঃপবিত্র জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে। আচ্ছা লিজা! তুমি কি জান, যে চার ফেদাঈ সুলতানকে খুন করতে তৎপর, এরা কোন বেশে গেছে এবং এরা কিভাবে সুলতানকে আক্রমণ করবে?"

"এর বেশী কিছু আমি জানি না।" জবাব দিল লিজা। আমার সামনে এর বেশী কিছু বলা হয়নি।

"আমার এখন উড়াল দিয়ে তুর্কমান পৌছা দরকার। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এ ব্যাপারে সুলতানের দেহরক্ষী ও সুলতানকে সতর্ক করা জরুরী।"

লিজাকে সামনে বসিয়ে নিজে ওর পিছনে চড়ে ঘোড়া হাঁকাল নাসের। পরীর মতো সুন্দরী রূপসী একটি তরুণীর আগুনঝরা শরীর ওর বুকের সাথে লেপ্টে রয়েছে, ওর সোনালী রেশমী চুল উড়ে এসে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু নাসেরের মধ্যে লিজার কোনই প্রভাব নেই। তার মন এখন শুধু সুলতান আইয়ূবীর নিরাপত্তা চিন্তায় বিভোর। যে কোনভাবে তুর্কমান পৌছানোই তার লক্ষ্য। তার দৈহিক উত্তেজনা, শিহরণ সব কিছুই লীন হয়ে গেছে সুলতানের জীবনাশঙ্কায়। কর্তব্যের অনুভূতি নিজের প্রেমকে দূর করে দিয়েছে। সে একজন যোদ্ধা হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। ফিরে পেয়েছে সে পূর্বের সেই গেরিলা কমান্ডারের সত্তা। শুধু যে নাসেরের এই পরিবর্তন তা নয়, লিজাও বদলে গেছে সম্পূর্ণরূপে। সে আর আগের মতো মায়াবিনী গোয়েন্দা তরুণী যাদুরাণী নয়, সে যে এক সুঠাম যুবকের বাহুবন্ধনে তার ইচ্ছার পুতুল, বিন্দুমাত্র তার মধ্যে সেই অনুভূতি নেই, নেই তারুণ্যের জৈবিক শিহরণ। সে যে এক তরুণী আর নাসেরের মতো এক টগবগে যুবকের বাহু বন্ধনে একই ঘোড়ায় আরোহী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লিজার। লিজার দৃঢ় বিশ্বাস, পাপ-পঙ্কিল জীবন ত্যাগ করে পুতঃপবিত্র জীবনের দিকে যাচ্ছি আমি, সেই জীবন দিতে পারে ইসলাম এবং নাসেরের মতো যুবকরাই সেই পবিত্র জীবনের প্রতীক। অতঃপর কদর্য ও অসুন্দরের কোন গন্ধ নেই তাদের স্পর্শ ও অবস্থানে যদিও তারা একই অশ্বপৃষ্ঠের আরোহী।

* * *

বোজা ও নবজ দুর্গের দুর্গপতিরা সুলতানের দূতের কাছে আত্মসমর্পণ করে দুর্গের অধিকার আইয়ূবীর হাতে তুলে দিয়েছিল। আইয়ূবী দুর্গের সৈন্যদেরকে তাঁর সেনাবাহিনীতে আত্মীকরণ করে দুর্গের মধ্যে বিশ্বস্ত একদল সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দুর্গের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করলেন। কিন্তু ইজাজ দুর্গের দুর্গপতির ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ ও ঔদ্ধত্য সুলতানকে আগ্নেয়গিরির মতো ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল। তিনি ইজাজ ও আলেপ্পোর দিকে অগ্রাভিযানের পরিকল্পনা করছিলেন। বরাবরের মতো অগ্রাভিযানের আগেই তিনি অগ্রবর্তী গোয়েন্দা ইউনিট পাঠিয়ে দুর্গের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি জানার ব্যবস্থা করলেন। গোয়েন্দাদের বলে দিলেন কিভাবে আলেপ্পো ও ইজাজ দুর্গকে কব্জা করতে হবে এ ব্যাপারে সার্বিক পরিস্থিতি তোমরা ভালোভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে আসবে। গোয়েন্দারা ইতিমধ্যে আলেপ্পো ও ইজাজ দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ রিপোর্ট সুলতানকে জানিয়ে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সুলতান নিজেই ইপ্সিত লক্ষ্যবস্তুকে জানার জন্যে নিজেই সেখানকার ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়তেন। এ সময় তিনি বডিগার্ড ও সরকারী পাতাকাবাহীদের সাথে নিতেন না। লাল রঙের

মধ্যে সাদা ডোরাকাটা তার একান্ত ঘোড়াও তিনি ব্যবহার করতেন না। কেননা, তার একান্ত ঘোড়াটিকে শত্রুবাহিনীর কমান্ডার চিনতো। বডিগার্ড ও সরকারী ঝাণ্ডাবাহীদের নিয়ে গেলে তো ব্যাপারটি আর গোপন রাখার উপায় ছিল না।

সুলতানকে অনুরোধ করা হয়েছিল, নিরাপত্তা বাহিনী ছাড়া তিনি যেন কখনও একাকী কোথাও না যান। কিন্তু তিনি জীবনে কখনও নিজের নিরাপত্তার পরোয়া করতেন না। আর এ মুহূর্তে তার মন মেজাজ ছিল খুবই উত্তপ্ত। শত্রুদেরকে তিনি যেমন নাকানী-চুবানী খাইয়েছেন, শত্রুরাও তাঁর বাহিনীর অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছে। যার ফলে শত্রুদের চূড়ান্ত আঘাত করতে তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন অতি অল্প সময়ে ঘরের শত্রু বিভীষণদের খতম করে আসল শত্রুদের মোকাবেলায় ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হতে।

এ অঞ্চলটি ছিল ঘন টিলা ও ঝোঁপ ঝাড়ে ভরা মাটিও পাথুরে। জায়গায় জায়গায় আবার গভীর গিরিখাদ। এসব এলাকায় একাকী বের হওয়া ছিল সুলতান আইয়ূবীর জন্যে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। একদিন কিছুটা ঝাঁঝালো কণ্ঠেই প্রধান সেনাপতি হাসান বিন আব্দুল্লাহ তাকে বললেন, 'সুলতান মুহতারাম! আল্লাহ্ না করুন, কোন শত্রুদের প্রাণঘাতি হামলা যদি সফল হয়ে যায়, তবে ইসলামী সালতানাত আপনার মতো দ্বিতীয় কোন সুলতান জন্ম দিতে সক্ষম হবে না। আর জাতির কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আপনার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থতার জন্যে আমাদের কবরেও ভর্ৎসনা করে আমাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করবে।

"আল্লাহ্ যদি আমার মৃত্যু কোন ফেদাঈ কিংবা খৃস্টান গুপ্তচরের হাতেই লিখে থাকেন তবে তা-কি আমি রুখতে পারব?" বাদশা যখন নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন আর সে জাতির ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিধানের যোগ্য থাকে না। নিহত হওয়াই যদি আমার বিধিলিপি হয়ে থাকে তাহলে তো আমার কর্তব্য কাজটি সেরে ফেলার জন্যে তোমাদের উচিত আমাকে সুযোগ দেয়া। নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে আমাকে বন্দী করে রেখো না। আমার মনের মধ্যে রাজা বাদশাহের মতো রাজত্বের মোহ সৃষ্টি করো না। তোমরা তো জানো, কতবার আত্মঘাতি আক্রমণ হয়েছে আমার উপর, আল্লাহ্ প্রত্যেকবারই আমাকে হেফাযত করেছেন। এবারও সেই আল্লাহই হেফাযত করবেন। তিনিই সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা দাতা!

সুলতান আইয়ূবীর একান্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে সব সময়ই উদ্বিগ্ন। কারণ ইতিপূর্বে সুলতানের উপর অনেকগুলো প্রাণঘাতি আক্রমণ হয়েছে। দেখা গেছে, প্রতি মারণাঘাতের সময়ই সুলতান ছিলেন একাকী এবং তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীদের অবস্থান ছিল আশেপাশে। বেশীরভাগ আক্রমণ নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত

পরিস্থিতি নিজেদের আয়ত্বে এনে ঘাতকদের কাবু করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর থেকেই সুলতান তাঁর একান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের আশেপাশে রেখে নিজে হারিয়ে যেতেন। এদিকে প্রধান সেনাপতি হাসান বিন আব্দুল্লাহ দূর থেকে সব সময় সুলতানকে নজরে রাখার জন্যে একটি চৌকস সেনা ইউনিট গঠন করেছিলেন। যাদের দায়িত্ব ছিল সুলতানের অজ্ঞাতেই তাঁরা সুলতানের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁর উপর নজরদারী রাখবে। যাতে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সূত্রপাত না ঘটতে পারে।

কিন্তু কেউ জানতো না, দীর্ঘদিন ধরেই চার ঘাতক ফেদাঈ সুলতানকে হত্যার উদ্দেশে মরুভূমিতে অহর্নিশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য আইয়ূবীকে খুন করা।

এরাই ছিল সেই ফেদাঈ যাদের সম্পর্কে ঈসিয়াত দুর্গপতি শেখ সিনান গোমশতগীনকে বলেছিল। এই চার খুনী ফেদাঈর পরিকল্পনা ছিল যুদ্ধ কবলিত এলাকার বিপন্ন মানুষের বেশে আইয়ূবীর সংস্পর্শে গিয়ে তাকে খুন করবে। কিন্তু তাদের সেই পরিকল্পনার কোনই প্রয়োজন হলো না। এরা দেখল সুলতান আইয়ূবী কোন নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই মরুভূমিকে একাকী ঘুরে বেড়ান। এটা ছিল ফেদাঈদের জন্যে দারুণ সুযোগ। শিকার না চাইতেই হাতের নাগালে এগিয়ে আসছে। কিন্তু ফেদাঈদের অসুবিধা ছিল তীর ধনুকের অপ্রাপ্তি। মাত্র একটি তীর ও ধনুক থাকলেই তারা দূর থেকেই আইয়ূবীকে নিশানা করতে পারতো, কিন্তু তাদের পক্ষে তীর ধনুক বহন করা সম্ভব ছিল না। কারণ এতে আইয়ূবীর ভ্রাম্যমান গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা ছিল। ফলে বড় ধরনের ছোড়া ও খঞ্জরই ছিল ফেদাঈদের প্রধান হাতিয়ার।

* * *

এদিকে লিজাকে ঘোড়ায় বসিয়ে নাসের উল্কার বেগে ঘোড়া দৌড়াল। লিজা তাকে বলে দিয়েছিল চার ফেদাঈ সুলতানকে খুন করার জন্যে অনেক দিন থেকে চেষ্টারত রয়েছে। নাসেরের একমাত্র লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে দ্রুত পৌঁছে সুলতানের বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে প্রধান সেনাপতিকে অবহিত করবে। কিন্তু নাসের চাইলেও তার পক্ষে খুব বেশী দ্রুত পৌছা সম্ভব ছিল না। একেতো তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অনেক দূর, তাছাড়া একই ঘোড়ায় দু'জন আরোহী। তাকে বাধ্য হয়েই পথে থামতে হয়েছে, ঘোড়াকে দানাপানি খাইয়ে বিশ্রাম দিতে হয়েছে।

ঘটনাক্রমে নিরাপত্তার ব্যাপারটিকে গুরুত্ব না দিয়ে সুলতান আইয়ূবী একাকী ময়দানে চলে এলেন। চার ফেদাঈ সুলতানকে একাকী ঘুরতে দেখে পরিকল্পনা

বাস্তবায়নে টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। এই এলাকাটি ছিল সেনাবাহিনীর অবস্থান থেকে অনেক দূরে বিজন প্রান্তরে। আশেপাশে কোথাও লোকালয় ছিল না। এই বিজন প্রান্তরেই মরু-শিয়ালের মতো শিকারের খোঁজে থাকত ফেদাঈরা। ময়দানেই রাত কাটাতো, সুলতানকে সুযোগ মত পাওয়ার অপেক্ষায় ফেদাঈরা সুযোগের জন্যে প্রহরা গুনতো।

এদিকে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর নাসের লিজাকে নিয়ে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে। কিন্তু ঘোড়ার চাল বলে দিচ্ছে, তার দ্রুত চলার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে আসছে। নাসের ঘোড়ার বোঝা হাল্কা করতে এক লাফে মাটিতে নেমে লাগাম হাতে নিয়ে পায়দল চলতে শুরু করল। রাত বাড়তে লাগল নাসেরের সেদিকে খেয়াল নেই। লিজা তাকে বারংবার জানান দিচ্ছে; ঘোড়ার পিঠে আর বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর হাড়গুলোও ব্যথায় চুরচুর হয়ে গেছে। নাসের নিজেও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। তারও শরীর অবসন্ন কিন্তু তবুও যাত্রা বিরতি করেনি সে। সে লিজাকে বলল, "লিজা! তোমার আর আমার জীবনের চেয়ে সুলতানের জীবন অনেক বেশী দামী। আমার বিলম্বের কারণে যদি সুলতানের কিছু হয়ে যায় তবে আমি মনে করব আমিই সুলতানের হন্তারক।"

* * *

রাত শেষ হয়ে পূর্বাকাশে সূর্য যখন উঁকি দিচ্ছে নাসের তখন আর হাঁটতে পারছে না। পা টেনে হেঁচড়ে হেঁচড়ে এগুচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে লিজা। ঘোড়া নিতান্তই ধীরগতিতে হাঁটছিল। এক জায়গায় ঘাস ও পানি দেখে থেমে গেল ঘোড়া। লিজা ঘোড়ার পিঠ থেকে মাথা তুলে বলল, "আল্লাহ্‌র দোহাই নাসের! এটাকে আর তুমি টানা-হেঁচড়া করো না, একটু ঘাস পানি খেতে দাও।"

ঘোড়া পানি পান করে নেয়ার পর নাসের সেটির লাগাম ধরে আবার চলতে শুরু করল। ঘোড়া আর দৌড়াতে পারছিল না। নাসের নিজেও হাঁটতে অক্ষম হওয়ায় ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হল। লিজার দুধে-আলতা চেহারা নীল হয়ে গেছে। তার মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছে না।

নাসেরের জানা ছিল না সুলতান এখন কোথায়? সুলতান তখন তুর্কমান ত্যাগ করে আরো অনেক সামনে অগ্রসর হয়েছেন; এমনকি তুর্কমানের পর কুহে সুলতান পেরিয়ে তিনি আরো সামনে চলে গেছেন। নাসেরের সামনে তখন আদিগন্ত তুর্কমান ময়দান। সে ভেবে কুল পায় না কিভাবে এই বিশাল ময়দান পাড়ি দেবে। সূর্য তখন মাথার উপরে উঠে গেছে।

* * *

সুলতান আইয়ূবী তার একান্ত কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে একটি বিজন পাথুরে টিলাময় প্রান্তরের পরিস্থিতি পরখ করার কাজে ব্যস্ত। একান্ত কর্মকর্তাকে এক জায়গায় রুখে দিয়ে তিনি একাকী হারিয়ে গেলেন। একটি টিলার উপরে উঠে তিনি চারদিক পর্যবেক্ষণ করছেন, সুলতান হয়তো তার সেনাদলের অগ্রাভিযানের কৌশল নির্ধারণের চিন্তায় ছিলেন, আর এদিকে সেই টিলার আড়ালেই লুকিয়ে থেকে সুলতানের গতিবিধি দেখছিল চার ফেদাঈ।

"মোক্ষম সুযোগ। এই সুযোগ আর হাত ছাড়া করা যায় না।"

"নীচে আসতে দাও!" সাথীকে এই বলে থামল এক ফেদাঈ।

"তাঁর নিরাপত্তা বাহিনী হয়তো কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে।"

"যাই হোক, আজ আর তাকে যেতে দেবো না।" বলল অপর এক ফেদাঈ।

"শুধু একজন যাবে।" বলল ওদের দলনেতা। পিছন দিক থেকে আঘাত করতে হবে। প্রয়োজন পড়লে অন্যেরাও শরীক হবে।"

সুলতান আইয়ূবী টিলার উপর থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়ে অন্যদিকে রওয়ানা হলেন। ফেদাঈ পিছনে পিছনে এগুতে লাগলো। কারণ সুলতানকে আঘাত করার মতো উপযোগী ছিল না জায়গাটি। সুলতান আবার ঘোড়া থেকে নেমে একটি টিলার উপরে উঠে গেলেন। একটু পড়েই টিলার উপর থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে লাগলেন। ফেদাঈরা তাঁর কাছেই লুকিয়ে ছিল, এরা এবার সুযোগ মনে করে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। সুলতান অশ্বারোহণ করে ময়দানের দিকে যাওয়ার ইচ্ছায় অশ্বপৃষ্ঠে উঠতে যাবেন, ঠিক এ সময় তাঁর কানে কারো দৌড়ানোর পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। ঘাড় ফেরাতে ফেরাতে এক ফেদাঈ এক ফুট দীর্ঘ একটি খঞ্জর হাতে নিয়ে সুলতানের অবস্থান থেকে তিনচার হাত কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আইয়ূবী তাকে দেখে ফেললেন।

দ্রুত তার খঞ্জর বের করে ফেললেন সুলতান। ফেদাঈ আঘাত হানল সুলতান তার হাতলে নিজের হাতল ঠেকিয়ে আঘাত রুখতে চাইলেন, কিন্তু ফেদাঈ ছিল ভীষণ শক্তিশালী, সে বাধা ঠেকিয়ে পুনরায় আঘাত হানতে উদ্যত হলো, কিন্তু এর আগেই সুলতান ফেদাঈকে আঘাত করলেন কিন্তু আঘাত রুখে দিল সে। টিলার ওপাশ থেকে তখন বেরিয়ে এল আরেক ফেদাঈ। এসে সুলতানকে পিছন দিক থেকে আঘাত করল। সুলতান সেই আঘাতও রুখে দিলেন কিন্তু তার বাজুর চামড়ায় আঁচড় লাগল। একাধিক আক্রমণকারীর আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সুলতান ঘোড়াকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। এক ফেদাঈ ঘুরে আঘাত করতে গেলে বাম হাতে ওর নাকের উপর দশাসই একটি ঘুষি বসিয়ে দিলে ওর মুখ থুবড়ে রক্ত

পড়তে শুরু করল। সুলতান ওর পেটে খঞ্জরটি বসিয়ে দ্রুত বেগে বের করে ফেললেন। সেই সাথে ওকে লাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন। এরপর ফেদাঈ ছটফট করতে করতে মারা গেল।

অপর ফেদাঈও সুলতানের পিছন দিক থেকে আঘাত হানল। কিন্তু পূর্বের মতই এই আঘাতও সুলতান রুখে দিলেন। তবে ফেদাঈর খঞ্জরের মাথা সুলতানের উরুতে লেগে উরু কিছুটা কেটে গেল। আঘাতটি তেমন মারাত্মক ছিল না বটে কিন্তু ইতিমধ্যে টিলার আড়াল থেকে আরো দুই ফেদাঈ দৃশ্যমান হল। এমন সময় অশ্বখুরের আওয়াজ শোনা গেল। মুহূর্তের মধ্যে ফেদাঈদের ঘিরে ফেলল অশ্বারোহীরা। পালাতে চেষ্টা করল ফেদাঈরা কিন্তু অশ্বারোহীদের ক্ষীপ্ত আক্রমণে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়েই এক ফেদাঈ মরে গেল, আরেকজনকে তরবারীর আঘাতে মাথা উড়িয়ে দিল অশ্বারোহীরা। সুলতান অশ্বারোহীদের চিৎকার করে বললেন, ওদের হত্যা করো না, জীবন্ত ধরতে চেষ্টা কর। সুলতানের নির্দেশে পলায়নপর চতুর্থ ফেদাঈকে জীবন্ত ধরে আনল আবু আব্দুল্লাহ্‌র নিয়োগকৃত বিশেষ নিরাপত্তা-রক্ষীরা।

আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে সেদিনের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলেন সুলতান। সুলতানের নিরাপত্তা রক্ষীদের একজন অনতিদূরের একটি টিলার উপর থেকে ভাগ্যক্রমে দেখে ফেলেছিল সুলতানের উপর ফেদাঈদের আক্রমণ। সেই সাথে সাথীদের প্রতি ইঙ্গিত করা মাত্র বিদ্যুৎগতিতে তারা এসে রুখে দেয় ফেদাঈদের। অন্যথায় সেদিনের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার দৃশ্যতঃ কোন উপায় ছিল না। হয়ত আইয়ূবীর ইতিহাস সেখানেই থেকে যেতো।

১১৬৭ সালের মে মাস মোতাবেক ৫৭১ হিজরী সনের যিলকদ মাসে সুলতানের উপর ফেদাঈদের এই আক্রমণ হয়েছিল। ধৃত ফেদাঈকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায়, "ঈসিয়াত দুর্গ থেকে আমরা চারজন এসেছিলাম।" হাসান বিন আব্দুল্লাহ্ ফেদাঈকে জেরা করে ঈসিয়াত দুর্গ ও হাশিশ সম্রাট শেখ সিনানের আদ্যোপান্ত জেনে নিয়েছিলেন। হাসান বিন আব্দুল্লাহ্ ঈসিয়াত দুর্গের অবস্থা, অবস্থান, শক্তি ও সৈন্য সংখ্যার ব্যাপারেও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে সুলতানকে অবহিত করলেন।

সুলতান আইয়ূবী শেখ সিনানের অপকর্ম ও ধ্বংসাত্মক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার পর বললেন, "আগামী রাতের শেষ প্রহরে আমরা ঈসিয়াত দুর্গের দিকে অভিযান শুরু করব।" সকল সেনাধ্যক্ষ ও কমান্ডারদের তলব করে প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন সুলতান। ফেদাঈদের এই আখড়া উৎখাত করা বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে। এটাকে কব্জা করে আমাদের কাজে ব্যবহার করতে হবে। এক তৃতীয়াংশ সেনাই যথেষ্ট হবে। তিনি সেনাপাতিদের অভিযানের কৌশল কি হবে তাও বলে দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় সুলতানকে খবর দেয়া হলো, নাসের এক ঝটিকা বাহিনীর সদস্য দীর্ঘদিন পর ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যেই হাসান বিন আব্দুল্লাহ্‌র কাছে নাসের তার ইতিবৃত্ত জানিয়েছে। দীর্ঘ বিরামহীন সফর, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও আগুনে পোড়া মরুতাপে নাসেরের অবস্থা খুবই করুণ, লিজাও তাঁর সাথে। এমতাবস্থায়ই সুলতানের সাথে তাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন গোয়েন্দা প্রধান। লিজার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। মৃতপ্রায় সে। চোখ কোটরে দেবে গেছে। রোদে পুড়ে সোনালী চেহারা তামাটে হয়ে গেছে। চেষ্টা করেও কথা উচ্চারণ করতে পারছে না। তবুও ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হল সুলতান সকাশে। নাসের সুলতানকে তাদের হারিয়ে যাওয়া থেকে এখানে আসা পর্যন্ত আদিঅন্ত বিস্তারিত জানাল। লিজার আগমন ও তাঁর মনে লিজার প্রেম ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও জানাল সুলতানকে।

সব শুনে সুলতান লিজার উদ্দেশে বললেন, তুমি আযাদ। তোমার ব্যাপারে তোমারই ইচ্ছা কার্যকর করা হবে। লিজা সম্ভবত নিজেকে কয়েদী ভাবছিল। কয়েদখানার পরিণতির জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করছিল লিজা। কিন্তু খোদ সুলতানের মুখে তাঁর স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঘোষণা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমি জীবনের জন্যে নাসেরের সেবিকা হিসেবেই থাকতে চাই। লিজাকে জানান হলো, "এ মুহূর্তে তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর সান্নিধ্যে দামেস্কে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এরপর সময় ও সুযোগ মত নাসের তার সাথে সাক্ষাৎ করবে।"

হাসান বিন আব্দুল্লাহ ছিলেন সুলতানের গোয়েন্দা প্রধান। তিনি সব সময় এ ধরনের তরুণীদের পর্যবেক্ষণের জন্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার অধীনে রেখে গোপনভাবে ওদের খোঁজ খবর নিতেন। পর্যবেক্ষণের পর তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। নাসেরকে সেদিন সেনা ছাউনীতে চিকিৎসার জন্য বলা হলো। চিকিৎসকদের নির্দেশ দেয়া হলো দ্রুত সুস্থতা লাভের জন্য নাসেরের চিকিৎসার প্রতি সবিশেষ যত্ন গ্রহণ করা হোক।

* * *

গোমশতগীনের প্রতারণা ও ইপ্সিত লিজাকে না পেয়ে শেখ সিনান চরম ক্ষুব্ধ। কেউ তার পাশে ঘেষার সাহস পাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় মাত্র দু'জন ফেদাঈ যখন তেরেসাকে বন্দী করে দুর্গে ফিরে গেল তখন শেখ সিনানের ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। তার চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি বেরুতে শুরু করল। তেরেসাকে জিন্দান খানায় বন্দী করে নির্মম শাস্তি দিতে শুরু করল সিনান। তেরেসাও কম

সুন্দরী ছিল না। কিন্তু শেখ সিনানের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল লিজার প্রতি। লিজাকে উদ্ধার করতে পারেনি ফেদাঈরা। নাসের ওকে ওদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে নিয়ে গেল।

এর ক'দিন পর ঈসিয়াত দুর্গের বহিঃদেয়ালের উপরে পাহারাদার সৈন্যরা দেখতে পেল বিশাল ধুলিঝড়ের মতো কি যেন এগিয়ে আসছে, কিন্তু তখন ধুলি ঝড়ের কোন আলামতই ছিল না। তাদের বুঝতে বাকী রইল না কোন অভিযাত্রীদল আসছে এদিকে। দেখতে দেখতে ধুলিঝড় আরো এগিয়ে এল। দৃশ্যমান হতে লাগল অশ্বারোহী বাহিনী। সম্ভাব্য বিপদাশঙ্কা করে যুদ্ধডঙ্কা বাজিয়ে দিল প্রহরীরা। দ্রুত খবর দেয়া হল শেখ সিনানকে। একটু পরেই দেখা গেল হাজার হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী এগিয়ে আসছে দুর্গের দিকে।

অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য দুর্গের উঁচু মিনারে চরে বাইরের দিকে তাকাল সিনান। ততক্ষণে সুলতানের বাহিনী বৃত্তাকারে দুর্গ অবরোধের জন্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। মিনার থেকে মোকাবেলার নির্দেশ দিল সিনান। ফেদাঈ তীরন্দাজরা সীমানা প্রাচীরের উপরে উঠে নিজের মতো করে অবস্থান নিল। কিন্তু আক্রমণ শুরু করল না। তারা প্রতিপক্ষের অবস্থা ও আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করল।

সুলতানের বাহিনী দুর্গাভ্যন্তরের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। হাসান বিন আলী ফেদাঈর কাছ থেকেই দুর্গের অবস্থা জেনে নিয়েছিলেন, তদুপরি নাসেরের প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনায় তিনি দুর্গাভ্যন্তর সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়েছিলেন। দুর্গ অবরোধের সময় নাসেরও তাঁদের সাথে এসে যোগ দিল। নাসের তাদের বুঝিয়ে দিল দুর্গের কোথায় কি রয়েছে। নাসেরের কথা মত শেখ সিনানের প্রাসাদে আঘাত হানার জন্যে দু'টি "মিনজানিক" (পাথর উৎক্ষেপণ যন্ত্র, যা সেই যুগের সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত ছিল) স্থাপন করা হল। মিনজানিক থেকে শেখ সিনানের প্রাসাদে নিক্ষেপ করা হল ভারী পাথর। প্রথম আঘাতেই প্রাসাদের ছাদের কতটুকু ভেঙে গেল। দুর্গপতির প্রাসাদে শুরু হয়ে গেল আর্তচিৎকার।

মিনজানিকের আক্রমণ শুরু হতেই দুর্গের দিক থেকে শুরু হল তীর বৃষ্টি। মিনজানিক চালকদের কয়েকজনকে ফেদাঈরা ধরাশায়ী করে ফেলল। ফেদাঈদের তীর বৃষ্টিতে মিনজানিক চালানো কঠিন হয়ে উঠলে পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্বে আনতে তেল ভর্তি মাটির পাত্র নিক্ষেপ করা হলো। মাটির তেল ভর্তি পাত্রগুলো মিনজানিকের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে তেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে শুরু করল। সেই সাথে ছোড়া হলো আগুনবাহী তীর। কিন্তু নিক্ষিপ্ত তেলে তীরবাহী আগুন ধরানোর ব্যাপারটি সহজ ছিল না। উঁচু পাচিল টপকে তীর চালাতে না পারায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে অগ্নিবাহী তীর নিক্ষেপ সম্ভব হচ্ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল দুর্গের

ভিতরে পাচিলের কাছেই এক জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়ার উৎস লক্ষ্য করে তেলবাহী পাত্র নিক্ষেপ করলে সাথে সাথে সেই তেলে আগুন জ্বলে উঠল। দেখতে দেখতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল সিনানের প্রাসাদে। শুরু হল বিকট চিৎকার চেচামেচি। অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে শেখ সিনানের বেশী সময় লাগল না। প্রাসাদে আগুন ধরে গেলে দুর্গের ভিতর থেকে সে সাদা পতাকা উড়িয়ে শান্তির পয়গাম জানাল।

শেখ সিনান জানতো, আইয়ূবী কিংবা খৃস্টান বাহিনীর মতো তার সেনারা সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করে অভ্যস্থ নয়। তাছাড়া নেশাকে পেশা হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে নিজেরাও নেশাসক্ত হয়ে পড়েছিল। অধিকাংশই নেশায় চুরচুর। এদের দ্বারা আইয়ূবীর বাহিনীর সাথে মোকাবেলা একেবারেই অসম্ভব। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করা হবে সমূলে ধ্বংস হওয়ার নামান্তর। এরচেয়ে পরাজয় স্বীকার করে নেয়াই শ্রেয়।

সাদা পতাকা উড়তে দেখে সুলতান যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিলেন। চতুর্দিকে নেমে এল পিনপতন নীরবতা।

কতক্ষণ পর দুর্গের প্রধান ফটক পেরিয়ে কয়েকজন উর্ধতন সেনাকর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে শেখ সিনান বেরিয়ে এল। সুলতান প্রথানুযায়ী শেখ সিনানকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে যাননি। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে শেখ সিনান ছিল অমার্জনীয় অপরাধে শাস্তিযোগ্য অপরাধী। সিনান ও তার কর্মকর্তারা যখন সুলতানের কাছে এলো তখন তিনি এদের বসার জন্যও বলেননি, দাঁড়ানো অবস্থায় রেখেই বললেন,

"সিনান! তুমি আমার কাছে কি প্রত্যাশা কর?"

"প্রাণভিক্ষা, মহামান্য সুলতান!" পরাজিতের কণ্ঠে বলল সিনান।

"দুর্গের কি হবে?" জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"আপনার ফয়সালাই আমি মাথা পেতে মেনে নেবো সুলতান।"

"যত তাড়াতাড়ি পার তোমার সৈন্য সামন্ত লোক লস্কর নিয়ে দুর্গ ত্যাগ কর। শুধু জীবন নিয়ে যাবে তোমরা; তোমার সৈন্যরা কোন অস্ত্র সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। আর কেউই কোন জিনিসপত্র আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পারবে না। খালি হাতে দুর্গ ত্যাগ করতে হবে। আর মনে রেখো, ইসলামী সালতানাতের সীমা অতিক্রম করার আগে কোথাও থামবে না। তোমার প্রভু খৃস্টানদের কাছে গিয়ে থামবে। এ কথাও শুনে যাও, যে চার ফেদাঈকে তুমি আমাকে খুন করার জন্যে পাঠিয়ে ছিলে ওরা সবাই নিহত হয়েছে। তবুও তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। শান্তি পতাকা তুমি উড়িয়েছো। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে তোমার শান্তি প্রস্তাবকে আমি সম্মান করলাম, কিন্তু তোমাকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করবেন কি-না বলা মুশকিল। মনে রেখো, এখন থেকে নিজেদেরকে আর মুসলমান বলে পরিচয় দিবে না।

আবারো যদি নিজেদের মুসলমান দাবী করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছো জানতে পারি, তবে রোম সাগরে তোমার চেলাপেলাসহ সবাইকে ডুবিয়ে মারব।"

বেলা যখন পশ্চিম আকাশের তলদেশে তলিয়ে যেতে উপক্রম তখন দীর্ঘ সারি বেধে ফেদাঈরা পরাজয়ে মাথা নীচু করে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্গ ছেড়ে। শেখ সিনান সেই সারির প্রথম ভাগে। তার শীর্ষ কর্মকর্তা মহলের নারী, নর্তকী, সেবিকা ও পেশাদার খুনীদের নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে।

রিক্ত নিরস্ত্র সিনান ও সিনানের সকল সৈন্য শান্ত্রী। বেলা ডোবার আগেই সুলতানের বাহিনী দুর্গের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করল। জেলখানায় সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া হল। দুর্গ থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা-দানা, হিরা-মুক্তা, উট, ঘোড়া ও আসবাবপত্র সুলতানের হস্তগত হল।

* * *

ঈসিয়াত দুর্গের দায়িত্ব একজন সেনাপতির হাতে দিয়ে রাতেই আইয়ূবী সুলতান পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি খুব দ্রুতই ইজাজ দুর্গ দখলে নিয়ে ফিলিস্তিনের দিকে অভিযান পরিচালনার জন্যে উদগ্রীব ছিলেন। ক'দিনের মধ্যেই তিনি ইজাজ দুর্গ অবরোধ করলেন। ইজাজ দুর্গকে আলেপ্পোর শাসকরা নানাভাবে আরো বেশী দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছিল। ইজাজ দুর্গের সৈন্যরা ছিল অক্লান্ত। সাইফুদ্দীনের যৌথ বাহিনীকে ইজাজ দুর্গের সৈন্যরা অংশগ্রহণ করেনি।

সুলতান আইয়ূবী ঈসিয়াত দুর্গের মতো এতোটা সহজে ইজাজ দুর্গও দখল করে নিতে পারবেন এমন আশা তাঁর ছিল না। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, ইজাজ দুর্গ অবরোধ করলে আলেপ্পোর সৈন্য পিছন দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। তাই আলেপ্পোর যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধের পূর্বপ্রস্তুতির ব্যবস্থাও তিনি নিয়ে রেখেছিলেন। অবশ্য আলেপ্পোর বাহিনী তুর্কমানে পরপর পরাজিত হয়ে সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।

ইজাজ দুর্গের সৈন্যরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সুলতানের বাহিনীকে মোকাবেলা করল। একদিন একরাত পর্যন্ত সুলতানের সৈন্যরা দুর্গের ধারেপাশেই যেতে পারেনি। দুর্গ প্রাচীর ভাঙার জন্যে সুলতানের একটি ইউনিট দিনরাত চেষ্টা করেও প্রাচীরের কাছেই যেতে পারেনি। ইজাজ দুর্গের সৈন্য সুলতানের সৈন্যদের প্রতি অসংখ্য তীর নিক্ষেপ করে প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করছিল।

মিনজানিক থেকে বড় বড় পাথর দুর্গ প্রাচীরের প্রধান ফটকে নিক্ষেপ করা হলো। তেলভর্তি পাত্র নিক্ষেপ করে অগ্নিবাহী তীর দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হল তবুও দুর্গের প্রধান ফটক ভাঙা সম্ভব হচ্ছিল না। ইজাজের সৈন্যরা

সুলতানের মিনজানিক ইউনিটের উপর শক্তিশালী ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করে বহু হতাহত করে ফেলল। সুলতানের মিনজানিক ইউনিট তবুও মিনজানিক চালানো অব্যাহত রাখল। অগ্নিবাহী তীর ও তেলভর্তি পাত্র নিক্ষেপে ইজাজ দুর্গের সৈন্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য বালু ছিটিয়ে দেয়ার দ্রুত ব্যবস্থা করে অনেকাংশেই আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল।

অব্যাহত পাথর নিক্ষেপ ও অগ্নিতীর নিক্ষেপে প্রধান ফটকের কাঠে আগুন ধরে পুড়ে গেল কিন্তু প্রধান ফটক ছিল শক্ত লোহার সাঁচে তৈরী। কাঠ পুড়ে গেলেও ফটক পেরিয়ে কোন অশ্বারোহীর ভিতরে প্রবেশ সম্ভব ছিল না। কাঠ পুড়ে যে ফাঁক-ফোকর হয়েছে তাতে পদাতিক সৈন্যরা ফটকের ফাঁক দিয়ে ভিতরে যাওয়া সম্ভব মনে হলো। আইয়ূবী পদাতিক বাহিনীর একটি ইউনিটকে ভিতরে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। দ্রুতগতিতে একদল পদাতিক সৈন্য প্রধান ফটকের ফাঁক দিয়ে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করল বটে কিন্তু প্রবেশ করা মাত্র ইজাজ সৈন্যরা তাদের কচুকাটা করে মাটিতে লুটিয়ে দিল। পিছনের পদাতিক সৈন্যরা তাদের লাশের উপর দিয়েই এগুতে থাকল। দীর্ঘক্ষণের হুড়োহুড়িতে প্রধান ফটকের লোহার ফ্রেম ভেঙে অশ্বারোহী প্রবেশের মত ফাঁক তৈরী হয়ে গেল। সুলতান এবার অশ্বারোহী ইউনিটকে ভিতরে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। অশ্বারোহী ইউনিট ফটকের ফাঁক গলে ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করল কিন্তু গেট দিয়ে এক সাথে দ্রুতগতিতে একাধিক অশ্বারোহী প্রবেশের সুযোগ ছিল না। ইজাজ বাহিনী অশ্বারোহীদেরও ধরাশায়ী করতে শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যে সুলতানের কয়েকশত সৈন্য শাহাদত বরণ করল। ইজাজ দুর্গের সৈন্য এতটাই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যে, সুলতানের বাহিনীর পক্ষে দুর্গের ভিতরে নিয়ন্ত্রণ কব্জা করা দুরূহ হয়ে পড়ল। সুলতান নির্দেশ দিলেন সৈন্যদের বল, ভিতরে গিয়ে যে যেভাবে পারে ছড়িয়ে পড়বে এবং অগ্নিসংযোগ করতে শুরু করবে। ততক্ষণে প্রধান ফটক অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। অশ্বারোহীর ধাক্কা আর আঘাতে ফটকের লোহা দুমড়ে মুচড়ে ফাঁক হয়ে গেছে। কয়েকশত অশ্বারোহী দ্রুতবেগে দুর্গাভ্যন্তরে ঢুকে বেপরোয়া অগ্নিসংযোগ ও মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হল। ইজাজ বাহিনী সিংহের মতো অটল অবিচল থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে গেল কিন্তু তাদের শেষ রক্ষা হলো না। ততক্ষণে সুলতানের ঝটিকা বাহিনী দুর্গের সব স্থাপনায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ ইজাজ সৈন্যই আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে গেল। সামান্য কিছু শত্রুসেনা পালিয়ে যেতে সক্ষম হল আর বাকী হয় নিহত নয়তো বন্দী হলো।

ইজাজ দুর্গ থেকে আলেপ্পো ছিল মাত্র তিন মাইল দূরে। রাতের আগেই আলেপ্পোয় এ সংবাদ পৌছে গিয়েছিল যে, আইয়ূবী ইজাজ দুর্গ অবরোধ করেছেন।

রাতের বেলায় ইজাজ দুর্গ থেকে ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান শিখা আলেপ্পো থেকেও যখন গোচরীভূত হল তখন আলেপ্পোতে অবস্থানকারী গোমশতগীন, সাইফুদ্দীন ও মালিক আস-সালেহ-এর মধ্যে এই নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল যে, পিছন দিক থেকে আইয়ূবীর বাহিনীর উপর আক্রমণ করা হবে কি-না। কিন্তু সেনাপতিরা একবাক্যে সবাই জানালো, সেনাদের মধ্যে লড়াই করার হিম্মত নেই। বাধ্য হয়েই আইয়ূবীর বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান স্থগিত করতে হল।

সাইফুদ্দীন ও গোমশতগীনের মধ্যে ইজাজ দুর্গ ও আলেপ্পোর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে মত বিরোধও দেখা দিল। এ নিয়ে তাদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের এক পর্যায়ে গোমশতগীন সাইফুদ্দীনকে হত্যার হুমকি দিলে সে ঐক্য ভেঙে তার অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে আলেপ্পো থেকে বেরিয়ে গেল। মালিক আস সালেহ'র বয়স তখন পনের। আইয়ূবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সময় রাজনীতি সম্পর্কে তার তেমন কোন ধারণা ছিল না কিন্তু এ দুই বছরে সাইফুদ্দীন, গোমশতগীন ও খৃস্টানদের তৎপরতা দেখে সে অনেকটা অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, সাইফুদ্দীন, গোমশতগীন ও খৃস্টানরা তাকে ব্যবহার করে নুরুদ্দীন জঙ্গীর রেখে যাওয়া সালতানাতকে ধ্বংসের জন্য আইয়ূবীর বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। তাকে বিশেষ কোন সুবিধা দেয়ার জন্যে নয়।

গোমশতগীনের কার্যক্রম ও তৎপরতায় মালিক বুঝতে পারল যে গোমশতগীন আগাগোড়া একজন ধূর্ত মতলববাজ। সাথে সাথে সে গোমশতগীনকে বন্দী করে জেলখানায় অন্তরীণ করে ফেলল। মালিকের কাছে এই সংবাদও পৌছায় যে, গোমশতগীন মালিক আস সালেহকেও হত্যা করানোর ষড়যন্ত্র করে ছিল; তাই বন্দী করার তিনদিনের মাথায় মালিক গোমশতগীনকে জেলখানার ভিতরেই হত্যা করার নির্দেশ দিল।

আইয়ূবী ইজাজ দুর্গের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে রাতেই আলেপ্পো অবরোধ করলেন। আলেপ্পো ছিল ইজাজ থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। ইজাজ দুর্গের আগুন দেখেই আলেপ্পোর বাসিন্দা ও সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আলেপ্পোর সৈন্যরা এতটাই হীনবল হয়ে পড়ে যে আইয়ূবীর মোকাবেলা করার কথা ভাবতেও তাদের গায়ে কাঁটা দেয়। অপরদিকে কিছুদিন আগেও সুলতান আইয়ূবী আলেপ্পো অবরোধ করেছিলেন, কিন্তু আলেপ্পোর অধিবাসীরা সুলতানের বাহিনীর বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যে, সুলতান অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আলেপ্পোবাসীর সেই সাহসিকতা এখন আর নেই। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। যেন আলেপ্পা শহর একটি মৃত নগরীতে পরিণত হয়েছে।

* * *

অবরোধের দ্বিতীয় দিন মালিক আস সালেহ্-এর পক্ষ থেকে সুলতানের কাছে এক দূত এল। দূত কোন শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আসেনি, এসেছে এমন এক মানবিক ও আবেগপূর্ণ পয়গাম নিয়ে যে পয়গাম সুলতানকে আবেগাপ্লুত করে ফেলল। পয়গামে লিখা ছিল, মরহুম নূরুদ্দীন জঙ্গীর কন্যা সুলতান আইয়ূবীর সাথে দেখা করার অনুমতি চায়।

নূরুদ্দীন জঙ্গীর এই কন্যার নাম ছিল শামছুন্নিসা। মালিক আস সালেহ্-এর ছোট এই কিশোরীর বয়স তখন দশ/এগার বছর। মালিক যখন দামেস্ক ত্যাগ করে আইয়ূবী বিরোধী শিবিরে যোগ দেয় তখন তার মা মালিকের ভূমিকার বিরোধিতা করেন কিন্তু এই আপন ছোট বোনটিকে মালিক সাথে করে আলেপ্পোয় নিয়ে আসে। অপরদিকে নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী মালিকের মাতা রাজিয়া খাতুন আইয়ূবীর পক্ষাবলম্বন করে দামেস্ক ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান।

সুলতান জঙ্গী তনয়াকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর দুই সেনাকর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে জঙ্গী তনয়া শামসুন্নিসা সুলতান আইয়ূবীর তাঁবুতে হাজির হল। আইয়ূবী জঙ্গী তনয়াকে দেখে এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। শামসুন্নিসা আইয়ূবীর উষ্ণতায় খুব কাঁদল, আইয়ূবীও খুব কাঁদলেন। শামসুন্নিসার হাতে ছিল মালিকের লিখা পয়গাম। পয়গামে মালিক পরাজয় স্বীকার করে আইয়ূবীকে সুলতান স্বীকৃতি দিয়ে তার আনুগত্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। সেই পয়গামে একথাও লেখা ছিল যে, হিরনের সাবেক গভর্নর গোমশতগীনকে এখানে হত্যা করা হয়েছে, অতএব এখন হিরনও সুলতানের কব্জায় ধরে নেয়া যায়।

"তোমরা এই মেয়েটিকে কেন নিয়ে এলে?" সেনাকর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলেন সুলতান। তোমরা কি এই পয়গাম নিয়ে আসতে পারতে না?"

সেনাকর্মকর্তারা এ কথার জবাব না দিয়ে তারা জঙ্গী তনয়ার দিকে তাকাল। নূরুদ্দীন তনয়া শামসুন্নিসা সুলতানের উদ্দেশে বলল, "মামুজান! আমাকে এরা নিয়ে আসেনি, আমার ভাই আমাকে আপনার এখানে পাঠিয়েছে। আমরা চাই, আপনি আমাদেরকে আলেপ্পোয় থাকার অনুমতি দেবেন এবং ইজাজ দুর্গও আমাদের কব্জায় দিয়ে দিবেন। আগামীতে কোনদিন আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।"

সুলতান আইয়ূবী সেনাকর্মকর্তাদের দিকে ক্ষুব্ধ ও তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "এই শর্ত আদায়ের জন্যে তোমরা মরহুম সুলতানের এই ছোট মেয়েটিকে নিয়ে এসেছো?"

"ঠিক আছে মা! ইজাজ দুর্গ ও আলেপ্পোর অধিকার তোমাদের হাতে আমি ছেড়ে দিলাম।" সুলতান ইজাজ দুর্গ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ও অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

সেনাকর্মকর্তাদের প্রতি ভর্ৎসনা করে সুলতান বললেন, "নিরপরাধ মেয়েকে আমি ইজাজ দুর্গ ও আলেপ্পোর অধিকার দিচ্ছি, তোমাদের মত কাপুরুষ, ভীতু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারীরা এই দুর্গও অধিকার পাওয়ার উপযুক্ত নও।"

১১৭৬ সালের ২৪ জুন সুলতান আইয়ূবী ও শামসুন্নাহারের মধ্যে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। আইয়ূবী ইজাজ দুর্গ ও আলেপ্পোকে সালতানাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং মালিক আস সালেহকে আলেপ্পোর স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিয়ে দিলেন। এর কিছুদিন পর সাইফুদ্দীনও সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিল। যার ফলে দৃশ্যত গৃহযুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে মুক্তি পেলেন আইয়ূবী। কিন্তু পর্দার অন্তরালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও গোয়েন্দাদের শক্রুতা অব্যাহত থাকল। নতুন করে ওরা শুরু করল আইয়ূবী বিরোধী ষড়যন্ত্র।